আত্ম সংশোধন ও সমাজ সংশোধনের কর্মপন্থা

লেখকঃ আল্লামা সাইয়্যেদ মুজতাবা মুসাভী লারী
অনুবাদক ঃ আবুল হোসেন

ডন পাবলিশার্স

আত্ম সংশোধন ও সমাজ
সংশোধনের কর্মপন্থা

লেখকঃ আল্লামা সাইয়্যেদ মুজতাবা মুসাভী লারী
অনুবাদক ঃ আবুল হোসেন

প্রকাশক ঃ মনজুর আলম
ডন পাবলিশার্স
৮৩/১ ইন্দিরা রোড, ঢাকা-১২১৫।

প্রথম প্রকাশ ঃ ভাদ্র ১৩৯৮/আগস্ট ১৯৯১/সফর ১৪১২

(স্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত)

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
চৌকস
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড, ঢাকা-১০০০ঐ ফোন-৪১৪৩৯৩

পরিবেশক ঃ
হাদীস মঞ্জিল
১নং হরিশচন্দ্র বসু স্ট্রীট, জামাতখানার মোড়,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ
সাদা-ষাট টাকা মাত্র
নিউজপ্রিন্ট-পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র

Attashangshodhan-O-Samaj
Shangshodhan-Er karmapantha
(Process of self reformation and social reformation) rendered from Youth And Morals written by allama sayyid mujtaba musavi lari translated into Bengali by Abul hossain. Published by Manzur Alam dawn publishers. 83/1 indira road. dhaka-1215. bangladesh. first edition August 1991, Safar 1412.

Price : Sixty, US Dollar Three only.

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচী

	ভূমিকা	৭
	পরিচিতি	১১
১.	বদমেজাজ	১৭
	বন্ধুত্বের মূল্য	১৮
	বদমেজাজী লোকেরা ক্ষুব্ধ থাকে	২০
	আল্লাহর নবী (দঃ) ঃ নৈতিক দিক থেকে নিখুঁত নমুনা	২৪
২.	আশাবাদী স্বভাব	২৯
	আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশা ও মনের প্রশান্তি	৩০
	আশাবাদী স্বভাবের অভাব	৩২
	ইসলাম আশাবাদী স্বভাব ও আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশার আহবান জানায়	৩৫
৩.	হতাশা	৪১
	জীবনের আলো ও অন্ধকার বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ	৪২
	হতাশার নেতিবাচক পরিণতি	৪৪
	ইসলাম বনাম হতাশা	৪৭
৪.	মিথ্যাবাদিতা	৫৩
	সমাজ জীবনে আচার–আচরণের গুরুত্ব	৫৪
	মিথ্যাবাদিতার ক্ষতিকর দিক	৫৯
	মিথ্যা কথা বলাকে ধর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে	৬০
৫.	কপটতা	৬৫
	আপনার ব্যক্তিত্বকে সযত্নে লালনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান	৬৬
	কপটতা ঃ কুৎসিততম বৈশিষ্ট্য	৬৮
	মোনাফেকদের আস্তানা পুড়িয়ে দিন	৭০
৬.	মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদ	৭৭
	পাপে পরিপূর্ণ অপবিত্র সমাজ	৭৮
	মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদ রটানোর পরিণতি	৮০
	মিথ্যা অপবাদ রটানোর প্রসার লাভের কারণ	৮১
	ধর্ম বনাম অসদাচরণ	৮৪

৭.	ছিদ্রান্বেষণ	৮৭
	নিজের দোষ ও অক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞতা	৮৮
	ব্যঙ্গোক্তি ও অপমানকারীরা	৯০
	ধর্মীয় শিক্ষা বনাম ব্যঙ্গোক্তি	৯২
৮.	পরশ্রীকাতরতা	৯৭
	একটি বিভ্রান্ত ও কলুষিত বাসনা।	৯৮
	হিংসুটে লোক ব্যর্থতা ও বঞ্চনার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে	৯৯
	ধর্ম বনাম পরশ্রীকাতরতা	১০২
৯.	অহমিকা	১০৭
	জীবনের দিগন্তে ভালোবাসার আলো	১০৮
	অহমিকা মানুষকে ক্ষোভ ও দুঃখ-দুর্দশার দিকে পরিচালিত করে	১১০
	বিনয়ের ব্যাপারে আমাদের নেতাদের ভূমিকা	১১৩
১০.	জুলুম-নির্যাতন	১১৭
	সমাজে ন্যায়পরায়ণতার ভূমিকা	১১৮
	অত্যাচারের ধ্বংসাত্মক অগ্নিশিখা	১২০
	জালিম ও জুলুম মুকাবিলা করার ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা	১২১
১১.	শত্রুতা ও ঘৃণা	১২৫
	আমরা ক্ষমা করবো না কেন?	১২৬
	শত্রুতার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকর দিক	১২৮
	অসদাচরণকারীদের সঙ্গে ইমাম সাজ্জাদ (আঃ)-এর ব্যবহার	১৩১
১২.	ক্রোধ	১৩৭
	আত্মনিয়ন্ত্রণের সুফল	১৩৮
	ক্রোধের পরিণতি	১৩৯
	ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের উপদেশ	১৪২
১৩.	বিশ্বাস ভঙ্গ	১৪৭
	কতিপয় দায়িত্ব	১৪৮
	বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তা ভঙ্গ করার ক্ষতিকর দিক	১৫০
	বিশ্বাস ভঙ্গ করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে	১৫৩
১৪.	বিশ্বাসঘাতকতা	১৫৭
	পারস্পরিক আস্থাশীলতা ও কর্তব্যপালন	১৫৮

	বিশ্বাসঘাতকতা ও এর ক্ষতিকর দিক	১৫৯
	ধর্ম বিশ্বাসঘাতকতাকে ঘৃণা করে	১৬১
১৫.	কৃপণতা	১৬৭
	সমবায় ও সহযোগিতা	১৬৮
	কৃপণতা অনুভূতিকে ধ্বংস করে	১৬৯
	এক দৃষ্টিতে কৃপণতা সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের অভিমত	১৭২
১৬.	লোভ	১৭৫
	জীবনের চাহিদা সম্পর্কে	১৭৬
	একজন লোভী মানুষ কখনো সুখী হতে পারে না	১৭৮
	ইসলামে সঠিক বন্টন	১৮১
১৭.	ঝগড়া–বিবাদ	১৮৫
	সহজাত আত্মপ্রীতি	১৮৬
	তর্কাতর্কি করে আমাদের কি লাভ হয়	১৮৭
	নেতৃবৃন্দের বাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত	১৮৯

প্রকাশকের কথা

নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা ব্যবস্থা একটি জাতির জন্য কত ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে তা আমাদের সমাজের বিশৃংখল অবস্থা ও ক্রমবর্ধমান দুর্নীতির ব্যাপক প্রসার হতে সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে।

আমাদের জাতির গর্ব আমাদের ছাত্র ও যুব সমাজ। তারা জাতির কঠিন দুর্দিনে আমাদের দেশকে বৈদেশিক জুলুম শোষণ হতে মুক্ত করার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব আত্মত্যাগ ও কোরবানীর অত্যুজ্জ্বল নির্দশন পেশ করেছিল। তাদেরই একাংশকে আজ হতাশা নিরাশার শিকার হয়ে সন্ত্রাসবাদিতা মাদকাসক্ত হতে দেখে সমগ্র জাতি আজ শঙ্কিত।

আমাদের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ উচ্চ শিক্ষা ও জ্ঞান গবেষণার কেন্দ্রমূল হিসেবে জাতিকে বিভিন্ন জটিল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে পথ নির্দেশনার কাজে নিয়োজিত থাকার কথা ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা আজ জ্ঞান-চিন্তা ও সমঝোতা সহযোগিতার পথ পরিহার করে পারস্পরিক হিংসা, দুশমনি, অস্ত্রের মহড়া ও সন্ত্রাসী কাজে নিয়োজিত। নেতৃবৃন্দের তরফ হতে অবিরত বক্তৃতা-বিবৃতি প্রচার করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে পত্র পত্রিকায় অসংখ্য নিবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে, পুলিশী তৎপরতা জোরদার করা হয়েছে। এতসব সত্ত্বেও সমস্যার ভয়াবহতা হ্রাস পাওয়ার তেমন কোন সুস্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

বস্তুতঃপক্ষে সমস্যার মূলে না গিয়ে বাহ্যিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাধানের যত চেষ্টাই করা হোক না কেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এই সমস্যাটি প্রত্যেক মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিগত ও মনস্তাত্ত্বিক। তাই ছেলেবেলা হতে ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে অন্যের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা, উদারতা, পরোপকারের মত উৎকৃষ্ট গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে হবে। মানুষের মধ্যকার লোভ, সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ও আত্মম্ভরিতা তার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে সুখের স্থলে অশান্তি ও ধ্বংস নিয়ে আসে। আলোচ্য গ্রন্থে লেখক সৈয়দ মুজতবা মুসাভী নারী এ বিষয়টিকেই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদেরকে আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতা শিক্ষাদানের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই আমরা আমাদের বহুবিধ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এই মহামূল্যবান বইটির ইংরেজী সংস্করণ Youth and Morals-কে বাংলায় প্রকাশ করেছি। বইটি মূলতঃ ফার্সী ভাষায় রচিত এবং ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ভাষায় ভাষান্তরিত হয়ে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও লেখকের আরো কয়েকটি গ্রন্থ বিশ্বে বহুল প্রশংসিত হয়েছে। এখানে আরো একটি কথা উল্লেখ করা দরকার যে, ইসলামের প্রাথমিক যুগে

নৈতিকতার শিক্ষা একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে শিক্ষাসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎকালীন বিজ্ঞ পণ্ডিতদের লেখা অনেক মূল্যবান গ্রন্থ আজও আরবী ও ফার্সী ভাষায় মজুদ রয়েছে। ব্রিটিশ শাসনামলে এদেশে পাশ্চাত্য বস্তুবাদী শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসারের সাথে সাথে আমাদের শিক্ষাক্রম হতে নৈতিকতার শিক্ষা সুকৌশলে বাদ হয়ে যায়।

নৈতিকতাকে আমাদের শিক্ষাকার্যক্রমের একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আমাদের বিশ্বাস আলোচ্য গ্রন্থটি এ ব্যাপারে আমাদের পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদদের জন্য একটি পথ নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করবে।

পরিশেষে পাঠক–পাঠিকারা যদি এ বই পড়ে কিছুমাত্র উপকৃত হন তাহলে আমরা আমাদের পরিশ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

প্রকাশক

ডব পাবলিশার্স

ভূমিকা

আমরা বহু জাতিকে দেখেছি যারা দৃশ্যতঃ একটা প্রতিকূল পরিস্থিতির অধীনে বসবাস করেছেন, তথাপি এদের মধ্য হতে কতিপয় নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গ্রুপ গুণাবলী ও যোগ্যতার ক্ষেত্রে অন্য সবাইকে অতিক্রম করেছেন এবং সভ্যতার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখে গেছেন।

এসব জনসমষ্টির মধ্যে এমন সব লোক রয়েছে যারা চিন্তা ও গবেষণার পথ পরিহার করে প্রতিটি ঘটনার জন্য তাদের 'ভাগ্যকে' দায়ী করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। যখনি এসব দল চিন্তাভাবনা করে দেখার মত কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হতো তখনি তারা সোজাসুজি বলতেন–"এটা আমাদের নিয়তি", "কি বিস্ময়কর ঘটনাবলীর আকস্মিক সংঘটন", "কি অদ্ভুত এ জীবন, কেউ তার নিয়তি লংঘন'' করতে পারে না"।

অথচ আমরা যদি বিষয়টির উপর একটু চিন্তা করি, তাহলে বুঝতে পারবো যে নিয়তি বা আকস্মিক সংঘটিত হওয়া, এ দুটোর কোনটিই আমাদের এ ব্যর্থতার জন্য দায়ী নয়, আমাদের খারাপ আচার–আচরণই আমাদের এ অকৃতকার্যতার প্রধান কারণ।

উদাহরণস্বরূপ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীর কাছে কয়েকমুষ্টি ছাই ও ধ্বংসস্তূপ ব্যতিত আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। অথচ আজ জার্মানী শিল্পোন্নত জাতিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সৃষ্টিধর্মী চিন্তা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে তারা যে অপরাপর জাতিসমূহের চেয়ে অধিকতর উন্নত ছিল তা নয় বরং যুদ্ধ পরবর্তীকালে তাদের মধ্যে যে দায়িত্বানুভূতি ও সংযমশীলতা দেখা দিয়েছিল, বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে, এটাই তাদের এ অভূতপূর্ব অগ্রগতির পেছনে মূল শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। এভাবে যে কোন জাতির বস্তুগত উন্নতিসহ তার উন্নতি ও অগ্রগতি যে তার উন্নত আচার–আচরণ ও নৈতিকতার উপরই নির্ভরশীল তা সবচাইতে

নির্ভুলভাবে বলা যায়। সভ্যতাসমূহের ভবিষ্যৎ উৎকর্ষ সাধনে সামাজিক আচার-আচরণের যে একটা ভূমিকা রয়েছে তা নিঃসন্দেহে ইতিহাসের পরিক্রমায় একটা সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

* * *

অপরপক্ষে, আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাই যে মানুষের স্বভাব তার বৈশিষ্ট্য ও মূল্যবোধের উপর নির্ভরশীল। উন্নত গুণাবলী অর্জন করবার যোগ্য হওয়ার কারণেই মানুষকে পশু হতে আলাদা করে লোকহিতকর পদবীতে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

সর্বোচ্চ মানবীয় মূল্যবোধের অনুসন্ধান ব্যক্তির আচার-আচরণের ক্ষেত্রেই করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এটাও তুলে ধরা দরকার যে, সর্বোচ্চ মানবীয় গুণাবলী অর্জন করতে হলে আত্মাকে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যম হিসেবে নির্ধারন করে মনস্তাত্ত্বিক ও আচার-আচরণগত পদ্ধতিসমূহকে গ্রহণ করতে হবে।

এজন্য আমরা সমাজ বিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদেরকে, দুর্নীতির মুকাবিলা ও প্রতিরোধের মাধ্যমে কিভাবে মানুষকে উন্নত নৈতিকতার অধিকারী করা যায়, এ সম্পর্কে অনেক বৈজ্ঞানিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করতে দেখি।

এক্ষেত্রে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক ও সেরা জ্ঞানী হিসাবে আমরা যাদেরকে দেখতে পাই তাঁরা হলেন পবিত্র ইমামগণ। ইমামরা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে, আমাদের জন্য পথনির্দেশনা রেখে গেছেন এবং তাঁদের জীবন আমাদের জন্য অনুসরণীয় উদাহরণ হয়ে আছে যা দেখে আমরা সর্বোৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হতে পারি। এই সমস্ত পথ নির্দেশনা আমাদেরকে সর্বাৎকৃষ্ট নৈতিকতার অধিকারী হয়ে সুখী জীবন যাপনের জন্য সুযোগ এনে দেয়।

* * *

এমন অনেক লোক রয়েছে যারা বদস্বভাবের শিকার হয়ে, এর থেকে পরিত্রাণ লাভের কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

এ বইয়ের বিষয়বস্তু বিশেষভাবে যুবকদের সাথে সম্পর্কিত, কেননা তারাই জীবনের এসব সমস্যাদির ব্যাপারে সহজে অনুভূতিপ্রবণ।

এ ছাড়াও, এক্ষেত্রে আদর্শিক ও ব্যবহারিক পথনির্দেশনা হিসেবে যুবকদের জন্য এযাবত যে সব বই লিখা হয়েছে তা অত্যন্ত অল্প এবং তাও আবার আধুনিক ভাষার সুনিপুণতার সুযোগ বিবর্জিত। এ জন্যই বর্তমানকালের যুবকদের জন্য একটি বই বের করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি।

সৌভাগ্যক্রমে অনেক পরিশ্রমের পর আমরা বইটিকে তৈরী করেছি এবং প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। **আত্ম সংশোধন ও সমাজ সংশোধনের পথ** নামক এ বইটি : দুর্নীতি উৎপাটনের একটা পদক্ষেপ হিসাবে কালামে পাকের আয়াত, রাসূলের হাদীস ও পবিত্র ইমাম (আঃ)দের ভাষণের ভিত্তিতে এক অভিনব কায়দায়, আচার–আচরণের বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

আপনাদের প্রতি আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ এই যে, আপনারা এ বইটি ভালভাবে পড়ুন এবং সামাজিক দুর্নীতির মুকাবিলা ও প্রতিরোধে এই বইটিকে ব্যবহার করুন।

তরুণদের প্রতিরক্ষার সংগঠন
কোম, ইরান
হিজরী ১৩৮৭ এর শীতকাল

পরিচিতি

সুখ ও শান্তি অর্জনের লক্ষ্যে এ দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ তার জীবনে দিনরাত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সে সুখ ও শান্তি পাওয়ার এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সে জীবন নামক যুদ্ধক্ষেত্রে অবিরত লড়াই করে চলেছে অনেক ক্ষেত্রে, এজন্য সে তার সবকিছু বিসর্জন দিচ্ছে, কেবল এ আশায় যেন সুখের পাখিটি তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে যায় যাতে তার ছায়ার নীচে বসে সে তার অবশিষ্ট জীবন কাটিয়ে দিতে পারে।

এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে, সুখী ও সন্তুষ্ট জীবন যাপনের অধিকারী অনেক প্রতিভা ও যোগ্যতা সম্পন্ন লোকদেরকেও তাদের অন্তরকে নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তির খেলনায় পরিণত করতে দেখা যায়।

ফলে, এসব লোক এমন এক অলীক স্বপ্নের শিকারে পরিণত হয় যে তাদের কাছে সুখী জীবনকে একটা মিথ্যা কাহিনী ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না, যা মানুষকে এমন এক অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত করে, যে মানুষ এমন একটা খড়কুটো যা অলীক দুঃখকষ্টের ঢেউয়ের চতুর্দিকে ঘুরপাক খেতে খেতে কবরের তলায় গিয়ে ঘটবে তার দারিদ্র ও মোহমুক্তির পরিসমাপ্তি। সত্য ও বাস্তবতার স্থলে অসার কল্পনাকে গ্রহণ করার ফলেই তাদেরকে এতসব দুঃখদুর্দশা ভোগ করতে হয়। এরা না সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার আলো অনুসরণ করেছে, না জীবনের পথে নির্ভরযোগ্য কোন আশ্রয় গ্রহণ করেছে। অবাস্তব আশা-আকাঙ্খা ও জীবনের স্বতন্ত্র লক্ষ্যসমূহের কারণে সৃষ্ট দুশ্চিন্তার তরঙ্গসমূহ তাদের মনকে নিশ্চিতভাবে এমনসব কল্পনার ফানুসের দিকে টেনে নিয়ে যায়, যাতে মানুষ আলো হতে অন্ধকারে এবং তার জীবন বিভ্রান্তিকর দিকে নিক্ষিপ্ত হয়।

মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব, তাকে দুটো স্বতন্ত্র শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। সকল জীবজন্তুর মত মানুষের জৈবিক চাহিদা ছাড়াও মানুষের বহুবিধ আত্মিক চাহিদা রয়েছে যা পূরণের মাধ্যমে মানুষ তার পূর্ণত্বে পৌঁছার শ্রেষ্ঠ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। মানুষের মধ্যকার এ দুটো বৈশিষ্ট্যের একটা যখন অন্যটা অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হয় তখন অন্যটা দুর্বল হয়ে পরাস্ত হয়।

উল্লেখিত এ সত্যের আলোকে, এটা লক্ষ্য করার যোগ্য যে শিল্প শ্রম মানুষের জীবনের বৈশিষ্ট্যকে সত্যিকারভাবে পরিবর্তিত করে ফেলেছে। শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের বিস্ময়কর পরিবর্তন, মানবজীবনের অনেক সন্দেহজনক অনিশ্চয়তার ব্যাখ্যা প্রদান করেছে এবং অগণিত কঠিন সমস্যাদির সমাধান করে দিয়েছে।

এভাবে সমুদ্রের গভীর তলদেশ হতে শুরু করে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের অন্ধকারাচ্ছন্ন উপরিভাগ মানুষের পদচারণা ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। অপরদিকে, মানুষের আধ্যাত্মিক চাহিদাসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছে, জীবনের বহুবিধ ক্ষেত্রে সংঘটিত অপরাধসমূহের ফলে জমিনে ও সমুদ্রে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে। দুর্যোগ ও অমানবিক অপরাধসমূহের সংখ্যা অবিশ্বাস্য পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সামাজিক বিশৃংখলা ও দুর্নীতির সম্মুখে মুক্তির উপাদানসমূহ দুর্বল হয়ে পড়েছে। আধ্যাত্মিকতার অবশিষ্টাংশ নির্জনতা, নোংরামি ও লোভের আগুণের মধ্যেজ্বলছে।

আজ আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে, বস্তুগত লাভ মানুষের কাঙ্খিত গুণাবলীর উপর অগ্রাধিকার কায়েম করে নিয়েছে। মানুষ তার নিজেকে শিল্প কারখানা ও গবেষণামূলক বিজ্ঞানসমূহের হাতিয়ারে পরিণত করেছে এবং লালসা ও লাগামহীন চাহিদার ক্ষতির পদতলে পড়ে মানুষ তার আত্মাকে ধ্বংসের কবল হতে পরিত্রাণকারী প্রশংসনীয় গুণাবলীর বিলোপ সাধন করেছে, এমনকি তার মানবিক অনুভূতিসমূহের মধ্যে চলছে বাঁচা মরার এক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতময় অবস্থা।

মিথ্যাবাদিতা, কৃপণতা, মুনাফেকী, নির্যাতন, স্বার্থপরতা এবং

অন্যসব নীচ বৈশিষ্ট্য যা দুর্ভেদ্য বাঁধের মত মানব জীবনের পূর্ণতা ও সুখের উৎসমূলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছে, মানুষের হস্তসমূদয়কে শৃংখলিত করেছে এবং তাকে অদম্য কঠোরতাপূর্ণ নোংরামীর সমুদ্রের নির্দয় তরঙ্গের মধ্যে নিক্ষেপ করেছে। নাইটদের বিজয়োল্লাস, একাকীত্ব, মানুষের ব্যক্তিগত দুঃখ দুর্দশা, সামাজিক দুর্যোগ ও বহুবিধ যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা, মানবীয় গুণাবলীর অধঃপতনেরই ফলশ্রুতি বই আর কিছুই নয়। সমাজবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানী উভয়ে একবাক্যে স্বীকার করছে যে এটা একটা প্রমাণিত সত্য যে, উৎকৃষ্ট গুণাবলী ও আধ্যাত্মিক নির্দেশনা ছাড়া, মানুষ শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতার চূড়ান্ত শীর্ষে পরিচালনাকারী ন্যায়পরায়ণতার পথ হতে বিপথগামী হবে।

যেসব মহান ব্যক্তি, সমাজে শ্রেষ্ঠ অবদান রাখার কারণে, ইতিহাসে যাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রয়েছে তারা সকলেই পবিত্র ও উন্নত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। যে সমাজের লোকেরা উন্নত আচার-আচরণের অধিকারী নয়, সে সমাজ যোগ্য বিধি-বিধানের দ্বারা শাসিত হয় না এবং বস্তুতঃপক্ষে, তা মানব সমাজের বসবাসের যোগ্য নয়। এজন্য পৃথিবীর পূর্ববর্তী শ্রেষ্ঠ সভ্যতাসমূহের ধ্বংস, তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্যোগের কারণে সংঘটিত হয়নি বরং হয়েছিল তাদের আচার-আচরণের দেওলিয়াপনার কারণে। মানব প্রণীত বিধিবিধান ও ব্যবস্থাসমূহ, একদিকে যেমন অন্তরের গভীরে প্রবেশ করতে পারে না তেমনিভাবে তা জাতি ও সমাজসমূহের পারস্পরিক গঠনমূলক সম্পর্কের নিশ্চয়তা বিধানেও সক্ষম নয়, যেভাবে আধ্যাত্মিক আচার-আচারণের দ্বারা তা সংগঠিত হয়ে থাকে। মানব রচিত আইনসমূহ যা মানবীয় ধারণারই বহিঃপ্রকাশ মাত্র তা মানব জাতির জন্য প্রকৃত সুখের বিধান করার উপযোগী নয়। কেননা মানুষ সীমাবদ্ধ চিন্তার অধিকারী।

এভাবে মানুষ তার জীবনের সমগ্র দিক ও বিভাগকে পরিবেষ্টনকারী সকল বিষয় সম্পর্কে ধারণা করতে পারে না। অধিকন্তু, তাকে আবেষ্টনকারী বিষয়াদির গভীরতা সম্পর্কে সম্যক অবহিত হলেও মানুষ সর্বদা বাহ্যিক প্রভাবের অধীন যা তাকে সত্য গ্রহণে বাধা দান করে। উপরোল্লিখিত বক্তব্যের আলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মানুষের তৈরী আইন, সময় ও পরিবেশগত পরিস্থিতির

প্রভাবে সর্বদা পরিবর্তিত হচ্ছে। বস্তুতঃপক্ষে, এ ধরনের আইনের দুর্বলতার ফলশ্রুতি হিসাবেই দুর্নীতি ও মানুষের দুঃখদুর্দশার প্রসার ঘটে। অপরপক্ষে, আমাদের জন্য রয়েছে নবীদের পবিত্র শিক্ষা, যা অসীম ঐশীজ্ঞানের উপর নির্ভরশীলও মহান অহীর উৎস দ্বারা অণুপ্রাণিত। এজন্য, এসব আইন সময়ের স্রোত ও পরিবর্তন, পরিবর্ধনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অস্তিত্ব ও জীবনের সত্যতার সঠিক উপলব্ধির কারণে, নবীদের প্রদত্ত শিক্ষা নৈতিক উৎকর্ষ লাভ ও পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে, মানবজাতির জন্য সবচাইতে নির্ভুল ব্যবস্থা প্রদান করে মানুষের আত্মাকে আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের দিকে পরিচালিত করার আহবান জানায়। মানুষের উপর আস্থাশীলতার মত পছন্দনীয় ও ইতিবাচক সুফলের ব্যাপারে তর্কাতর্কির কোন অবকাশ নাই, কেননা এটা সুস্পষ্ট যে মানুষ যদি সীমাহীন চাহিদা ও লালসার শিকারে পরিণত হওয়া হতে পরিত্রাণ পাওয়ার মত, কোন অভ্যন্তরীণ শক্তির অধিকারী না হয় তাহলে ন্যায়পরায়ণতার লক্ষ্যে সে যে কোন পদক্ষেপ নিবে তা নিশ্চিত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। সুতরাং সমাজের মানুষকে, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার গুণে গুণান্বিত না করা পর্যন্ত, নিরাপদ ও পূর্ণাঙ্গ মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব।

সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব নবী হযরত মোহাম্মদ (দঃ) শাশ্বত ইসলামী ধর্মীয় বিশ্বাসকে, এমন সব মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন যা সর্ব প্রথম দিন হতেই খোদাভিরুতার উপর নির্ভরশীল, আর এটাই হচ্ছে এমন একটা উপায় যা দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনে শান্তি আনয়ন করতে পারে।

বস্তুতঃপক্ষে ইসলামী দাওয়াতের বুনিয়াদ এমন সব মূলনীতিসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত যা মানুষের ঈমানের পর্যায়কে একটা পবিত্র ও প্রশংসনীয় ধারাবাহিক বস্তুগত প্রকৃত যোগ্যতায় উন্নীত করার মাধ্যমে, মানুষের জন্য তার আধ্যাত্মিক যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ স্তরে পৌছানোর বিষয়টাকে মূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে।

ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে মানুষ যেন তার আশা-আকাঙ্খা ও লোভ-লালসা চরিতার্থ করতে গিয়ে উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলীকে বিসর্জন না করে, যারা মানবতার অসম্মান করে ইসলাম তাদের মুকাবিলা করেও প্রচণ্ডভাবে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

বন্ধুত্বের মূল্য

ভালবাসা মানুষের সহজাত অনুভূতি। এজন্য আমরা প্রতিটি মানুষকে তার সমগোত্রীয়দের প্রতি এক আভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারা আকৃষ্ট হতে দেখতে পাই। এভাবে এ সহজাত প্রয়োজন অবশ্যই পূর্ণ হতে হবে যেন প্রত্যেক মানুষ অন্য নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সমষ্টির সঙ্গে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এ ধরনের সম্পর্কের মাধ্যমে সে তার সামাজিক জীবনে উপকৃত হতে পারে।

ভালবাসা ও নিরাপত্তা শান্তির ভিত্তি। এটা সর্বশ্রেষ্ঠ উপভোগ্য আত্মিক চাহিদা যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ দুনিয়ায় ভালবাসার চেয়ে অধিকতর মূল্যবান আর কোন জিনিস নেই। তাই অনেক সময় কোন প্রিয়জনকে হারানোর বেদনা মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী সর্বনাশা হয়ে থাকে। আমাদের আত্মাসমূহ অন্য আত্মার কাছে আশ্রয়লাভের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে থাকে, যা নাহলে নিরাপত্তাহীনতা ও দুশ্চিন্তার হাতে নিগৃহীত হয়ে আমরা ক্ষতবিক্ষত হতাম। এভাবে, আমরা আমাদের নিজস্ব ভুবনেও নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়ে যেতাম।

এ ব্যাপারে জনৈক পন্ডিতের বক্তব্যের উদ্ধৃতি প্রদত্ত হল ঃ "বিশৃংখলা সৃষ্টির পরিবর্তে, দুনিয়ার লোকদের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক বজায় রাখার মধ্যে আমাদের সুখী জীবন যাপনের রহস্য নিহিত রয়েছে। যারা তাদের সমগোত্রীয়দেরকে ভালবাসতে পারে না তারা দুশ্চিন্তামুক্ত নিরাপত্তার জীবন যাপন করতে পারে না।" প্রকৃত অনুভূতি ও সত্যিকারের ভালবাসার সম্পর্ক সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে সমাজের বিভিন্ন লোককে এক সুদৃঢ় ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাখে। দুটো আত্মার মধ্যে যে সম্প্রীতি দেখা যায় তা তাদেরকে ভালবাসা ও ঐক্যের জগতে একই ব্যক্তিতে পরিণত করে। এখান থেকে অনন্তকালীন সুখের ভিত রচিত হতে থাকে। তথাপি, এ সুখ অব্যাহত রাখার জন্য, পারস্পরিক বিভেদসমূহ অবশ্যই মিটিয়ে ফেলতে হবে এবং অন্যদের সাথে এমন সব বিষয়সমূহের ব্যাপারে সমঝোতা করে নিতে হবে যা তারা যথাযথভাবে মেনে নিতে রাজী নয়। সবচাইতে

মূল্যবান ভালবাসা হচ্ছে এমন সব যা মানুষের ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় বরং তা মানুষের ভ্রাতৃত্বের অনুভূতির সাথে একাত্ম হয়ে তার ভালবাসার চাহিদা পূরণে সক্ষম। একজন মানুষ যে নিজেকে একজন বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে পেশ করবে তাকে অবশ্যই এমন কোন কাজ বা আচরণ হতে বিরত থাকতে হবে যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে চিড় ধরাতে পারে। বস্তুতঃপক্ষে, তাকে তার বন্ধুর উপর অর্পিত বিপদ ও দুঃখকষ্ট দূর করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে এবং বন্ধুকে আশা ও শান্তির বাগান প্রদান করতে হবে। যারা অন্যের কাছ থেকে ভালবাসার প্রত্যাশী হতে চায় তাদেরকে তাদের এ অনুভূতির ছায়ায় বসবাসের পূর্বে প্রতিপক্ষের প্রতিও একই ধরনের ভালবাসা প্রদর্শনে সক্ষম হতে হবে।

জনৈক বিজ্ঞ পন্ডিতের মতেঃ আমাদের জীবন একটা পাহাড়ীয়া অঞ্চলের মত, যেখানে কেউ কোন শব্দ করার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রতিধ্বনিত হয়ে পুনঃ তারই কাছে ফেরৎ আসে, যাদের অন্তর অন্যদের প্রতি ভালবাসায় পরিপূর্ণ তারা অন্যদের কাছ থেকে একই ধরনের ভালবাসা পেতে থাকবে। এটা সত্য যে আমাদের বস্তুজীবন পারস্পরিক লেনদেনের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা এটা বলতে চাই না যে আমাদের আধ্যাত্মিক জগতও একই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভবপর বলে আশা করা যায় যে আমরা অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত না হয়ে তাদেরকে আমাদের প্রতি বিশ্বস্ত হতে আশা করতে থাকব। একজন কিভাবে অন্যদেরকে না ভালবেসে, তাদের কাছ থেকে ভালবাসা প্রত্যাশা করতে থাকবে?

অন্যদের সাথে আমাদের পারস্পরিক কাজকর্মের সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষতিকর হতে পারে যদি তা উভয় পক্ষ হতে ভালবাসা ও সততার মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত না হয়।

ভয়াবহ কপটতা যখন মানুষের জীবন ও অন্তরসমূহকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে, যখন চাটুকারিতা সততার স্থলাভিষিক্ত হয়ে পড়বে, এবং বন্ধুত্ব, একাত্মতা, সহযোগিতা ও স্নেহশীলতা দুর্বল হয়ে পড়বে তখন সমাজ হতে পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাবের অবলুপ্তি ঘটবে।

নিঃসন্দেহে, আমাদের সমাজের অনেকের সাথে এমন সব লোকের সাথে দেখা হয়েছে যাদের অন্তরে প্রকৃত ভালবাসা বা অনুভূতি বলতে

কিছুই নেই। তারা তাদের প্রকৃত সত্তাকে ভালবাসার আবরণে আবৃত করে রাখে কিন্তু বারংবার আমরা তাদের এই আবরণ উন্মোচন করে তাদের সঠিক অবস্থা ও প্রকৃত অনুভূতি পর্যন্ত পৌছতে সক্ষম হই এর ফলে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তাদের মুখোশ ধ্বংসের কাজেই পর্যবসিত হয়ে যায়।

বস্তুতঃপক্ষে, সুখী হওয়ার পূবশর্ত ও আত্মিক উন্নয়নের ফলপ্রসূ পদ্ধতি হচ্ছে সত্যপন্থী লোকদের সাথে প্রকৃত বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। এটা এজন্য যে এ ধরনের সম্পর্কের ছায়াতলে ব্যক্তিগত চিন্তার উন্নতি খোদাভীরুতার পর্যায়ে উন্নীত হয়ে উৎকৃষ্ট গুণাবলীর জন্ম দিতে থাকে। সুতরাং, বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ব হতেই, অবশ্যই, সতর্কতার সাথে পরীক্ষা কাজ চালাতে হবে। যাদের সাথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হবে তাদের সততা ও পবিত্রতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে বন্ধুত্ব করা এক অমার্জনীয় ভ্রান্তি। কেননা মানুষকে তাদের সঙ্গে সহচার্যকারীদের চরিত্র বৈশিষ্ট্যের প্রভাবে অতি সহজে প্রভাবিত হওয়ার যোগ্য করে সৃষ্টি করা হয়েছে। নেতিবাচক সম্পর্ক মানুষের সুখের পথে হুমকিস্বরূপ।

বদ মেজাজী লোকেরা ক্ষুব্ধ থাকে

বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য ও অবাঞ্ছিত অভ্যাস ভালবাসার সম্পর্ককে দুর্বল করে এবং কোন কোন সময় পরিণতি এতদূর পর্যন্ত গড়ায় যে তা উত্তম সম্পর্ককে পর্যন্ত ছিন্ন করে ফেলে। বদ মেজাজী ব্যক্তিরা অন্যের ভালবাসার মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয় না। তারা সমাজ ও তাদের নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার এক স্থায়ী প্রাচীর গড়ে তোলে যা তাদেরকে অন্যের ভালবাসা উপলব্ধি করার পথে বাধা প্রদান করে। সুতরাং, বদ মেজাজ সুখের ভিত্তিমূলকে ধ্বংস করে দেয় এবং মানুষের চরিত্রের অধঃপতন ঘটায়। এটা নির্বিবাদে বলা যায় যে, মন্দ আচরণ মানুষকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কেননা মানুষ এমন সব লোকদের ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যাদের উপর সে ক্ষুব্ধ অথবা যাদের সাথে সে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। এভাবে খারাপ আচরণ, মানুষকে তার এমন কিছু যোগ্যতাকে পরিহার করতে বাধ্য করে যা উন্নত আচরণের সাথে করা হলে তার

জীবনের অগ্রগতির জন্য অত্যন্ত ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত হত। কেউ যদি তার সমাজের লোকদের সঙ্গে মিশতে চায় তবে তাকে সর্বপ্রথম পারস্পরিক লেনদেনের কলাকৌশল জেনে নিতে হবে এবং এ সম্পর্ক অবহিত হবার পরই, সমাজের গ্রহণযোগ্য নিয়মে তার কাছে তা প্রয়োগ করতে হবে। এ প্রক্রিয়া ছাড়া একজন মানুষ যেমন সমাজের অন্য মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে পারে না, তেমনিভাবে এমন একটি সমাজে মানুষের পারস্পরিক আচরণ পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে পরিচালিত হতে পারে না। অতএব, উত্তম আচরণ মানুষের পারস্পরিক সুখী জীবনযাপনের প্রধান বুনিয়াদ হিসাবে পরিগণিত। এটা ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্বকে উন্নততর করার লক্ষ্যে একটা আবশ্যকীয় উপাদানও বটে।

বস্তুতঃপক্ষে, উত্তম আচরণ মানুষের যোগ্যতাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। এ কারণে সমাজ পরিচালনার সাধারণ পর্যায়ে এটা অত্যন্ত ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়। মানুষের সহানুভূতি ও ভালবাসাকে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে যেমন, তেমনি জীবনে চলার পথে আপতিত বিপদ আপদে, দুঃখ কষ্টের তীব্রতাকে লাঘব করার ক্ষেত্রেও উন্নত আচরণের সমান আর একটি বৈশিষ্ট্যও নেই।

এসব গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিরা তাদের দুঃখের দিক অন্যের কাছে প্রদর্শন করে না, এভাবে তারা তাদের গোপনীয়তার সীমা লংঘন করতে দেয়না। এসব লোকেরা তাদের চতুর্দিকে সুখ ও সহানুভূতির একটা রামধনু সৃষ্টি করার সংগ্রামে নিয়োজিত থাকে। সুতরাং তাদের সঙ্গে লেনদেন ও কাজকর্মে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দুঃখের কথা ভুলে যায় এবং তাদের মধ্যে একটা নিরাপত্তার মনোভাব এসে যায়। তারাও তাদের কোন প্রকার সম্ভাব্য দুঃখকষ্ট থাকা সত্ত্বেও নিজেদের নিশ্চিন্ততার মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে এবং এভাবে তারা তাদের সফলতা ও বিজয়ের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। অনেক ব্যক্তির জন্য তাদের ভাল ব্যবহার সফলতা অর্জনের ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে। এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের সফলতা সরাসরি তাদের কর্মচারীদের উত্তম আচরণের সাথে সম্পৃক্ত।

কোন কোম্পানীর ম্যানেজার যদি অমায়িক ব্যবহারের অধিকারী হন তবে তিনি সাধারণতঃ কর্মঠ হবেন এবং এভাবে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ তার নিজের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হবেন। উপসংহারে এ

সিদ্ধান্তে পৌছা যেতে পারে যে নিজেকে অপরের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য অমায়িক ব্যবহারই হচ্ছে সফলতার একমাত্র চাবিকাঠি। যত বড় পদমর্যাদার অধিকারী হউক না কেন, মানুষ বদমেজাজী মানুষকে কিছুতেই বরদাশত করতে রাজী নয়। কোন লোকের চাইতে কোন লোকের প্রতি মানুষের অপেক্ষাকৃত বেশী ঝোঁক প্রদর্শনের কারণ সম্পর্কে ব্যক্তিগত সমীক্ষা চালানো হলে এর কারণসমূহ সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে। এ সম্পর্কে জনৈক পাশ্চাত্য পন্ডিত তার ব্যক্তিগত সমীক্ষায় যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে গেছেন তা নিম্নে উল্লেখ করা গেল ঃ

"সদা হাসি মুখ ও অন্যের প্রতি মনোযোগ আমার জীবনকে কতখানি প্রভাবিত করেছে এ সম্পর্কে আমি একদিন একটা পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেদিনের পূর্বে আমার চেহারা বিষাদ ও বিমর্ষ থাকতো। আমার চেহারাকে হাস্যোজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যে সেদিন সকাল বেলা আমি বাড়ী হতে বের হয়ে গেলাম। আমি নিজে নিজে ভেবে দেখলাম যে আমি অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখেছি যে অন্যদের সহাস্য মুখ ও আমার প্রতি মনোযোগ আমার মধ্যে একটা শক্তির সঞ্চার করে। ঠিক একইভাবে, আমি নিজে ও অন্যকে প্রভাবিত করার কাজে সফলকাম হতে পারি কিনা তা আবিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি নিজেকে পুনরায় বললাম যে আমি যখন আমার কাজে রওয়ানা হব তখন আমার সংকল্প হবে এই যে আমি মনোযোগী হব এবং আমার মুখমন্ডল থাকবে সদা প্রফুল্ল, এমনকি আমি আমার নিজেকে আশ্বস্ত করতে সক্ষম হলাম যে আমি অত্যন্ত ভাগ্যবান ব্যক্তি। এরফলে এক প্রকার আনন্দের মনোভাব আমার সমগ্র দেহকে এমনি পুলকিত করে ফেলেছিল যাতে আমার মনে হতে লাগলো আমি যেন উড়ে বেড়াচ্ছি। আমি আমার মুখমন্ডলে একটা প্রশস্ত হাসি দিয়ে আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিকে তাকাতে লাগলাম। এখনও আমি আমার চতুর্দিকের কিছু লোকের মুখে বিষণ্নতার ছাপ স্পষ্ট দেখতে পেলাম। এসব লোকের জন্য আমার অন্তর জ্বলতেছিল এবং আমার মনে হচ্ছিল যে আমার অন্তরের কিছু আলো যদি এদেরকে দেওয়া যেত।"

"সেদিন সকালে আমি আমার অফিসে ঢুকে হিসাব রক্ষককে এমনিভাবে সম্ভাষণ জ্ঞাপন করলাম যা তিনি পূর্বে কখনও আমার মধ্যে দেখেননি। এর পূর্বে আমি কখনও কচিৎ হাসতাম এবং তাকে কখনও এভাবে সম্ভাষণ জানাইনি। হিসাবরক্ষক প্রত্যুত্তরে আমাকে সম্ভাষণ না জানিয়ে থাকতে পারলেন না এবং সে সম্ভাষণ ছিল অত্যন্ত স্নেহমাখা ও উষ্ণ। ঠিক এ মুহূর্তে আমি এটাই অনুভব করলাম যে আমার সুখ সত্যই তাকে প্রভাবিত করেছিল "

"আমি যে কোম্পানীর কাজ করতাম তার প্রেসিডেন্ট এমন এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি কখনও তার মাথা উঠায়ে অন্য কারুর সাথে কথা বলতেন না। তিনি ছিলেন একজন বদমেজাজী লোক। সেদিন তিনি অত্যন্ত খারাপ ভাষায় আমাকে গালাগাল দিলেন যা এর পূর্বে তিনি কখনও করেননি। এটা আমি কিছুতেই বরদাশত করতাম না যদি আমার এমন কোন সংকল্প না থাকতো, যে যত কিছুই ঘটুক না কোন আমি কিছুতেই আমার প্রতিশ্রুতি ভাংতে পারি না। আমি সত্যই বিনয়ের সাথে উত্তর দিলাম যে এর ফলে তার মুখমন্ডলে কিছু মূল্যবান আভা দেখা দিল। এটা ছিল সেদিনের দ্বিতীয় ঘটনা। সেদিনের শেষদিকে আমি আমার মনোযোগ ও মুখের প্রফুল্লতা বজায় রাখার চেষ্টাই করেছিলাম, যেন তা আমি আমার সহকর্মীদের কাছে পৌঁছিয়ে দিতে পারি। এভাবে আমি আমার পরিবারের সঙ্গে এ নিয়মের অনুশীলন করেছি এবং এতেও ইতিবাচক ফল পেয়েছি। ফলে আমি এটা উদ্ভাবন করেছি যে এভাবে আমি কর্মঠ ও সুখী হতে পারি এবং আমার চতুর্দিকের সবাইকেও তা একইভাবে অনুভব করাতে পারি। তোমাদের পক্ষেও এটা সম্ভবপর। এই মনোভাব নিয়ে লোকদের সাথে সদা সহাস্য সাক্ষাৎকার, তোমার জীবনে সুখের ফুল ফোটাবে যেমনিভাবে বসন্তকালে গোলাপ ফোটে এবং এটা তোমার জন্য অনেক বন্ধু নিয়ে আসবে যারা তোমার অনন্তকালীন জীবনের জন্য বয়ে আনবে শান্তি ও কল্যাণ।"

শত্রুদের অন্তরে দয়ার সঞ্চার করার ব্যাপারে এই বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠ অবদানের কথা কেহই অস্বীকার করতে পারবে না। সম্মান প্রদর্শন ও ভাল ব্যবহারের দ্বারা শত্রুদেরকেও ঈমানদার বানানো এবং আদর্শের প্রতি আনুগত্যশীল করা সম্ভব।

অন্য একজন পাশ্চাত্য লেখক এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখে গেছেন ঃ "উত্তম ব্যবহারকারীও সদা প্রফুল্ল মুখমন্ডলের অধিকারী লোকের জন্য সকল দরজা খোলা থাকবে, আর বদমেজাজী লোকদেরকে দরজা খোলার জন্য ডাকাতের মত দরজায় আঘাত করতে হবে। সর্বোত্তম বস্তু হচ্ছে এমন সব যা দয়া, অমায়িক ব্যবহার ও প্রফুল্লতার সাথে সম্পৃক্ত।"

অধিকন্তু, এ প্রসঙ্গে আমি যা যোগ করতে চাই তা হচ্ছে এই যে ভাল আচরণের জন্য সুখ দরকার এবং তা সৎস্বভাবের লোকদেরকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু, এজন্য এ ধরনের ভাল আচরণ ও সদগুণাবলী কপটতাপূর্ণ ও নিছক লোক দেখানো না হয়ে অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হতে হবে। অন্য কথায় বলতে গেলে, মানুষের প্রতি অন্তরে যে ভালবাসার মনোভাব রয়েছে, এটা হতে হবে তারই বাস্তব

বহিঃপ্রকাশ। বাহ্যিক চেহারার মধ্যে সাধারণতঃ, একজন মানুষের অন্তরের ভিতরে যা কিছু লুকানো থাকে, তার প্রকৃত বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। এটা সম্ভব যে একজন মানুষের কোন কোন ভাল বৈশিষ্ট্য তার অন্তরের গোলযোগ ও বিভ্রান্ত মনের বিরোধী। অনেক শয়তান প্রকৃতির লোক, অনেক সময় তাদেরকে ফেরেশতার পোশাকে সজ্জিত করে, এবং এভাবে তাদের ভীতপ্রদ মুখমন্ডলকে সৌন্দর্যের পর্দার আড়ালে ঢেকে রাখে।

আল্লাহর নবী (দঃ) ঃ নৈতিক দিক দিয়ে নিখুঁত নমুনা

আমরা সকলেই জানি যে ইসলামের অগ্রগতির একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান ছিল নবীর (দঃ) পূর্ণাঙ্গ আচরণ। এই সত্য কালামে পাকে বর্ণিত হয়েছে। যেখানে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেন, "আপনি যদি কঠোর ও নির্মম হতেন তা হলে তারা নিশ্চিতরূপে আপনার চতুর্দিক হতে সরে যেত"

–আলকোরআন, ৩ ঃ ১৫৮।

আল্লাহর নবী (দঃ) সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করতেন। মানবতার প্রতি তাঁর গভীর ও অবর্ণনীয় ভালবাসা, তাঁর ফেরেশতারূপ সত্তার মধ্যে, পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয়ে পড়েছিল। তিনি সকল মুসলমানের অভাব অভিযোগের প্রতি সমান দৃষ্টি দিতেন।

"এবং আল্লাহর নবী (দঃ) তাঁর সময়কে তাঁর সাহাবাদের মধ্যে বন্টন করে দিতেন। তিনি তাঁর নিকটবর্তী ও দূরবর্তীদের সবাইকে সমানভাবে দেখতেন।"

–রাওদা আলী কাফী, ২৬৮ পৃঃ।

তিনি বদস্বভাবের অধিকারীদের ঘৃণা করতেন, তিনি বার বার বলেছেন ঃ

"বদস্বভাব হচ্ছে খারাপ, এবং বদস্বভাবী লোক তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্টতম।"

–নাহজ আল ফাসাহা, ৩৩১ পৃঃ।

"হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তানেরা, নিশ্চিতভাবে তোমরা তোমাদের টাকা দিয়ে মানুষকে খুশী করতে পারবে না।, অতএব প্রফুল্ল মুখমন্ডলও উৎফুল্ল

আচরণের মাধ্যমে তাদের সাথে সাক্ষাৎ কর।"

-ওছায়িল আশা শিয়াহ, দ্বিতীয় খন্ড, ২২২ পৃঃ।

নবী (দঃ)-এর খাদেম আনাছ বিন মালিক প্রায়ই বলতেন যখনই নবী (দঃ)-এর চমৎকার বৈশিষ্ট্যের কথা মনে পড়তো তখনই তিনি বলতেন, "আমি দশ বছর ধরে নবীর (দঃ) খেদমতে নিয়োজিত ছিলাম, এই সময়ের মধ্যে আমি যা কিছু করতাম বা না করতাম তিনি আমাকে কখনও উহ্ পর্যন্ত (অভিযোগের সুরে) বলেন নাই।"

-ফাজাইল আল খামছাহ, ১ম খন্ড, ১১৯ পৃঃ।

এছাড়াও ভাল ব্যবহার এবং উৎফুল্ল বদন এমন উপাদান যা মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে। এ সম্পর্কে ইমাম ছাদিক (আঃ) বলেছেন ঃ "দয়া ও নম্র ব্যবহার জমিনকে অধিক ফলনশীল করে এবং মানুষের আয়ু বৃদ্ধি করে।"

- ওয়াছিল আশ শিয়া, ২য় খন্ড, ২২১ পৃঃ।

ডাঃ স্যান্ডরসন এই বিষয়ের উপর নিম্নোক্ত কথা লিখেছেন, "রোগের প্রতিরোধ ও নিরাময়ের ব্যাপারে দয়া অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা উপাদান। অনেক ঔষধ সাময়িক রোগমুক্তির সাথে সাথে অবাঞ্ছিত পার্শ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে অথচ দয়া স্থায়ী রোগমুক্তি ঘটায়ে দেহের সকল অংশকে রোগমুক্ত করে। পরোপকারিতা দেহের সকল শক্তিকে প্রভাবিত করে। ভাল আচরণকারীদের রক্ত সঞ্চালন অত্যন্ত চমৎকার এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়াও অপেক্ষাকৃত ভাল।"

- ফিরোজী ফিকর।

ইমাম সাদেক (আঃ)-এর বর্ণনার মধ্যে একটা সুন্দর বিচার্য বিষয় রয়েছে। তিনি বলেছেন যে,উত্তম আচরণ ও পরোপকারিতার মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে এবং এটা মানুষের আয়ু বৃদ্ধিকারী উপাদানসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এর পশ্চাতে যে কারণ নিহিত রয়েছে তা হচ্ছে এই যে পরোপকারী লোকেরা তাদের মধ্যে একটা সুখ ও তৃপ্তি অনুভব করে থাকে, এভাবে পরোপকারী ও উত্তম আচরণ উভয়ের মধ্যে একই ইপ্সিত ফল রয়েছে। ইমাম সাদেক (আঃ) সুখ লাভের জন্য এসব গুণ বৈশিষ্ট্যের কথাও বিবেচনা করেছেন যখন তিনি বলেছেন যে ঃ-

"মানুষের সুখের একটা দিক হচ্ছে তার অমায়িক ব্যবহার"

মোস্তাদরাক আল ওসায়িল, দ্বিতীয় খন্ড, ৮৩ পৃঃ।

স্যামুয়েল স্মাইলস এই বিষয়ের উপর যে সংযোজন করেছেন ঃ

"মানুষের আবেগের ভারসাম্য ও সদাচরণ মানুষের উন্নতি ও সুখকে ঠিক

অতখানি প্রভাবিত করে থাকে যতখানি এ ব্যাপারে তার অন্যান্য শক্তি ও প্রবণতা কার্যকর থাকে। বস্তুতঃপক্ষে, মানুষের সুখ বহুল পরিমাণে তাদের অনুরাগ ও উত্তম আচরণের সাথে সম্পর্কিত।"

–আখলাক।

অধিকন্তু, সদাচরণ মানুষের জীবনকে সহজতর করে এবং তার জীবনোপকরণ ও তার সঙ্গে অন্যদের সহযোগিতা বাড়িয়ে দেয়, ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"সদাচরণ, প্রচুর পরিমাণে জীবনোপকরণ বৃদ্ধি করে এবং বন্ধুত্বের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতাকে বাড়িয়ে দেয়।"

–গুরার আল হিকাম, পৃঃ ২৭৯।

এস, মার্দিন তাঁর গ্রন্থে নিম্নোক্ত কথগুলো লিখেছেন ঃ

"আমি এমন একজন রেষ্টুরেন্ট ম্যানেজারকে জানি যিনি তার অমায়িক ব্যবহারের ফলে অনেক সম্পদশালী ও জনপ্রিয় হয়েছেন। আমি জানতে পারলাম যে, পর্যটকরা অনেক দূর দুরান্ত হতে তার রেষ্টুরেন্টে আসতো, এজন্য যে ঐ রেষ্টুরেন্টের নির্জনতা ও আনন্দদায়ক পরিবেশ তাদের কাছে অত্যন্ত ভাল লাগতো। খদ্দেররা রেষ্টুরেন্টে থাকাকালীন, ম্যানেজার তাদেরকে এমন সানন্দ সম্ভাষণ জানাতো, যা তারা আর কোথাও কেউ দেখতে পায়নি। বস্তুতঃপক্ষে, অন্যান্য রেষ্টুরেন্টে যেখানে অভিযোগের পর অভিযোগ করেও সাড়া পাওয়া যেতো না, এমন কোন পরিস্থিতি এ রেষ্টুরেন্টে কেউ কখনও হতে দেখেনি। এই রেষ্টুরেন্টের কর্মচারীরা খদ্দেরদের সাথে স্বাভাবিক ক্রেতা বিক্রেতার সম্পর্কের উর্দ্ধে খদ্দেরদের সাথে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতো। কর্মচারীরা অত্যন্ত হাসিখুশী সহকারে খদ্দেরদের সেবাযত্নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন করতো। এ বিশেষ মনোযোগ অতিথিদের প্রতি তাদের প্রীতি ও শুভেচ্ছার মনোভাব হতে উদ্ভূত। কর্মচারীরা তাদের অতিথিদের সাথে এমন সম্পর্ক গড়ে তুলতো যা তাদের মধ্যে পুনঃ এখানে আসার আগ্রহ সৃষ্টির মধ্যেই সীমিত থাকতো না বরং তারা তাদের বন্ধুদেরকেও এখানে নিয়ে আসতো। নূতন খদ্দের আকৃষ্ট করার ব্যাপারে তাদের অনুসৃত এ পদ্ধতিটা কতইনা ফলপ্রসূ ছিল।"

তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেছেন ঃ

"উত্তম আচরণ ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে যে মূল্যবান ভূমিকা পালন করে এসেছে তুলনায় বর্তমান সময়ে এর গুরুত্ব সর্বাধিক। যারা জীবনে সুখী সফলকাম হতে চায়, উত্তম আচরণ হতে হবে তাদের মূলধন।"

– খিস্তান মার্জী

ইমাম সাদিক (আঃ) প্রফুল্লতাকে মানুষের বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতার একটা লক্ষণ হিসাবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ

মানুষের মধ্যে যাদের পরিপূর্ণ যুক্তিজ্ঞান ও বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা রয়েছে তারাই হলেন সর্বোত্তম আচার-আচরণের অধিকারী।"

অসাইল আশ শিয়া। ২য় খণ্ড, ২০১ পৃঃ।

স্যামুয়েল স্মাইলস বলেন, ইতিহাসে দেখা যায় শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান লোকেরা সুখী ও আশাবাদী ছিলেন কেননা তাঁরা জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের যুক্তিকে তাঁদের নিজ সত্তার মধ্যে সুস্পষ্ট করে তোলার চেষ্টা করেছেন। কেউ তাদের অবদানসমূহের প্রতি চিন্তা করলে তাদের সুস্থ সবল আত্মা, চিন্তা, পরোপকারিতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানী লোকেরা সুখী ও আনন্দোজ্জ্বল চেহারার অধিকারী ছিলেন। তাঁদের অনুসারীদের জন্য তাঁরা ছিলেন উত্তম আচরণের বাস্তব নমুনাস্বরূপ। তাঁদের ভক্ত অনুরক্তরা সব সময় তাঁদের উন্নত চরিত্র ও মহত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। অতএব তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক সুখ ও সহজাত আলোর পথ অনুসরণ করেছেন।"

আখলাক

সম্মানিত আল্লাহ্‌র রাসূল (দঃ) বলেছেন ঃ

"সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্যসমূহ যা আমার উম্মতকে বেহেশতে দাখিল করবে তা হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয় ও উত্তম আচরণ।"

ওসায়েল-আসশিয়াহ, ২য় খন্ড, পৃঃ ২২১।

সুতরাং যুক্তিকে নেতা হিসেবে গ্রহণকারী ব্যক্তি, যিনি সম্মানিত জীবন যাপন করতে চান, তার জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে তিনি ভদ্র আচরণের মত মহামূল্যবান আত্মিক পুঁজির অধিকারী হবেন। একটা অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যের মূলোৎপাটন করতে হলে মানুষকে ঐকান্তিক ইচ্ছা সহকারে লক্ষ্যে পৌছার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। দুর্ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক সমূহের প্রতি একটু দৃষ্টি দিলেই, তা হতে এসব আচরণের মূলোৎপাটনের জন্য, প্রয়োজনীয় সংগ্রাম চালানোর উপযোগী প্রেরণা, আগ্রহ ও উৎসাহ পাওয়া যাবে।

২

আশাবাদী স্বভাব

* আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশা ও মনের প্রশান্তি
* আশাবাদী স্বভাবের প্রভাব
* ইসলাম আশাবাদী স্বভাব ও আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশার আহবান জানায়

আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশা ও মনের প্রশান্তি

মানুষের পরিবর্তনশীল জীবনে অন্যান্য জিনিষের চেয়ে দৃঢ়তার প্রয়োজনীয়তা অন্য যে কোন জিনিষের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক। যারা দৃঢ়তার অস্ত্রে সুসজ্জিত না হয়ে বিভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের সংগ্রামে নিয়োজিত হয় তারা ব্যর্থতা ও পরাজয় বরণ করে। বস্তুতঃপক্ষে, একজন লোকের দায়িত্ব যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই তার মধ্যে দৃঢ়তা ও নিশ্চিন্ততার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই বাস্তবতার আলোকে প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হতে হবে, কিভাবে দুশ্চিন্তা পরিহার করে, দৃঢ়তা ও নিশ্চিন্ততার দিকে প্রত্যাবর্তন করা যায় তা জানা।

শক্তি, সম্পর্ক, সুনাম--সুখ্যাতি ও অন্যান্য বস্তুগত সুযোগ অর্জনের সংগ্রামে নিয়োজিত হওয়া অলীক মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। এ পথে যে প্রচেষ্টা চালানো হয় তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। কেননা, মানুষের সুখ তার নিজ আত্মার মধ্যে অবস্থান করে ঠিক যেমনিভাবে তার দুঃখের উৎস ও তার অন্তরের গভীরে প্রোথিত থাকে। আমীরুল মু'মিনীন ইমাম আলীর মতে, মানুষের নিজস্ব আত্মার মধ্যেই ঔষধ নিহিত রয়েছে। সুতরাং, যে ফলাফল মানুষের আত্মার শক্তিশালী ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নিহিত রয়েছে তা বাহ্যিক প্রভাবের মধ্যে খোঁজ করে পাওয়া যাবে না। বাহ্যিক প্রভাবের ফলাফল যেহেতু ক্ষণস্থায়ী তাই এটা কিছুতেই সম্ভব নয় যে, তা মানুষকে পূর্ণ সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করবে।

এপিকটেটাস বলেনঃ

"আমাদেরকে অবশ্যই লোকজনদেরকে জানিয়ে দিতে হবে যে তারা এখানে ওখানে খোঁজাখুঁজি করে সুখ ও সৌভাগ্যের সন্ধান পাবে না। প্রকৃত সুখ, ক্ষমতা ও যোগ্যতার মধ্যে নিহিত নয়। মিরাভ ও এগলুইস উভয়েই বিরাট শক্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেছেন। একইভাবে সুখ বিরাট ঐশ্বর্য্য ও প্রচুর পরিমাণে টাকা-পয়সার মধ্যে নিহিত নয়। উদাহরণস্বরূপঃ কারুন বহুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েও সুখী হতে পারেনি। সরকারী ক্ষমতা বা রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী হয়েও সুখী হওয়া যায় না।

প্রকৃতপক্ষে, উপরোল্লিখিত উভয়বিধ ক্ষমতার মালিক হয়েও সুখী হওয়া সম্ভব নয়। নিরো, চান্দনাপাল ও আগামনীনের ঘটনা সর্বজনবিদিত। তাদের দুর্ভাগ্য এতই মারাত্মক ছিল যে, তারা অবিরত কাঁদতো। যদিও তাদের সহায়-সম্পদ, সুনাম-সুখ্যাতি ও ক্ষমতা কোন কিছুরই অভাব ছিল না। সুতরাং মানুষকে তার আত্মা ও বিবেকের কাছে প্রকৃত সুখের সন্ধান করতে হবে।

অতএব, আমাদেরকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে বস্তুগত অনেক অমিমাংসিত সমস্যার সমাধান কিংবা দ্রুত যান্ত্রিকীকরণ মানুষের দুশ্চিন্তামুক্ত অবাধ জীবন যাপনের জন্য যথেষ্ট নয়। এ পৃথিবীতে এতসব নূতন নূতন যন্ত্রপাতির আমদানী, মানুষের দুঃখ-দুর্দশার লাঘবতো করেই নি বরং মানুষের জন্য বহুবিধ নূতন সমস্যা ও অনিশ্চয়তা বয়ে নিয়ে এসেছে।

সুতরাং, আমাদের জীবনকে দুঃখকষ্টের অব্যাহত যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি দিতে ও আমাদের আত্মার উপর ময়লা আবরণ সৃষ্টিকারী কৃষ্ণ মেঘের প্রভাব হতে মুক্ত করার জন্য সঠিক পথের নির্দেশনা প্রাপ্ত পবিত্র পথ প্রদর্শকের আশু প্রয়োজন। চিন্তাশক্তি মানুষের জন্য সুখ বয়ে আনতে পারে যেভাবে তা আমাদের বস্তুগত জীবনের অগ্রগতির উৎকর্ষ সাধন করেছে। এখানেই চিন্তাশক্তির ক্ষমতা সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফূট এবং মানবজীবনে এর বিস্ময়কর প্রভাব পরিদৃশ্যমান।

পরিচ্ছন্ন মননশীলতা হচ্ছে একটা প্রাচুর্যপূর্ণ প্রস্রবণ যা মানুষের বস্তুগত লাভের চেয়ে অপেক্ষাকৃত সর্বোৎকৃষ্ট পরিমাণে মানুষকে এক বিশাল নতুন জগতের সঙ্গে পরিচয় করে দিয়ে, তাকে অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। নিরপেক্ষ চিন্তা চালাক লোকদেরকে টাকার হাতের পুতুল হিসাবে ব্যবহৃত হতে বাঁধা দান করে। যাদের চিন্তা করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে পেতে অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় তারাই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বনের মাধ্যমে এটাকে দিয়ে, তাদের উপর আপতিত যে কোন বিপদের সুদৃঢ় মুকাবিলা করতে সক্ষম। বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের শিকার হওয়া থেকে আমাদেরকে রক্ষা করা এবং অবহেলা ও অতিরঞ্জনের ঢেউ হতে আত্মরক্ষাকল্পে, আমাদেরকে আমাদের নিজেদের জন্য অবশ্যই এমন একটা চিন্তার মানদন্ড প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যা দিয়ে আমরা আমাদের আচার-আচরণের বিচার করতে পারি। এভাবে আমাদের আত্মা সঠিক চিন্তা করার পথে অগ্রসর হতে থাকবে যা আমাদেরকে

আত্মিক শক্তিতে বলীয়ান করে দুশ্চিন্তামুক্ত করবে।

জনৈক পাশ্চাত্য বিজ্ঞ পন্ডিত বলেনঃ

"সম্ভবতঃ, আমরা এমন সব মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের বাছাই করতে অক্ষম যাদের আচরণ ও চিন্তাধারা বহুলাংশে আমাদের মত, কিন্তু আমরা আমাদের চিন্তাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে স্বাধীন। আমরা আমাদের মনের বিচারক। আমরা যা কিছু যথাযথ ও ঠিক বলে মনে করবো তাই করবো। যেসব বাহ্যিক কারণ ও প্রভাবের অনুসরণ আমরা করে থাকি তা আমাদের জীবনের এমন কোন অংশ নয় যে তারা আমাদেরকে কোন নির্দিষ্ট দিকে চিন্তা করতে বাধ্য করবে বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। অতএব, আমরা অবশ্যই সঠিক চিন্তার পথকে বাছাই করে নেব এবং যা কিছু ক্ষতিকর তার মূলোৎপাটন করবো, আমাদের প্রেরণাসমূহ আমাদের সংকল্পের পথে পরিচালিত হবে। অন্য কথায় বলতে গেলে আমাদের সংকল্পই আমাদেরকে তার ইচ্ছামত পরিচালিত করবে। এ কারণে আমরা আমাদের মধ্যে কোন কুচিন্তা ধারণ করার অনুমতি দিতে পারি না অথবা আমাদের অপছন্দনীয় কোন চিন্তা আমাদের মনকে দখল করে রাখবে এটাও আমরা হতে দিতে পারি না। এমনসব চিন্তাই আমাদেরকে বন্দী করে বিভিন্ন দুঃখ-দুর্দশার শিকারে পরিণত করতে পারে। আমাদেরকে অবশ্যই প্রকৃত মানুষ হওয়ার লক্ষ্যে, এক বিরামহীন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, যা আমাদেরকে সর্বোচ্চ সম্মানজনক লক্ষ্য ও মহতি আশা-আকাঙ্খার দিকে পৌঁছাবে, কেননা সঠিক চিন্তাই হচ্ছে সুখ ও সফলতার চাবিকাঠি।"

আশাবাদী স্বভাবের প্রভাব

বিভিন্ন অসুখ বিসুখের কারণে আমাদের দৈহিক ব্যবস্থা যেভাবে বিকল হয়ে পড়ে ঠিক তেমনিভাবে মানুষের মনের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিচার বুদ্ধির সামঞ্জস্যশীলতা ও বিভিন্ন খারাপ বৈশিষ্ট্যও অন্যান্য কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মন বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও এটা একজন মানুষের আচার আচরণের অধীনতা হতে মুক্ত হতে পারে না। অতএব, মানুষ তখনই সুখী হতে পারে যখন সে এমন এক উন্নত আচরণের অধিকারী হয় যা তার চিন্তা, আচার-আচরণ ও উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

অতএব, সুখশান্তির পথে বিঘ্নসৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যসমূহের মূলোৎপাটন

করা মানুষেরই দায়িত্ব। মানুষের চিন্তার সামঞ্জস্য বিধানে সহায়ক শক্তি দুটো হচ্ছে আশাবাদিতা এবং জীবন ও অন্যান্যদের সম্পর্কে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।। আশাবাদিতা ও আপনার চতুর্দিকে যারা রয়েছে তাদের সম্পর্কে ইতিবাচক প্রত্যাশা, এমন সব লোকদের জন্য শান্তির নিশ্চয়তা প্রদান করে, যারা মানবতার সীমানার মধ্যে বসবাস করে। আশাবাদিতার সম্পূর্ণ বিরোধী হচ্ছে হতাশা এবং অন্যদের সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করা, যা মানুষের মধ্যে ন্যায়পরায়ণ চিন্তা বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তার পূর্ণতার পথে অগ্রগতির ক্ষমতা হ্রাস করে। আশাবাদিতাকে সর্বোত্তমভাবে বর্ণনা করতে গেলে তাকে অন্ধকারের মধ্যে আলো বলে অভিহিত করা যায় যা চিন্তার দিগন্তের মত প্রসারিত হতে থাকে। এর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে দয়াশীলতার প্রতি ভালবাসা জন্মে এভাবে। জীবন সম্পর্কে নূতন ধারণা ও জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীতে অগ্রগতি সাধিত হয়। এর ফলে মানুষ তার জীবনের অধিকতর সুন্দর দৃশ্য দেখতে সক্ষম হয়। এভাবে তার মধ্যে এমন এক যোগ্যতার সৃষ্টি হতে থাকে যার ফলে সে সকল মানুষকে এক নূতন আলোর মধ্যে দেখতে পায় এবং এমন এক নূতন শক্তির অভ্যুদয় ঘটে যা দিয়ে সে প্রত্যেক মানুষকে সমান ও নিরপেক্ষতার সাথে বিচার করতে সক্ষম হয়। একজন আশাবাদী লোকের দুঃখের বিলুপ্তি ঘটবে, এবং তার মধ্যে যতই সে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়ে সমাজের বিভিন্ন লোকের সাথে তার বাহ্যিক ও আত্মিক সম্পর্ক রাখতে শুরু করবে, ততই তার আশা বৃদ্ধি পেতে থাকবে। আশাবাদিতা ব্যতীত এমন একটা উপাদানও পাওয়া যাবে না যা মানুষের জীবনে সমস্যার সংখ্যা হ্রাস করতে পারে। আশাবাদী লোকদের মুখমন্ডলে সুখের ছাপ অপেক্ষাকৃত অধিক সুস্পষ্ট, এটা কেবল তাদের সন্তুষ্টির সময়ই নয় বরং সমগ্র জীবনের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল অবস্থায়। আশাবাদী লোকদের শান্তিপূর্ণ আত্মা হতে সব সময় সুখের আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে।

মানুষের জীবনে অন্য লোকদের আস্থা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অত্যাবশ্যক। মানুষের মধ্যে পারস্পরিক আস্থাশীলতা সৃষ্টির জন্য আশাবাদিতা অবশ্যই তাদের জীবনের একটা বৈশিষ্ট্য হিসাবে বিদ্যমান থাকতে হবে। এটা এমন একটা সত্য যার প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে। একটা সমাজের উন্নতি ও

অগ্রগতি সাধনে, সে সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসাবে পরিগণিত হয়। বিপরীতটাও সত্য, কেননা পারস্পরিক অবিশ্বাস, যে কোন সামাজিক সংস্থার ভবিষ্যৎ অস্তিত্বের জন্য ধ্বংসাত্মক উপাদান হিসাবে কাজ করে থাকে। সমাজের বিভিন্ন লোকদের পারস্পরিক যোগাযোগ যত ঘনিষ্ঠতর হবে, ততই তার উন্নতি ও অগ্রগতি দ্রুততর হতে থাকবে। আশাবাদীতার সামাজিক সুফলসমূহের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ঐক্য, সহযোগিতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস। অধিকন্তু, সমাজের লোকদের সম্পর্ক যদি পারস্পরিক সহানুভূতি, আস্থা ও কল্যাণ কামনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই সমাজ জীবনে শান্তিলাভ করা যায়।

এ বিষয়ের উপর জনৈক পন্ডিতের অভিমত নিম্নে পেশ করা হলঃ

"ভাল প্রত্যাশা হচ্ছে বিশ্বাসের একটা বৈশিষ্ট্য এবং বিশ্বাস ও আশা ছাড়া কোন কিছুই অর্জিত হতে পারে না।"

অন্যের উপর একজনের আস্থা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে, তখন তার নিজের উপরও তার আস্থা বৃদ্ধি পেতে থাকে, এটা একটা স্বাভাবিক ঘটনা যা কোন ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক সমাজেই ঘটে থাকে। এ ব্যাপারে একটা সত্য আমাদের উপেক্ষা করা ঠিক হবে না এবং তা হচ্ছে এই যে আশাবাদিতা অন্যের উপর আস্থা স্থাপন ও যে কোন লোকের উপর দ্রুত বিশ্বাস স্থাপনের মধ্যে একটা বড় রকমের পার্থক্য রয়েছে। আস্থা বলতে এটা বুঝায় না যে একজন মুসলমান তার অচেনা অজানা সব লোকদের কাছে পুরাপুরি নতি স্বীকার করবে অথবা যথাযথ পরীক্ষা করে কারুর কথার সত্যতা সম্পর্ক নিশ্চিত না হয়ে কোন কথা শুনতে থাকবে।' একইভাবে আমরা আস্থা সম্পর্কিত ধারণাকে সাধারণভাবে প্রয়োগযোগ্য করতে পারি না যাতে অন্যায়কারী ও অপরাধী হিসাবে কুখ্যাত লোকেরা এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। অন্য কথায় বলতে গেলে, আস্থার মধ্যে ব্যতিক্রম থাকবে। বিশেষ শর্তাধীনে সমাজের কিছু কিছু সদস্য আস্থার আওতা বহির্ভূত থাকবে। বস্তুতঃপক্ষে, আস্থা স্থাপনকারী ব্যক্তিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে এবং প্রত্যেক বিষয়ের প্রত্যাশিত সিদ্ধান্ত বিস্তারিতভাবে জেনে নিতে হবে।

অতএব, তার আচার-আচরণ পূর্বাহ্নিক সতর্কতা ও মনোযোগিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং তার কাজকর্মসমূহ সতর্ক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও গভীর চিন্তা গবেষণার ভিত্তিতে সম্পাদিত হতে থাকবে।

ইসলাম আশাবাদী স্বভাব ও আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশার আহবান জানায়। ইসলাম ঈমানদারদের অন্তরকে ঈমান দিয়ে পূর্ণ করে তার মধ্যে শিকড় গজিয়ে দিয়েছে। এভাবে আমাদের ধর্ম তার অনুসারীদেরকে শান্তি ও দৃঢ়তার পথে পরিচালিত করে পবিত্র কালামে পাকের বর্ণনামতে আমাদের সম্মানিত রাছুল (দঃ) এত দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন যে মুনাফিকরা এজন্য তাঁর সমালোচনা করতো।

ইসলাম আশাবাদী স্বভাব ও আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশার আহবান জানায়

ইসলাম তার অনুসারীদেরকে পরস্পরের প্রতি আস্থাশীল ও অন্যদের সদিচ্ছার উপর আশাবাদী হওয়ার নির্দেশ দেয়। সঠিক তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্য্যন্ত একজন মুসলমানকে অপরাধী হিসেবে অভিযুক্ত করার অনুমতি ইসলাম কাউকে দেয়নি।

আমিরুল মোমেনীন (আঃ) বলেছেনঃ "খারাপ মনে করার এমন কোন কারণ না ঘটা পর্যন্ত তোমরা অন্য ভাইদের সম্পর্কে ভাল আশা পোষণ কর। ভাল হওয়ার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকা পর্যন্ত কোন ভাই-এর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করিও না।

– *জামি আস সাদাৎ দ্বিতীয় খন্ড ২৮ পৃঃ*

একজন মানুষ যখন অন্য মানুষের প্রতি আস্থাশীল হয় তখন ইহা তাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভালবাসা বৃদ্ধি করে ও তাদের জীবনে ঘনিষ্ঠতা এনে দেয়। মুসলমানদের ইমামরা বিভিন্নভাবে আস্থাশীলতার গুরুত্ব প্রকাশ করেছেন।

ইমাম আলী (আঃ) একদা বলেছেনঃ "যে অন্যদের উপর আস্থা স্থাপন করে সে তাদের ভালবাসা অর্জন করে।

–গুরার আল হিকাম

ডাঃ মার্ডিনের উক্তি নিম্নরূপঃ

যখন তুমি কারুর সথে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা কর তখন তার ইতিবাচক দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য কর, অতঃপর তার মধ্যে যে সব ভাল বৈশিষ্ট্য তুমি পেয়েছো, তা তোমার বিবেক দিয়ে উপলব্ধি করার চেষ্টা কর। তুমি যদি এ

পরামর্শ তোমার অন্তরের মধ্যস্থলে স্থাপন করতে সক্ষম হও, তবে তুমিও ভাল ও সন্তোষজনক জীবন যাপন করতে পারবে এবং তুমি দেখতে পাবে যে তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকারী লোকেরা ও তাদের ভাল ও স্নেহশীল দিকটাই তোমার কাছে উপস্থাপন করতে থাকবে।

–পিরোজী ফিক্‌র (পার্সীয়ান)

এমনকি আশাবাদিতা ও আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশা বিপথগামী লোকদের চিন্তা ও আচরণকেও প্রভাবিত করে থাকে। মোট কথা আশাবাদিতা ও আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশা এ ধরনের লোকদের মুক্তির পথ সুগম করে।

ইমাম আলী (আঃ) একদা বলেছেনঃ

"আস্থাপূর্ণ প্রত্যাশা পাপাচারে লিপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করে।"

ডেল কার্ণেগী বলেনঃ

"সম্প্রতি আমি বিশেষ সুবিধাভোগী কিছু রেস্তোরাঁর ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করেছি।। এ বিশেষ ধরনের রেস্তোরাঁকে, 'দি অনারেবল ডিল' নামে অভিহিত করা হত। ১৮৮৫ সনে প্রতিষ্ঠিত এসব রেস্তোরাঁর কর্মচারীরা কখনও খদ্দেরদেরকে কোন বিল দিত না, এর পরিবর্তে খদ্দেররা তাদের নির্দেশক্রমে পরিবেশিত খাবারের মূল্য নিজেরাই হিসেব করে, কোন প্রশ্নের অবতারণা ছাড়াই, ক্যাশিয়ারের নিকট পরিশোধ করে দিত। আমি ম্যানেজারকে বললাম অবশ্যই আপনাদের কোন গুপ্ত পরিদর্শক রয়েছে! আপনার রেস্তোরাঁর সকল খদ্দেরকে নিশ্চয়ই আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না? প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন–না, আমরা আমাদের খদ্দেরদেরকে গোপনে পাহারা দেই না। এতদসত্ত্বেও আমরা আমাদের পদ্ধতিকে সঠিক বলে বিশ্বাস করি। অন্যথায় আমরা কিছুতেই বিগত শতাব্দী ধরে এতটা এগিয়ে যেতে পারতাম না। এই রেস্তোরাঁর খদ্দেররা অনুভব করে যে, তাদের সাথে সম্মানজনক আচরণ করা হচ্ছে। এই অনুভূতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই ধনী, নির্ধন, চোর, ভিক্ষুক সবাই এখানে তাদের প্রতি প্রদত্ত আচরণের অনুরূপ প্রত্যাশিত আচরণ করে থাকে।"

সামাজিক মনোবিজ্ঞানী জনাব লুই বলেছেন,

"তুমি যদি একজন অস্থিরচিত্ত বদ্‌মেজাজী লোকের সাথে কাজ কারবার করতে চাও এবং তাকে ভাল ও দৃঢ়তার পথে পরিচালিত করতে চেষ্টা কর তাহলে তাকে একথা বুঝতে দাও যে তুমি তার বিশ্বস্ততায় বিশ্বাসী এবং তার সাথে একজন শ্রদ্ধেয় ও সম্মানীত ব্যক্তির মত ব্যবহার করতে থাকবে। পরিণতিতে তুমি তাকে তার উপর আরোপিত আস্থা রক্ষা করতে দেখতে পাবে। এর ফলে, সে তাকে তোমার আস্থালাভের যোগ্য প্রমাণ করার জন্য এমনসব

কাজ করতে চেষ্টা করবে যা তাকে তোমার আস্থা রক্ষা করার যোগ্য করে গড়ে তুলবে।"

–হাউ টু উইন ফ্রেন্ডস

ডাঃ গিলবার্ট রোবেন লিখেছেন,

"ছেলেমেয়েদের উপর আস্থা স্থাপন কর, আমি একথা বুঝাতে চাই যে তাদের সাথে এমন আচরণ কর যেন তারা কখনও কোন ভুল করে নাই। অন্যকথায় বলতে গেলে তাদের অতীতকে মুছে ফেল এবং তাদের ভুল আচরণ মাফ করে দাও। যারা উত্তম আচরণ করেনা তাদের উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব অর্পণ কর। তুমি তাদেরকে প্রতিটি কাজ দেওয়ার সময় এমন ভাব দেখাবে যাতে মনে হবে যে তারা তাদের আচরণের উন্নতি করেছে এবং তোমার প্রদত্ত কাজ করার মত যোগ্যতা তারা অর্জন করেছে। সংশোধনের পথে যেসব বাধা রয়েছে উত্তম আচরণ ও আত্মবিশ্বসের দ্বারা তা দূর করা সম্ভব। এখান থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে অধিকাংশ অবাঞ্ছিত কাজ হচ্ছে মানুষের ব্যক্তি জীবনে খালি স্থানসমূহ পুরণ করার জন্য সৃষ্ট প্রতিক্রিয়া বৈ আর কিছুই নয়।"

স্যার ইয়াল বিনত ঐ সমস্ত ছেলেমেয়েদের উপর আস্থা স্থাপনের কথা বলেছেন যাদের কিছু কিছু টাকা চুরির অভ্যাস রয়েছে। অলস লোকদের কর্মক্ষমতার উপযোগী এমন কিছু কিছু কাজও তাদেরকে দিতে বলেছেন। আস্থাপূর্ণ সম্পর্কের প্রত্যাশা মানুষকে নিশ্চয়তা প্রদান করে।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ–

"আস্থা হচ্ছে অন্তরের শান্তি ও ঈমানের নিরাপত্তা।"

– গুরার আল হিকাম পৃঃ ৩৭৬

আস্থাপূর্ণ সম্পর্কের প্রত্যাশা মানুষকে তাদের দুঃখ–দুর্দশা ও দুর্ভাগ্যসমূহের সৃষ্ট চাপ হতেও মুক্ত করে।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ–

"আস্থাপূর্ণ সম্পর্কের প্রত্যাশা বিষন্নতা হ্রাস করে।"

ডাঃ মার্ডিন বলেছেনঃ–

"আমাদের দৃষ্টিতে আমাদের দুঃখ–দুর্দশা লাঘব করে আমাদের জীবনকে সফলতার পথে পরিচালিত করার উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য এবং জীবনকে সুন্দরতম করার জন্য আশাবাদিতা ও আস্থাপূর্ণ সম্পর্কের প্রত্যাশা ব্যতীত আর একটা জিনিষও নেই। আপনি আপনার শারীরিক অসুস্থতা ও তার

ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে যতখানি সতর্কতা অবলম্বন করেন ঠিক তেমনিভাবে যন্ত্রণাদায়ক দুশ্চিন্তার ব্যাপারেও আপনাকে ততখানি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। আশাবাদী চিন্তার প্রতি মনকে উন্মুক্ত করে দিন এবং তখন আপনি দেখতে পাবেন যে, কত সহজে আপনি দুশ্চিন্তার বোঝা হতে আপনাকে মুক্ত করতে পারছেন।"

– *ফিরোজী ফিক্‌র*

মুসলমানের জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে তারা একে অপরের প্রতি এতই ভাল আচরণ করবে যেন তাদের সমাজে কোন ক্ষতিকর প্রত্যাশা ঢুকে পড়ার কোন সুযোগ অবশিষ্ট না থাকে। হযরত ইমাম আলী (আঃ) এ বিষয়ের উপর মুসলমানদেরকে এ উপদেশ দিতেন যেন তারা পরস্পরের প্রতি ইতিবাচক আচরণ করে এবং আস্থাহীনতার কারণ সৃষ্টিকারী কোন আচরণ না করে। তিনি তাদেরকে এমন পরীক্ষাও দিতেন যেন মানুষ সন্দেহের স্থানগুলো পরিহার করে চলে। তিনি আরও বলেছেন ঃ– "যে আশা করে আপনার উপর আস্থা স্থাপন করেছে অতএব, আপনি তাকে নিরাশ করবেন না। ইমাম আলী (আঃ) অন্যদের সম্পর্কে তাদের ধারণাকে মানুষের যুক্তির জন্য বিচারের বিষয় বানিয়েছেন। যখন তিনি বলেছেনঃ

"মানুষের প্রত্যাশা হচ্ছে তার যুক্তির মানদন্ড এবং তার আচরণ হচ্ছে তার বিশ্বস্ততার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সাক্ষী।"

– *গুরার আল হিকাম পৃঃ ৪৭৪*

কেননা মানুষের নিকট হতে নেতিবাচক প্রত্যাশার অধিকারী মানুষের, যুক্তি দিয়ে বিচার করার কোন ক্ষমতা থাকে না। ইমাম আলী (আঃ) খারাপ চিন্তার পরিহারকে মুসলমানদের আত্মিক শক্তির লক্ষণ হিসাবে অভিহিত করেছেন। তিনি আরও বলেছেন ঃ

"যে লোক তার ভাই এর অন্যায় প্রত্যাশাকে প্রত্যাখ্যান করে সে সুস্থ যুক্তির অধিকারী ও তার আত্মা প্রশান্ত।"

–*গুরার আল হিকাম পৃঃ* ৬৭৬

স্যামুয়েল স্মাইলস বলেনঃ

"এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সব লোক বলিষ্ঠ স্বভাব ও আত্মার অধিকারী, স্বভাবতঃ তারাই সুখী ও জীবনে আশাবাদী হয়ে থাকে। তারা প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি জিনিসের প্রতি আস্থা ও শান্তির সাথে দৃষ্টিপাত করে। জ্ঞানী লোকেরা প্রতিটি মেঘের আড়ালে কিরণদানকারী সূর্যকে দেখতে পায় এবং এটা অনুভব

করতে থাকে যে প্রতিটি দুঃখ মুহিবতের পশ্চাতে কাঙ্খিত সুখ বিরাজমান। এসব লোক প্রতিটি নূতন সমস্যায় জড়িত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবারে নূতন শক্তি প্রত্যক্ষ করতে থাকে। প্রতিটি দুঃখ ও বিষণ্নতার মধ্যে তারা আশার আলো দেখতে পায়। এ ধরনের লোকেরাই প্রকৃত সুখ উপভোগ করে এবং এদের সমর্থকরাই সৌভাগ্যবান। তাদের চোখের মধ্যে একটা সুখের আলো জ্বলতে থাকে এবং তাদেরকে সর্বদা সহাস্য দেখা যাবে। এসব লোকের আত্মা তারকার মত জ্বলতে থাকে এবং এরা সবকিছুকেই জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দেখে এবং যখন যে রঙে দেখতে চায় তেমনি দেখতে পারে।"

ইমাম সাদেক (আঃ) ভাল প্রত্যাশাকে এক মুসলমানের প্রতি অন্য মুসলমানের অধিকার হিসেবে অভিহিত করেছেনঃ

"সন্দেহ পোষণ না করা। একজন ঈমানদারের প্রতি অন্য ঈমানদারের অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত।"

–উসুসুল কাফী ১ম খন্ড পৃঃ ৩৯৪

সত্যিকার অর্থে যে উপাদান মানুষকে আশাবাদী ও বিশ্বস্ততাপূর্ণ প্রত্যাশা প্রদান করতে সক্ষম তা হচ্ছে ঈমান। যদি সকল মানুষ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে এক আল্লাহ, এক রাসুল ও একই শেষ দিবসে বিশ্বাসী হতো তাহলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এক মানুষ অন্য মানুষকে সঠিকভাবে বিশ্বাস করতো, ঈমানের অভাবের কারণেই সমাজে পারস্পরিক আস্থাহীনতার এ কঠিন রোগ দেখা দিয়েছে। একজন ঈমানদার যার অন্তর আল্লাহর উপর বিশ্বাস ও নির্ভরশীলতার আনন্দে পরিতৃপ্ত থাকে, যখনই কোন দুর্বলতা দেখা দেয় তখনই সে আল্লাহর সীমাহীন শক্তির উপর নির্ভর করে। বিপদ আপদে সে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করে। এটা তার অন্তরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তার নৈতিকতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

৩

হতাশা

* জীবনের আলো ও অন্ধকার বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণসমূহ
* হতাশার নেতিবাচক পরিণতি
* ইনসাফ বনাম হতাশা

জীবনের আলো ও অন্ধকার

বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ

দুঃখ ও সুখে গড়া মানুষের এ জীবন। এদু অবস্থার যে কোন একটা অবস্থার মধ্যে মানুষের পার্থিব জীবনের একটা অংশ নিবিষ্ট থাকে। প্রতিটি মানুষকে তার অভিজ্ঞতার নিজস্ব অংশের সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে সে তার জীবনের সমস্যাবলী হতে উদ্ভুত সুখ ও দুঃখ দুর্দশা ভোগ করে। এ তিক্ত বাস্তবতার কারণেই মানুষের জীবন সুখ দুঃখের মধ্যে উঠানামা করে। আমরা মানুষ হিসেবে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণকারী এ শাশ্বত বিধানসমূহকে পরিবর্তন করে আমাদের ইচ্ছামাফিক করতে পারি না। তথাপি জীবনের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করার পর, এ বিশাল বিশ্বে আমাদের জীবনের প্রকৃত সত্যকে ম্লানকারী কুৎসিত সত্তাসমূহকে পরিত্যাগ করতে পারি এবং আমাদের স্পষ্ট ধারণাকে আমাদের অস্তিত্বের সুন্দর লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে পারি।

বিস্ময়সৃষ্টিকারী সৃষ্টিসমূহও সূক্ষ্ম নির্ভুল জ্ঞানে পরিপূর্ণ এ বিশ্ব আমাদেরকে বলে দেয় যে প্রতিটি সৃষ্টির একটা উদ্দেশ্য রয়েছে যার জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অপরপক্ষে, আমরা বিশ্বজাহানের মধ্যকার উজ্জ্বল দিকসমূহকে বাদ দিয়ে বা ভুলে গিয়ে এর বিষাদময় দিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করতে পারি। শেষ পর্যন্ত এটা প্রতিটি মানুষের উপর নির্ভর করে যে সে তার চিন্তার গতিকে কোন্‌দিকে পরিচালিত করার সিদ্ধান্ত নিবে। সুতরাং সে তার জীবনকে যেভাবে দেখতে চায় তদানুযায়ী সে তার জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তি বাছাই করবে।

আমাদের জন্য ক্ষতিকারক উপাদানগুলো পরিহার করে আমাদের জীবনের জন্য যা সঠিক ও যথাযথ, তা বাছাই করে নেওয়ার উপযোগী করে, আমাদের চিন্তা ও বিচার ক্ষমতাকে গড়ে তুলতে হবে, যেন আমরা আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের যোগ্যতা হারিয়ে না ফেলি। এটা করতে ব্যর্থ হলে আমরা অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারি অথবা ধ্বংসাত্মক দুর্ভাগ্যের শিকারেও পরিণত হতে পারি। আমাদের অনেকে মনে করেন যে আমাদের জীবনের ঘটনাপ্রবাহ যদি অন্য রকম হতো তাহলে হয়তো আমরা সুখী হতাম। বস্তুতঃপক্ষে, এসব লোকের সমস্যা তাদের জীবনের

ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে সম্পর্কিত নয় বরং ব্যাপারটা পদ্ধতিগত যা দিয়ে এসবের মুকাবিলা করা হচ্ছে। আমরা ইচ্ছা করলে ঘটনাসমূহের প্রভাব পরিবর্তন করতে পারি, অথবা এর কোন কোনটার ফলাফলকে আমাদের প্রয়োজনীয় খাতে পরিবর্তিত করতে পারি।

এজন্য প্রখ্যাত চিন্তাবিদ লিখেছেন ঃ

আমাদের কল্পনা সবসময় ঘৃণা ও অসন্তোষের ক্ষেত্রে বিচরণ করে থাকে, তাই আমরা সব সময় চীৎকার করি ও অভিযোগ করি। কারণ, আমাদের নৈতিক চেতনার মধ্যে চিৎকারের কারণ নিহিত রয়েছে। আমাদেরকে এমনিভাবে তৈরী করা হয়েছে যে আমাদের মনের ঝোঁক বা গতি সর্বদা এমন সব জিনিসের প্রতি নিবদ্ধ যা আমাদের রূহ বা আত্মার জন্য মোটেও উপযুক্ত নয়। প্রতিদিন আমাদের মনে নতুন নতুন জিনিস লাভের আশা, আকাঙ্খা দেখা দেয় অথবা সম্ভবতঃ আমরা সঠিকভাবে জানি না আমরা কি চাই। এরপরও অন্যরা যখন সুখী হয়েছে, তখন আমরা তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হই এবং দুঃখ পেতে থাকি। আমরা দুর্ব্যবহারকারী ছেলেমেয়েদের মত, যারা নতুন নতুন অজুহাত বের করে আর কাঁদতে থাকে। তাদের কান্না দেখে আমাদের অন্তরে দুঃখ হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাদেরকে প্রকৃত পরিস্থিতি বুঝাতে সক্ষম না হই এবং তাদের এই অলীক কল্পনা ও অবান্তর চাহিদা পরিহার করাতে না পারি ততক্ষণ পর্যন্ত আমরাও শান্তি পাই না। এসব ছেলেমেয়েরা, তাদের অসংখ্য আশা আকাঙ্খার কারণে অন্য আর কিছুই দেখতে পায় না। সুতরাং তাদের দুঃখ দুর্দশা চলতেই থাকে। এটা আমাদের দায়িত্ব যে আমরা যেন জীবনের ভাল দিকসমূহ সম্পর্কে তাদের চোখ খুলে দেই। আমাদেরকে তাদের অবশ্যই একথা বুঝাতে হবে যে একমাত্র ঐসব লোকেরাই ফুল ও গোলাপের চাষ করতে সক্ষম যারা চোখ খুলে জীবনের বাগান দেখেছে। অন্ধ ব্যক্তিরা, একমাত্র কাঁটা ছাড়া আর কিছুই পাবে না। আমরা যদি বিষণ্নতা ও হতাশার সীমানা অতিক্রম করতে সক্ষম হই এবং প্রকৃত ঘটনাসমূহকে পরীক্ষা করতে পারি, তাহলে এখনকার মত আতঙ্ক সৃষ্টিকারী একটা সময়েও আমরা দেখতে পাবো যে আমাদের জীবনের বাগিচার সর্বত্র ফুল ও গোলাপের দৃশ্য সমেত সবত্র প্রস্থানের পথসমূহ বিরাজমান রয়েছে, যা সব সময় দর্শনার্থীদের দৃষ্টিকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করতে থাকবে।

মানুষের সুখ-শান্তির উপর তার চিন্তার গভীর প্রভাব রয়েছে।

বস্তুতঃপক্ষে, মানুষের সুখের একমাত্র ফলপ্রসূ উপাদান হচ্ছে তার চিন্তা ও বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা। একজন হাতাশাগ্রস্ত লোকের দৃষ্টিতে একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা অসহনীয় ও ধ্বংসাত্মক, কিন্তু একজন আশাবাদী লোকের দৃষ্টিতে যিনি সবকিছুকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে থাকেন, তিনি কখনও এ ধরনের ঘটনায় ভেঙ্গে পড়বেন না প্রতিরোধের মনোভাবও হারাবেন না। আশাবাদীরা কখনও বিনয়, সংযম ও ধৈর্যের সীমা লংঘন করে না। কাল্পনিক দুঃখে পরিবেষ্টিত হওয়ার চিন্তা যাদের মন মগজকে সদা আচ্ছন্ন করে রাখে, তাদের জীবন হয় অসুখী, দুঃখজনক ও বিষাদময়। অত্যধিক প্রতিক্রিয়াশীলতার কারণে তারা তাদের অনেক শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং দুনিয়ার সৌভাগ্য ও ভাল জিনিসসমূহ সম্পর্কে এক কঠিন অজ্ঞতার মধ্যে নিজেদেরকে নিমজ্জিত করে রাখে।

একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির মতে ঃ

"এ পৃথিবীতে যে যেভাবে চলতে চায় পৃথিবীও তার সঙ্গে তদ্রুপ ব্যবহার করে থাকে। এভাবে তুমি যদি পৃথিবীর প্রতি হাস, পৃথিবীও তোমার সঙ্গে হাসতে থাকবে। আর তুমি যদি বিষণ্ন দৃষ্টিতে দেখ তা হলে পৃথিবীও তোমার কাছে বিষণ্ন মনে হবে। তুমি যদি পৃথিবীকে নিয়ে চিন্তা করতে থাক, এটা তোমাকে চিন্তাশীলদের মধ্যে পরিগণিত করবে। আর তুমি যদি দয়ালু এবং সত্যবাদী হও, তুমি তোমার চতুর্দিকে এমন সব লোকদের দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখতে পাবে যারা তোমাকে ভালবাসবে এবং তাদের অন্তরের সব ভালবাসা ও সম্মানকে তোমার জন্য উজাড় করে দেবে।"

দুঃখ যন্ত্রণার বাহ্যিক তিক্ত দৃশ্য সত্ত্বেও এটা মানুষের মন ও আত্মার জন্য অত্যন্ত সুফলদায়ক। দুঃখ-কষ্টের কালিমার মধ্যে মানুষের আত্মিক শক্তিসমূহ অধিকতর সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। অবিরত ত্যাগ ও আপোষহীন সংগ্রামের মধ্য হতে মানবীয় শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ হতে হতে মানুষকে তার পরিপূর্ণতার চূড়ান্ত শিখরে পৌছায়ে দেয়।

হতাশারনেতিবাচকপরিনতি

হতাশা এক ভয়াবহ আত্মিক রোগ। এটা বহুবিধ ক্ষতি, দুর্বলতা এবং নিরাশার কারণ। হতাশা হচ্ছে এমন একটা মর্মান্তিক দুর্ভাগ্য যা মানুষের আত্মার উপর নিপীড়ন চালাতে চালাতে মানুষের ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন

এক সংশোধনাতীত দুর্বলতার জন্ম দেয় যা কিছুতেই মুছে ফেলা যায় না।

দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে করতে মানুষ এতই সংবেদনশীল হয়ে পড়ে যে কোন মুহূর্তে এসবের পরিণতি হিসেবে মানুষের আবেগ অনুভূতিতে এক প্রচণ্ড বিদ্রোহ ও হতাশা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এভাবে মানুষের মধ্যে হতাশা-নিরাশা দেখা দিতে দিতে এটা তার বিচার বুদ্ধির প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে ফেলে। যার অন্তরের আয়না নিরাশার ছায়ায় কালিমালিপ্ত হয়ে পড়েছে, সৃষ্টির সৌন্দর্য তার চোখে প্রতিভাত হবে না। অধিকন্তু সুখও তার কাছে বিরক্তি ও দুর্দশার আবরণে আচ্ছাদিত মনে হতে থাকবে এবং তার বদচিন্তার কারণে নিরপরাধ লোকদের আচরণকেও তাদের কাছে অসৎ উদ্দেশ্যমুক্ত বলে অনুভূত হবে না। ওদের বিচার বিবেচনা অত্যধিক নেতিবাচক হয়ে পড়ার কারণে তারা তাদের সুফলদায়ক শক্তিগুলো হারায়ে ফেলবে। কেননা তাদের ভ্রান্ত কল্পনা তাদের নিজেদের জন্য অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে। যে সব দুর্ঘটনার মুকাবিলা তাদেরকে কখনও করতে হয়নি এমনকি ভবিষ্যতে হয়ত এধরনের কোন দুর্ঘটনা ঘটার আদৌ কোন সম্ভাবনা নেই, অথচ এমনসব দুশ্চিন্তা তাদের যোগ্যতার অপচয় ঘটাচ্ছে। আমরা পূর্বেই বলেছি যে আশাবাদিতার ফলসমূহ যেভাবে তার পরিবেশের চতুর্দিকে আশার আলো ছড়িয়ে দিয়ে তার অন্তরের শক্তিসমূহকে জীবন্ত করে তোলে তেমনিভাবে হতাশা মানুষের মধ্যে দুশ্চিন্তা ও কষ্টদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদেরকে মানবতার জন্য জীবনের পথ প্রস্তুতকারী আশার আলো হতে বঞ্চিত করে। হতাশাজনিত ক্ষতিকর পরিণতি শুধু যে আত্মা পর্যন্ত সীমিত থাকে তা নয় বরং এর ফলে তাদের দেহও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে যে হতাশাগ্রস্ত রোগীদের রোগমুক্তির হার অনেক কম।

জনৈক চিকিৎসা বিজ্ঞানীর মতে ঃ

"এমনসব রোগীদের চিকিৎসা করা অত্যধিক কঠিন যারা প্রতিটি ব্যাপারে সন্দেহপ্রবণ এবং প্রতিটি মানুষকে সন্দেহের চোখে দেখে। এদের চাইতে বরং এমন লোককে বাঁচান সহজ যারা আত্মহত্যা করার জন্য নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত লোকদেরকে ঔষধ দেওয়া উত্তপ্ত তেলে পানি দেওয়ার সামিল। ভাল চিকিৎসা পেতে হলে রোগীর মধ্যে আস্থাবোধ ও মানসিক প্রশান্তি থাকা অত্যাবশ্যক।"

হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিরা অন্যদের সঙ্গে কাজ কারবার করতে গিয়ে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে সন্দেহ প্রবণতা ও একাকীত্ব অনুভব করতে থাকে। এ ধরনের অসন্তোষজনক পরিস্থিতির কারণে এসব লোক তাদের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষমতাসমূহ হারিয়ে ফেলে, এভাবে তারা তাদেরকে এক অবাঞ্ছিত জীবনের দিকে পরিচালিত করে। এসব সত্যের আলোকে, মানুষের আত্মহত্যার কারণসমূহের মধ্যে, হতাশাকেই প্রধান হিসেবে পাওয়া গেছে। আমরা যদি মানব সমাজের কোন শ্রেণীকে পরীক্ষা করি, আমরা দেখতে পাব যে পরনিন্দা, পরচর্চা ও গালগল্পের উৎস হচ্ছে সন্দেহ। আর বিচার-বিশ্লেষণ ও চিন্তাভাবনার অভাব হতে সন্দেহের জন্ম হয়। বিচার ক্ষমতার দুর্বলতা ও কল্পনা বিলাসী হওয়ার কারণে মানুষ সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সত্যতা নির্ধারণ না করেই অন্য মানুষকে বিচার করে থাকে। এসব লোক তাদের সন্দেহ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হয়েই আন্দাজ অনুমান করে চলে। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা অতি সহজে তাদের নিজস্ব ব্যক্তিগত মতামতই সযত্নে লালন করে। এ ধরনের মারাত্মক দুর্বলতার ফলে ঐক্য ও সম্পর্কের আন্তরিকতা বিনষ্ট হতে থাকে এবং মানুষ, পারস্পরিক আস্থাশীলতার সুফল হতে বঞ্চিত হয়, যা মানুষের আচার-আচরণ ও আত্মাকে দুর্নীতিগ্রস্ততার দিকেও টেনে নিয়ে যায়।

ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য ক্ষতিকারক অধিকাংশ ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা ও শত্রুতার ঘটনা, সত্যের পরিপন্থি সন্দেহ ও অবিশ্বাস হতে জন্ম লাভ করে। সমাজে যখন সন্দেহের বিস্তার ঘটে তখন এটা দার্শনিক ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যেও ঢুকে পড়ে। ইতিহাসে এমন বহু নিদর্শন পাওয়া যায় যেখানে পণ্ডিত ব্যক্তিরাও সমাজ ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে সমালোচনা ও অনুসন্ধানের ভিত্তিতে তাদের মতামত দিতে গিয়ে সমাজকে হতাশাব্যঞ্জক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করতঃ মারাত্মক ভুল করেছেন। সুতরাং, এ সমস্ত বিভ্রান্ত পণ্ডিতরা সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করতে গিয়ে, তাদের ক্ষতিকর চিন্তার কারণে তারা সমাজের উ ৎসাহ উদ্দীপনাকে বিষাক্ত করে ফেলে। তারা ঈমানের মৌলিক বিষয়সমূহকেও সমালোচনা ও বিরক্তি কর করে তোলে।

আবু আল আলা আল মৌরী এজন হতাশাগ্রস্ত পণ্ডিতদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই বিখ্যাত দার্শনিক জীবন সম্পর্কে এত বেশী নেতিবাচক চিন্তা করতেন যে, তিনি মানব জাতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তির উদ্দেশ্যে যৌনমিলনকে

নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন, যেন এভাবে জীবনের দুঃখদুর্দশা হতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

ইসলাম বনাম হাতাশা

কালামে পাক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে হতাশা ও কুচিন্তাকে পাপ ও মন্দকাজ হিসেবে অভিহিত করেছে এবং মুসলমানদেরকে পরস্পরের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করা সম্পর্কে সতর্ক করেছে।

"হে ঈমানদারগণ! অধিকাংশ অমূলক ধারণা করা পরিহার কর, কেননা আন্দাজ অনুমান কোন কোন ক্ষেত্রে নিশ্চিতরূপে গুনাহের কাজ হিসাবে পরিগণিত।"

– আল কুরআন, ৪৯ ঃ ১২।

ইসলাম ধর্ম সুনির্দিষ্ট সাক্ষ্য না পাওয়া পর্যন্ত সন্দেহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। আল্লাহর নবী (দঃ) বলেছেন ঃ

"এক মুসলমানের জীবন, রক্ত ও সম্পদ অন্য মুসলমানের কাছে পবিত্র। এক মুসলমানকে অন্য মুসলমান সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা করা হতে নিষিদ্ধ করাহয়েছে।"

তিরমিজি, ১৮ অধ্যায়; ইবনে মাজা, ২য় অধ্যায়; মুসলিম, ৩২ অধ্যায়; আহম্মদ, ২য় খণ্ড, ২৭৭ পৃঃ এবং ৩য় খণ্ড, ৪৯১ পৃঃ।

সুতরাং, উপযুক্ত সাক্ষী ব্যতিরেকে একজনের সম্পত্তি অন্যকে হস্তান্তর করা যেমন নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে সন্দেহাতীত প্রমাণ ব্যতিরেকে একজন মানুষকে কোন অন্যায় কাজের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা বা সন্দেহ করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

আমীরুল মুমেনীন (আঃ) বলেছেন ঃ

"নিছক আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে একজন বিশ্বস্ত লোকের বিচার করা ঠিক নয়।"

– নাহজুল বালাগা, ১৭৪ পৃঃ।

অতঃপর তিনি সন্দেহজনক কাজের খারাপ ও দুঃখজনক দিকসমূহ তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"সন্দেহ করার ব্যাপারে সতর্ক হও, কেননা সন্দেহ ইবাদত ধ্বংস করে এবং গুনাহ বৃদ্ধি করে।"

– গুরার আল হিকাম, ১৪৫ পৃঃ।

এমনকি তিনি একজন দয়ালু ব্যক্তিকে অত্যাচারী হিসাবে সন্দেহ করার বিষয় বর্ণনা করেছেন ঃ

"দয়ালু ব্যক্তিকে (সৎকর্মশীল) সন্দেহ করাকে তিনি নিকৃষ্ট পাপ ও কুৎসিৎ ধরনের জুলুম বলে অভিহিত করেছেন।"

– গুরার আল হিকাম, ৪৩৪ পৃঃ।

তিনি আরও বলেছেন, যে তোমার প্রিয়জনকে সন্দেহ করার ফলে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং শেষ পর্যন্ত তা বিচ্ছিন্নতায় পর্যবসিত হয়।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"সন্দেহপ্রবণ ব্যক্তি, বন্ধু ও প্রিয়জনের সঙ্গেও শান্তিতে থাকতে পারে না।"

–গুরার আল হিকাম, ৬৯৮ পৃঃ।

সন্দেহপ্রবণতা, অন্যান্য ব্যক্তি ও সন্দেহকারীর নিজস্ব উৎসাহ উদ্দীপনা ও আচরণের উপর প্রতিকূল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। সন্দেহ কোন কোন সময় সন্দেহকারী ব্যক্তিদেরকে সঠিক পথ হতে বিভ্রান্ত করে দুর্নীতি ও নীচতার দিকে পরিচালিত করে।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"সন্দেহ, কাজকর্মকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং মন্দ প্রবণতাকে উৎসাহিত করে।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৪৩৩।

ডাঃ মার্ডিন লিখেছেন ঃ

"কোন কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মালিকরা তাদের কর্মচারীদেরকে চুরি করে বলে সন্দেহ করে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তাদের প্রতি চুরি করার সন্দেহ, তাদেরকে চুরি করতে বাধ্য করে। যদিও সন্দেহ, কথা ও কাজে প্রকাশ পায় না, তথাপি এটা সন্দেহভাজন ব্যক্তির মনোভাবকে প্রভাবিত করে এবং যে ব্যাপারে তাকে সন্দেহ করা হয়েছে সে কাজ করার দিকে তাকে পরিচালিত করে।"

ইমাম আলী (আঃ)ও সন্দেহ সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন ঃ

"সঠিক না হলেও সন্দেহ পরিহার কর কেননা এটা সুস্থকে রোগাক্রান্ত এবং নিরপরাধীকে সন্দেহপ্রবণ করে।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ১৫২।

তিনি আরও ঘোষণা করেছেন যে, সন্দেহপ্রবণ লোকেরা সুস্থ দেহ ও উৎসাহ উদ্দীপনা হতে বঞ্চিত।

"একজন সন্দিগ্ধচিত্ত মানুষ কখনও সবল সুস্থ দেহের অধিকারী হতে পারে না।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৮৩৫।

ডাঃ কার্ল এ সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"কতকগুলো অভ্যাস, যেমন মানুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করাও সন্দেহকারী ব্যক্তির বেঁচে থাকার যোগ্যতা হ্রাস করে। এসব নেতিবাচক আচরণের অভ্যাস মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক দয়ামায়ার সম্পর্ক ও দেহের লালাগ্রন্থির উপর প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এসব মানুষের দেহের বাস্তব ক্ষতিও সাধন করতে পারে।"

–রাহ ওয়া রাজম জিন্দাগী।

ডাঃ মার্টিন আরও বলেনঃ

"সন্দেহ স্বাস্থ্যের ক্ষতি সাধন করে ও আচরণের শক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। সামঞ্জস্যশীল আত্মার অধিকারীরা কখনও ক্ষতির আশঙ্কা করে না। কেননা, তারা জানে যে ভাল হচ্ছে একটা শাশ্বত সত্য। এজন্য তারা সর্বদা ভালরই প্রত্যাশা করে থাকে, এবং তারা এটাও জানে যে খারাপ একমাত্র ঐসব লোকেরাই করতে পারে, যাদের ভাল করার শক্তি অত্যন্ত দুর্বল, যেমনিভাবে আলোর অভাব হতেই অন্ধকারের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এভাবে আলোর পথ অনুসরণ কর, কেননা এটা অন্তর হতে অন্ধকার দূরীভূত করে থাকে।"

–ফিরোজী ফিক্‌র।

সন্দেহপ্রবণ লোকেরা মানুষকে ভয় করে। যেমন ইমাম আলী বলেছেন ঃ

"সন্দিগ্ধচিত্তের লোকেরা প্রত্যাশাকে ভয় করে।"

–গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৭১২।

ডাঃ ফার্মার যা বলেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

"যারা প্রকাশ্যভাবে তাদের ধারণা বা মতামত প্রকাশ করতে ভয় পায়, যেখানে অন্যসব লোকেরা তাদের মতামত খোলাখুলি পেশ করছে এবং যারা প্রশস্ত রাস্তায় বা সরকারী পার্কসমূহে তাদের আত্মীয়–স্বজনের সাক্ষাৎ এড়ায়ে চলে এবং পাশের রাস্তায় বা পেছনের গলিতে আশ্রয় গ্রহণ করে, এসব লোক হতাশাগ্রস্ত, সন্দেহপ্রবণ ও ভীত।"

–রাজখুশ বখ্‌তী।

সন্দেহ সৃষ্টিকারী উপাদানসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে খারাপ স্মৃতিশক্তি যা মানুষের শক্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"মন্দ ধারণাকারী মানুষ, মানুষের সাথে মন্দ আচরণ করে থাকে।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ২৯।

ডাঃ হালিম শাখতার বলেছেন ঃ

"যাদের আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে, তারা অত্যধিক ভাবপ্রবণ হয়ে থাকে এবং এজন্য সামান্য বিপদ আপদে তারা দুঃখ ভোগ করে। এ সমস্ত দুঃখের স্মৃতি তাদের অবচেতন মনে থেকে যায়, এবং তাদের কাজ, কথা ও বিচারশক্তিকে প্রভাবিত করে। অতি শীঘ্র তারা হতাশাচ্ছন্ন ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদের এ দুর্দশার পেছনে কিসব কারণ রয়েছে তাও তারা বুঝতে পারে না। যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিসমূহ, আমাদের অনুভূতির সম্পূর্ণ উর্ধে তাদেরকে লুকিয়ে রাখে এবং সহজে আমাদের কাছে তা ধরা দেয় না। অন্য কথায় বলতে গেলে মানুষের জন্য এটা স্বাভাবিক যে, মানুষ এসব যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতিকে পরিহার করতে পারে এবং তাদের মন হতে এসবকে উপড়ে ফেলতে পারে। এসব লুকায়িত শত্রু আমাদের আত্মার ক্ষতিসাধন, আমাদের মধ্যে ঘৃণা সৃষ্টি ও আমাদের আচার–আচরণের অধঃপতন ঘটাতে কখনও বিরত থাকে না। আমাদেরকে কখনও কখনও আমাদের নিজেদের পক্ষ হতে ও অন্যদের কাছ থেকে, এমন সব কথা শুনতে হয় বা এমনসব কাজের সম্মুখীন হতে হয় যার সপক্ষে আমরা কোন ন্যায়সঙ্গত ব্যাখ্যা উপলব্ধি করি না। তথাপি যদি আমরা সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করি তা হলে আমরা দেখতে পাবো যে এসব খারাপ স্মৃতিসমূহের দ্বারা সংগঠিত হয়েছে।" –

– রাশ্‌দে শাখচিয়্যাত।

হীন স্বভাবের লোকেরা তাদেরকে অন্যদের কাজের বিচারক নির্বাচন করে থাকে এতে অন্যদের যাবতীয় অপকর্ম তাদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ইমাম আলী (আঃ) এ সত্য তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"বদকার লোকেরা কখনও অন্যের মঙ্গল চিন্তা করে না, কেননা তারা অন্যদেরকে তাদের নিজেদের খারাপ আচরণের দৃষ্টিতে দেখে থাকে।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৮০।

ডাঃ ম্যানের বক্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হলোঃ কিছু লোক অন্যদের সাথে খারাপ আচরণের অভিযোগ এনে তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করতে চায় অথচ তারা নিজেরা ঠিক একই ধরনের আচরণ করে থাকে; নিজস্ব দুর্বলতা

ঢাকা দেওয়া ছাড়া ও একপ্রকার আত্মরক্ষা হিসেবে তারা এটা করে থাকে। এ আচরণকে দুশ্চিন্তা দূরীকরণের একটা পন্থা হিসাবে বর্ণিত হয়ে থাকে। অন্যকে নিজের সাথে তুলনা করা একটা প্রতিশোধমূলক কাজ। এ অবস্থা যত বেশী গভীর হতে থাকে এবং ব্যক্তির প্রতিরক্ষা বৃদ্ধি পেতে থাকে, সে মানসিক রোগীদের পর্যায়ে পৌছে যায়। সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য কিছু কাজ করার দ্বারা এ প্রতিরক্ষা তৈরী করা হয় যা পরবর্তী পর্যায়ে অন্যদের সাথে সম্পর্কিত করার মনোভাব সৃষ্টি করে।

– *উসূলে রাভানশীনাচী*

যখন আল্লাহর নবী (দঃ) মক্কা হতে মদীনায় হিজরত করে আসলেন, একজন লোক তাঁর কাছে এসে বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল এ শহরের লোকেরা ভাল লোক, তারা দয়ালু, আপনি এখানে এসে ভালই করেছেন। রাসূল (দঃ) বললেন, "আপনি সত্য বলেছেন।" অপর একজন লোক রাসূল (দঃ) কে এসে বললেন, আল্লাহর রাসূল এ শহরের লোকেরা বদ, এটা অপেক্ষাকৃত ভাল হত আপনি যদি হিজরত করে এখানে না আসতেন। আল্লাহর রাসূল (দঃ) তখন বললেন ঃ "আপনি সত্য বলেছেন।" যখন লোকেরা রাসূলের (দঃ) জওয়াবের কথা শুনতে পেল তখন তারা তাঁকে প্রশ্ন করলো। নবী প্রত্যুত্তরে বললেন ঃ "এরা উভয়ে তাদের অন্তরের কথা বলেছে, অতএব তারা দু'জনই সত্যবাদী।" "নবী (দঃ) যে কথাটি বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো এদের প্রত্যেকে তার নিজের সম্পর্কে সত্যবাদী।"

নিষিদ্ধ ধরনের সন্দেহ বলতে, সুস্পষ্টভাবে বিভ্রান্ত চিন্তা ও খারাপ আচার–আচরণের প্রতি মনের ঝোঁক সৃষ্টি হওয়া এবং তার উপর গোঁ ধরে থাকাকে বুঝানো হয়েছে। এধরনের সন্দেহের চেয়েও অধিকতর কঠিন হচ্ছে সে সন্দেহ দূর করা। কেননা যে চিন্তা ও আসক্তি ব্যক্তির মনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে, তা তার আচরণের উপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তার না করা পর্যন্ত, তাকে ব্যবহারশাস্ত্রগত আইনের আওতাধীন বলে বিবেচিত করা যাবে না। এ সব চিন্তা অনিচ্ছাকৃত, তাদেরকে বর্জন করাটাও অনিচ্ছাকৃত, কিন্তু সে এগুলোকে কাজে প্রকাশ করবে কি, করবে না এটা সম্পূর্ণ তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার। হতাশাগ্রস্ত লোকদের দুঃখ দুর্দশা এই ভয়াবহ বিশৃংখলা হতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত লোক যারা তাদের অতিরিক্ত সন্দেহপ্রবণতার দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে তারাই এর কারণসমূহ চিহ্নিত করতে পারে। তাদের উচিৎ তারা যেন এর প্রতিকারের ব্যবস্থা করে, তাদেরকে এ দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা হতে মুক্ত করে।

৪

মিথ্যাবাদিতা

* সমাজ জীবনে আচার-আচরণের গুরুত্ব
* মিথ্যা কথা বলার ক্ষতিকর দিক
* মিথ্যা কথা বলাকে ধর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে-

সমাজ জীবনে আচার–আচরণের গুরুত্ব

সমাজ ও জাতিসমূহের উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে আচার–আচরণ একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। আচার–আচরণ মানবতার অংশ হিসাবে জন্মলাভ করেছে। মানুষের অন্তরের সুখ–শান্তি ও আনন্দ বিধানের ক্ষেত্রে আচার–আচরণের যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে তা কেউ অস্বীকার করে না। এমনকি সামাজিক ও সরকারী পর্যায়ে চারিত্রিক সততার বুনিয়াদ ও চিন্তাকে সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এর উপযোগিতা ও সিদ্ধান্তকারী প্রভাবের ব্যাপারেও কারো কোন সন্দেহ নেই। আপনি কি এমন কাউকে দেখেন যিনি মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার ছায়াতলে থেকেও সুখের অন্বেষণে সততা ও সত্যবাদিতার পথ অনুসরণ করে কষ্ট পাচ্ছেন? উন্নত আচার–আচরণ এতই প্রয়োজনীয় যে, এমনকি ধর্মে বিশ্বাস করে না, এমন সব জাতিও একে সম্মান করে এবং এটা বিশ্বাস করে যে জীবনের এই কঠিন পথে অগ্রগতি সাধন করতে হলে তাদেরকে অবশ্যই কিছু নৈতিকতার বিধি বিধান মেনে চলা দরকার। সর্বত্রই এমন অনেক সমাজ পাওয়া যায় যাদের মধ্যে সর্বাবস্থায় আচরণের কিছু কিছু মিল রয়েছে।

প্রখ্যাত ব্রিটিশ পণ্ডিত স্যামুয়েল স্মাইলস বলেন ঃ

"পৃথিবীকে গতিময়তার দিকে পরিচালিত করার মত যত শক্তি রয়েছে তন্মধ্যে উন্নত আচার–আচরণ একটি। সর্বোৎকৃষ্ট অর্থে আদব–কায়দা হচ্ছে মানুষের স্বভাবেরই চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ, কেননা পারস্পরিক আচার–আচরণ হচ্ছে মানবতার দৃষ্টিতে মানুষের স্বভাবেরই বহিঃপ্রকাশ। যেসব লোক জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন, মর্যাদা ও সম্মানের প্রতিটি ব্যাপারে তাঁরা তাদের প্রতি জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। জনগণ এসব লোকের প্রতি আস্থাশীল এবং তাদের পুণাঙ্গ রূপের অনুকরণ করে থাকে। কেননা, মানুষ বিশ্বাস করে যে এসব লোক দুনিয়াবী সর্ববিধ গুণের অধিকারী এবং এ ধরনের লোকেরাই তাদের জীবনটাকে বাসোপযোগী করেছে। যদি বংশানুক্রমিক জন্মগত বৈশিষ্ট্য মানুষের মনোযোগ ও প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়, তাহলে উত্তম আচার–আচরণও সকল ভদ্র আচরণকারী মানুষের সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জন করবে। এটা এজন্য যে, প্রথমোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ হচ্ছে জন্মগত আর শেষোক্ত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উপার্জিত কর্মফল ও চিন্তা শক্তি প্রসূত। এটা হচ্ছে

আমাদের বিচার শক্তি যা আমাদের উপর রাজত্ব করে এবং সমগ্র জীবনব্যাপী আমাদের কাজকর্ম পরিচালনা করে থাকে।"

"যারা জীবনে শ্রেষ্ঠত্ব ও উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করেছেন, তাঁরা উজ্জ্বল আলোকবর্তিকা হিসেবে মানবতার পথ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তারা মানুষকে নৈতিকতা ও ধর্মের পথে সঠিক পথনির্দেশনা প্রদান করেছেন। কোন জাতি যত রাজনৈতিক অধিকার ও সুযোগ সুবিধাই ভোগ করুক না কেন তাদের আচার-আচরণের উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত তারা উন্নতি ও অগ্রগতির পথে অগ্রসর হতে পারবে না, কোন জাতিকে সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য বিরাট এলাকার অধিকারী হওয়া অত্যাবশ্যক নয়, কেননা বিপুল জনসংখ্যা ও বিরাট ভূ-খণ্ডের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও অনেক জাতির মধ্যে উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের উপযোগী সমস্ত অত্যাবশ্যকীয় গুণবৈশিষ্ট্যের অভাব থেকে যায়। এভাবে একটি জাতির নৈতিকতা যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে তবে সে জাতি শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যাবে।"

এই পণ্ডিত যা কিছু বলেছেন তাতে সকলে একমত; তথাপি প্রকৃত সত্যকে জানা এবং তদনুযায়ী কাজ করার মধ্যে যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে এখানে সেটাই হচ্ছে আসল সমস্যা। এমন অনেক লোক রয়েছে যারা তাদের উত্তম আচরণের স্থলে তাদের পশু প্রবৃত্তিকে প্রাধান্য দিয়ে রেখেছে, তারা তাদের উৎকৃষ্ট নৈতিকতার বদলে অগ্রাধিকার দিচ্ছে তাদের লোভকে যা জলবুদ্বুদের মত পানির উপর হঠাৎ একঝলক দিয়ে উঠে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে যায়। মানুষ তার জীবনের কারখানা হতে, নিঃসন্দেহে, দু'টো সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী প্রবণতা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এখন মানুষ অবিরত তার ভাল ও মন্দ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এক হিংস্র সংগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে। মানুষকে তার মন্দবৈশিষ্ট্য নির্মূল করার জন্য সর্বপ্রথম যে কাজটা করতে হবে তা হচ্ছে এ যুদ্ধের ময়দানে তার লোভ ও ক্রোধকে বন্দী করা, কেননা এরাই হচ্ছে তার মধ্যকার পরশ্রীকাতরতা রূপ পশু শক্তির উৎস। কোন লোক জীবনে উন্নতি করতে চাইলে তার কর্তব্য হবে উভয় প্রবণতার যথেচ্ছাচারীতা রোধ করা এবং এদের ক্ষতিকর প্রবণতাসহমূহ হতে নিজেকে মুক্ত রাখা, যা তার মধ্যকার খারাপ বৈশিষ্ট্য হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে এবং তার প্রবণতাসমূহকে প্রয়োজনীয় ও সুন্দর অনুভূতিতে পরিবর্তিত করে। এটা এজন্য যে মানুষ তার অনুভূতিসমূহ হতে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হয়ে থাকে, কিন্তু এসব অনুভূতি তখনি ভাল হতে পারে যখন তারা তার যুক্তির নির্দেশের অনুগত হবে।

সামাজিক রীতিনীতি বিনষ্টকারী এই বৈশিষ্ট্যটির প্রসার লাভের একটা কারণ হচ্ছে এমন একটা প্রচলিত কথাঃ

"গঠনমূলক মিথ্যা কথা কষ্টদায়ক সহজ সত্য কথা অপেক্ষা বেশী ভাল।"

এই প্রবচনটা তার গোপন বৈশিষ্ট্য ঢাকা দেওয়ার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, অনেক লোক তাদের প্রতিহিংসামূলক মিথ্যার যথার্থতা প্রমাণ করার জন্য এর আশ্রয় গ্রহণ করে, এ বিষয়ে যৌক্তিকতা ও আইন শাস্ত্র কি বলে তা তারা এড়িয়ে যায়। ইসলাম ও যুক্তির এটাই দাবী যে যখন একজন মানুষের জান মাল ও অত্যাবশ্যকীয় সহায়–সম্পদ সঙ্কটাপন্ন হয় তখন তার দায়িত্ব হবে সম্ভাব্য সর্ববিধ উপায়ে এমনকি মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হলেও বিপদ থেকে মুক্ত হওয়া। এটা যথার্থই বলা হয়ে থাকে "নিরূপায় অবস্থা হারামকেও হালালে পরিণত করে।" প্রয়োজনীয় মিথ্যার একটা নির্ধারিত সীমানা রয়েছে, এটাকে অবশ্যই প্রয়োজনের সীমানার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে। যদি মানুষ এই "গঠনমূলকতার" সীমানাকে তাদের ব্যক্তিগত লোভ লালসা চরিতার্থে প্রসারিত করতে শুরু করে তাহলে তাদের তথাকথিত প্রয়োজনের বাহিরে একটা মিথ্যাও থাকবে না।

এ সম্পর্কে জনৈক বিজ্ঞ পণ্ডিত বলেন ঃ "প্রতিটি ব্যাপারে একটা যুক্তি আছে। প্রতিটি কাজের পেছনে যুক্তি ও কারণ আবিষ্কার করা সম্ভব। এমনকি পেশাদার অপরাধীরাও তাদের অপরাধের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করতে পারে। সুতরাং এ পর্যন্ত যত মিথ্যা বলা হয়েছে তার প্রয়োজনীয়তা ও ভাল দিক রয়েছে। অন্য কথায় বলতে গেলে যখনই কোন মিথ্যা বলা হয় তা কোন না কোন উদ্দেশ্যে বলা হয়ে থাকে এবং মিথ্যাবাদী ভালঃ মিথ্যা কথার দ্বারা মিথ্যাবাদীর যদি কোন লাভ না হয়ে থাকে তাহলে সত্যকে গোপন করার কোন কারণ থাকতে পারে না। এ সত্য হতে এটাই আসে যে, এটা মানুষের স্বভাব এবং এ স্বভাবই তাকে বলে দিবে যে কোন্ সব কাজ তার জন্য সুবিধা জনকভাবে ভাল। যদি মানুষের সন্দেহ হয় যে সত্যভাষণের ফলে তার ব্যক্তিগত সুবিধাসমূহ বিপদাপন্ন হবে অথবা সে কল্পনা করে যে মিথ্যা বলার মধ্যে তার কল্যাণ নিহিত রয়েছে তাহলে নিশ্চিন্তে সে মিথ্যা কথা বলবে, কেননা সে দেখতে পাচ্ছে সত্যের মধ্যে তার মন্দ এবং মিথ্যার মধ্যে ভাল নিহিত রয়েছে।"

এ সত্যকে আমাদের কখনও উপেক্ষা করা উচিৎ হবে না যে মিথ্যাচারের মধ্যে বিরাট মন্দ নিহিত রয়েছে এবং যদি মিথ্যা কথার দ্বারা কোন ক্ষতি হতে বাঁচা যায়, (যখন অনুমতি প্রাপ্ত) এটা অপেক্ষাকৃত অধিক

ক্ষতিকর মন্দকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মন্দ দিয়ে মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে করা হয়।

চিন্তা করার স্বাধীনতা হতে বলার স্বাধীনতা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ, কেননা স্বাধীনভাবে চিন্তাশক্তির অনুশীলনের সময় কোন ভুল হলে এ ভুলজনিত ক্ষতি উক্ত ব্যক্তি পর্যন্ত সীমিত থাকে। অপরপক্ষে স্বাধীনভাবে বলতে গিয়ে যদি কোন ভুল হয়ে যায় তবে তদ্বারা সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হবে। স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগজনিত সুবিধা এবং অসুবিধা সমগ্র সমাজকে প্রভাবিত করে থাকে।

গাজ্জালী বলেছেন, "কথা বলার শক্তি হচ্ছে একটা উপকারী নেয়ামত। এটা একটা সূক্ষ সৃষ্টি যা তার ক্ষুদ্রতম আকৃতি সত্ত্বেও অনুগত বা অবাধ্য হয়ে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে। ঈমান এবং কুফরী দুটোই জিহ্বা দিয়ে প্রকাশ পায়, যা শেষ পর্যন্ত মানুষের বন্দেগী বা অবাধ্যতার জীবনে পরিণত হয়। তিনি আরও বলেন, "মন্দকে পরিহার করা তাদের জন্যই সম্ভব যারা তাদের কথাবার্তাকে ধর্মীয় বিধির আওতাভুক্ত রাখতে সক্ষম। এসব লোক ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মুখ খুলবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা তাদের জীবন, ঈমান ও পরকালের জীবনের জন্য কল্যাণকর না হয়।" আবু হামিদ আল গাজ্জালী, কিমিয়ায়ে সা'আদৎ।

ছেলেমেয়েদের সম্মুখে মিথ্যা বলা ও সত্যের বিরোধী আচরণ পরিহার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেন বদস্বভাব তাদের অন্তরে না ঢুকতে পারে। ছেলেমেয়েরা তাদের পরিবার ও চতুর্দিকের লোকজনদের কাছ থেকে কিভাবে কথা বলতে হবে ও কাজকর্ম করতে হবে তা শিখে। অতএব, যদি সত্য বিরোধী আচরণ পরিবারিক পরিবেশে ঢুকে পড়ে ছেলেমেয়েরা তাতে প্রভাবিত হবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে তারাও একই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়বে।

মরিস টি ইয়াস বলেন ঃ

"সত্যকে খুঁজে বের করার জন্য চিন্তা করা, কথা বলা ও প্রচেষ্টা চালানোর অভ্যাস ও চর্চা একমাত্র তাদের দ্বারাই সম্ভব যারা ছেলে বেলায় একই ধরনের পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েছে।"

একজন মনস্তত্ত্ববিদের মতে ঃ

"মানুষের অনুভূতি দুভাগে বিভক্ত একটা ভাগুের মত। প্রথম ভাগটা হচ্ছে আক্রমণাত্মক আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে প্রতিরক্ষামূলক। মানুষ যদি তার আত্মরক্ষামূলক অনুভূতিগুলোকে পরিচালিত করে তার আক্রমণাত্মক অনুভূতি সমূহের উপর বিজয়ী হতে পারে, তবে সে তার অস্তিত্বের উপর কর্তৃত্ব লাভ করে তার অনুভূতিকে তার ইচ্ছামত পরিচালিত করতে সক্ষম হবে, নতুবা তাকে তার অনুভূতির মর্জিমত চলতে হবে।"

যারা তাদের আভ্যন্তরীণ শক্তিসমূহের সাথে তাদের লোভ–লালসা ও তাদের মনের কামনা–বাসনার একটা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করে তাদের মনের সাথে তাদের আত্মার একটা শান্তিপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, তারাই, নিঃসন্দেহে, জীবনের সমস্যাসমূহের মধ্যে দুর্বলতা, ব্যর্থতা বা পরাজয়মুক্ত সংকল্পের সাথে একটা সুখের পথ অনুসরণ করছেন। এটা সত্য যে, মানুষের যোগ্যতা প্রতিভা, গতি ও দ্রুততার দিক হতে এক উন্নত পর্যায়ের অনুশীলনের পর্যায়ে উন্নীত হয়ে, চিন্তাশক্তির প্রয়োগের মাধ্যমে, মানবজাতিকে সমুদ্র ও সাগরের অতল গভীরে পৌছার সুযোগ করে দিয়েছে। এতসব সত্ত্বেও, আমরা মানুষের মধ্যে বিরামহীন দুঃখ–দুর্দশা লক্ষ্য করছি। সভ্যতার আভ্যন্তরীণ অবস্থার মধ্যে উঠা নামা চলতে চলতে, এটা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে, যা দেখে মনে হচ্ছে এটা যেন দুঃখ–দুর্দশা ও সমস্যার হাতের একটা খেলনা মাত্র। আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ ও উন্নত বৈশিষ্ট্যাবলীর পথ হতে পশ্চাদপসরণের এটাই পরিণতি।

ডাঃ সি, রোমান লিখেছেন ঃ

"এ যুগে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে, কিন্তু আদিম আচার–আচরণ ও অনুভূতি এখনও তাদের আদিম পর্যায়ে রয়ে গেছে। যদি মানুষের মন ও যুক্তিজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে তার আচার–আচরণ ও অনুভূতির অগ্রগতি হতো, তাহলে আমরা সম্ভবতঃ বলতে পারতাম যে মানব জাতি তার মনুষ্যত্বেরও উন্নতি সাধন করেছে।"

ভারসাম্য ও সাম্যের বিধান অনুযায়ী সভ্যতার মধ্যে উন্নত গুণাবলীর যে অভাব রয়েছে তা তার ভবিষ্যৎ ধ্বংস ও বিলুপ্তি বৈ আর কিছুই নয়। বিভিন্ন সমাজের অবনতি ও অব্যাহত দুঃখ–দুর্দশার মূলে যে কারণ লক্ষ্য করা যাচ্ছে তা হচ্ছে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের প্রয়োজনীয়তা।

মূল্যবোধসমূহ তার মৃতপ্রায় সভ্যতার দেহে জীবনী শক্তি সঞ্চার করে তাকে প্রয়োজনীয় শক্তির অধিকারী করবে।

মিথ্যাবাদিতার ক্ষতিকর দিক

সত্যবাদিতার যেমন বহু উপকারী দিক রয়েছে তেমনি মিথ্যাবাদিতার রয়েছে বহুবিধ অপকারিতা। সত্যবাদিতা হচ্ছে সুন্দরতম বৈশিষ্ট্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত আর মিথ্যাবাদিতা হচ্ছে নিকৃষ্টতম আচরণ। মানুষের কথা হতে তার আভ্যন্তরীণ মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, সুতরাং মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ যদি হিংসা বিদ্বেষ বা শত্রুতার কারণে ঘটে তবে এটা হচ্ছে তার ক্রোধের একটা বিপজ্জনক পর্যায়, আর যদি তা বদমেজাজ অথবা বদভ্যাসের কারণে হয় তবে তা মানুষের উদগ্র লোভেরই ফলশ্রুতি। মানুষের কথাবার্তা যদি মিথ্যাচারের দ্বারা বিষাক্ত হয়ে পড়ে তখন অপবিত্রতার লক্ষণ তার দেহে এমনিভাবে প্রকাশ পাবে যেমন শরতের বাতাস বিবর্ণ করে দেয় গাছের পাতাকে। মিথ্যাবাদিতার ফলে মানুষের অস্তিত্বের আলো নিভে যায় এবং বিশ্বাসঘাতকতার আগুন জ্বলে উঠে। মানুষের পারস্পরিক ঐক্য ও সুসম্পর্ক বিনষ্ট করে কপটতা বিস্তারের ক্ষেত্রে মিথ্যার এক বিস্ময়কর অবদান রয়েছে। বস্তুতঃপক্ষে, ফাঁকা বুলি ও মিথ্যা দাবী হতে বহুল পরিমাণে বিপথগামিতার উৎপত্তি হয়। কেননা অসৎ উদ্দেশ্যের লোকদের জন্য মিথ্যাবাদিতা হচ্ছে স্বার্থপর লোকদের স্বার্থোদ্ধারের একটা খোলা দরজা। শক্তিশালী বাকপটুতার সাহায্যে তারা সত্যকে লুকায়ে রাখে এবং তারা তাদের বিষাক্ত মিথ্যা দিয়ে নিরপরাধ লোকদেরকে বন্দী করে ফেলে।

মিথ্যাবাদী লোকেরা নিজেদের অবস্থা চিন্তা বা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে দেখার সময় পায় না। "তাদের রহস্যজাল কেউ ছিন্ন করতে পারবে না" এ দাবী করে তারা তাদের মিথ্যাচারিতার সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে কদাচিত চিন্তা করে থাকে। তাদের কথায় আমরা বহু ভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা দেখতে পাই। মিথ্যাবাদী লোকেরা আজীবন লজ্জা, ব্যর্থতা ও অপমানিত হতে থাকবে। সুতরাং এটা সত্যই বলা যায় যে, "মিথ্যাবাদী লোকেরা দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী।"

মিথ্যা কথা বলাকে ধর্ম নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে

কালামে পাকে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মিথ্যাবাদীদেরকে কাফেরদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

"আল্লাহর বাণীতে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না একমাত্র তারাই আল্লাহর সম্পর্কে মিথ্যা বলে থাকে এবং তারাই হল মিথ্যাবাদী।"

কোরআনে পাকের উপরোক্ত আয়াত হতে এটাই বুঝা গেল যে, ঈমানদাররা সত্যকে মিথ্যায় পরিণত করার মত অপবিত্র কাজের সাথে নিজেদেরকে যুক্ত করে না।

আল্লাহর নবী (দঃ) বলেছেন ঃ

"সত্যনিষ্ঠ হও। কেননা সত্যবাদিতা বেহেশতের দিকে পরিচালিত করে। অবশ্যই একজন মানুষ আল্লাহর নিকট সত্যবাদী হিসেবে লিপিবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সত্যকথা বলা ও সত্যের অন্বেষণে নিজেকে নিয়োজিত রাখা উচিৎ। মিথ্যা পরিহার কর; কেননা এটা দোজখের দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহর নিকট মিথ্যাবাদী হিসেবে লিখিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মানুষ মিথ্যা বলতে থাকবে।" -- নাহাজ আল ফাসাহ, ৪১৮ পৃঃ।

মিথ্যাবাদীদের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে এই যে, সে একমাত্র বিরক্তিকর হঠকারিতার পরই বিশ্বাস করবে। নবী (দঃ) বলেছেন ঃ "যারা বারবার মানুষকে বিশ্বাস করে তারাই ততবেশী সত্যবাদী আর যারা যতবেশী মানুষকে সন্দেহ করে তারা মিথ্যা কথা বলে"

ডাঃ স্যামুয়েল স্মাইলস বলেন ঃ

"কিছু লোক এটাই মনে করে থাকে যে তাদের নিজেদের চরিত্রে যেসব নীচ বৈশিষ্ট্য রয়েছে অন্য লোকেরা সাধারণত একই ধরনের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, অথচ আমরা জানি যে মানুষ বস্তুতঃপক্ষে, তার নিজের আচার-আচরণের আয়নারই প্রতিফলন মাত্র। সুতরাং মানুষের মধ্যে আমরা ভালমন্দ যা কিছু দেখতে পাই তা আমাদের মনে যা কিছু রয়েছে তারই বাস্তব প্রতিফলন বৈ আর অন্য কিছু নয়।"

সাহসী, উন্নত চরিত্র ও আচার-আচরণের লোক একদিকে যেমন মিথ্যাকে সহ্য করতে পারে না তেমনি মিথ্যার মত নোংরামীর দ্বারা নিজে অপবিত্র হবে এটাও চায় না। মিথ্যাবাদীরা মানসিক বিশৃঙ্খলার শিকার যা

তাদেরকে সত্যকথা বলা হতে নিবৃত্ত করে থাকে, যারা তাদের অবচেতন মনে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে তারা নিজেদেরকে দুর্বল ও লাঞ্ছিত বলে অনুভব করে, কেননা মিথ্যাবাদিতা হচ্ছে দুর্বল ও কাপুরুষদের সম্মুখভাগ।

ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ

"বাস্তবরূপে দেখানো হলে অবশ্যই সত্যবাদিতাকে সাহসিকতার সাথে এবং মিথ্যাকে ভীরুতার সাথে একত্রে দেখা যেত।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৬০৫।

ডাঃ রেমন্ড পীচ বলেন ঃ "মিথ্যা কথা বলা দুর্বল লোকদের আত্মরক্ষার উত্তম হাতিয়ার এবং বিপদ হতে পরিত্রাণ পাওয়ার দ্রুততম পন্থা। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিথ্যাবাদিতা হচ্ছে দুর্বলতা ও ব্যর্থতার প্রতিক্রিয়া। যদি তুমি কোন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা কর তুমি কি মিছরীটা ধরেছো? অথবা তুমি কি ফুলদানীটা ভেঙ্গেছো? যদি ছেলেটা বুঝতে পারে যে তার ভুলের স্বীকৃতি তার জন্য শাস্তি নিয়ে আসবে তখন তার সহজাত প্রবৃত্তি তাকে এটা অস্বীকার করতে বলবে।" – মা ওয়া ফারজানদানে মা।

ইমাম আলী (আঃ) সত্যবাদিতার উপকারিতাসমূহ অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

সত্যবাদী লোকেরা তিনটা জিনিস লাভ করে থাকে ঃ

"(অন্যদের) আস্থা, ভালবাসা ও সম্মান।"

"তাদের নামাজ, রোজা দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে পড়ো না। কারণ একটি মানুষ ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে নামাজ ও রোজা আদায় করতে পারে যেহেতু সে যদি এসব পরিত্যাগ করে তা হলে সে অসহায় অনুভব করতে থাকবে। বরং তাকে সত্য কথা বলা ও আমানতের হেফাজতের ব্যাপারে পরীক্ষা কর"।

উসুলুল কাফী, ১ম খণ্ড ৪৬০ পৃঃ।

ইমাম আলী (আঃ) এ বিষয়ের উপর বলেছেন ঃ "মিথ্যা কথা বলা হচ্ছেসবচাইতেঘৃণ্যবৈশিষ্ট্য।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ১৭৫।

এবং ডাঃ স্যামুয়েল স্মাইলস বলেন, "মানুষের হীন চারিত্রিক বৈশিষ্টসমূহের মধ্যে মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে সবচাইতে ঘৃণ্য ও কুৎসিততম। এটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় যে মানুষ যেন তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে সততা ও সত্যবাদিতাকে একমাত্র লক্ষ্য বানায় এবং কোন অবস্থায় বা অন্য কোন কারণে

যেন এ লক্ষ্য পরিহার না করে।" আখলাক

ইসলাম তার সকল আচার-আচরণ ও সংশোধন প্রক্রিয়ার ভিত্তি হিসাবে ঈমানকে গ্রহণ করেছে এবং ঈমানকে মানুষের সুখের ভিত্তি বানিয়েছে।

ঈমানহীন আচার-আচরণ হচ্ছে এমন একটা প্রাসাদের সমতুল্য যা কাদামাটি কিংবা বরফের উপর তৈরী করা হয়েছে।

অথবা অপর একজন বিজ্ঞ পণ্ডিতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, "ঈমান বিহীন আচার-আচরণ হচ্ছে এমন সব বীজের মত যা পাথরের উপর বা কাঁটাসমূহের মধ্যে বপন করা হয়েছে, যা শেষ পর্যন্ত নির্জীব হয়ে মরে যাবে। যদি অধিকাংশ মহান গুণাবলী ঈমানের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হয় তবে তা একজন জীবন্ত মানুষের কাছে মৃত দেহতুল্য।"

ধর্ম মানুষের মন ও অন্তর উভয়ের উপর একযোগে কাজ করে, এটা হচ্ছে এদের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্র। ধর্মীয় অনুভূতিসমূহ বৈষয়িক অভাব হ্রাস করে এবং ঈমানদারের সঙ্গে নীচতার এক দুর্ভেদ্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যারা ঈমানের সৃষ্ট প্রশান্তির অধিকারী হয়েছে তাদের সম্মুখে রয়েছে এক স্থায়ী নির্ধারিত লক্ষ্য এবং শান্তির অনুভূতি।

"অবশ্যই আল্লাহর স্মরণের মধ্যে আত্মার প্রশান্তি রয়েছে।"

– *পবিত্র কোরআন*

ইসলাম মানুষের চরিত্রকে ঈমানের মান ও সহায়ক বৈশিষ্ট্যসমূহ দিয়ে বিচার করে এবং অত্যন্ত আগ্রহ ও যত্ন সহকারে এ দুটো উপাদানকে শক্তিশালী করার জন্য সংগ্রাম করে। উদাহরণস্বরূপ মানুষ যখন কোন শপথ করে তখন ইসলাম শপথকারীর বক্তব্যের সত্যতার নিশ্চয়তা বিধানকারী হিসাবে তার ঈমানের স্থান নির্ধারিত করেছে। ইসলামী দণ্ডবিধি অনুযায়ী কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সাক্ষীর স্থলে একজন মুসলমানের শপথকেই গ্রহণ করা হয়েছে এবং বিবাদের মীমাংসার ক্ষেত্রে এটাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তকারীর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ইসলাম একজন মানুষের সাক্ষ্যকে অধিকার প্রমাণ করার ক্ষেত্রে একটি পদ্ধতি হিসাবে গ্রহণ করেছে। এভাবে মিথ্যাবাদিতা যদি উপরো ল্লিখিত যে কোন বিষয়ে তার রক্তিম ভীতিপূর্ণ আকৃতিতে উপস্থিত হয় তা হলে এটা সুস্পষ্ট যে, এ ধরনের আচরণের ফলে কত ভয়াবহ ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

কালামে পাকে মিথ্যা কথাকে ক্ষমার অযোগ্য পাপ হিসাবে বিবেচনা

করা হয়েছে ঃ

"এবং কখনও তাদের নিকট হতে সাক্ষ্য গ্রহণ করো না" পবিত্র কোরআন

মিথ্যা বলার মত পাপের মাত্রা কতখানি হবে তা নির্ধারিত হবে ঐ মিথ্যা কথার ফলে সংঘটিত ক্ষতির পরিমাণের ভিত্তিতে। এজন্য শপথ ও সাক্ষীর ক্ষেত্রে মিথ্যার ক্ষতির পরিমাণ সর্বাধিক হয়ে থাকে এবং এজন্য এসব ক্ষেত্রে শাস্তিও কঠোরতর হয়ে থাকে।

মিথ্যা হচ্ছে অন্যসব বদস্বভাবের দিকে পরিচালিত করার একটা কৌশল। ইমাম হাসান আল আসকারী (আঃ) বলেছেন ঃ "সবঅক্রোশপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলো একটা বাড়ীতে রাখা হয়েছে এবং এ বাড়ীর চাবি হচ্ছে মিথ্যা কথা বলা।"

– জামি আস সা'আদাত, ২য় খণ্ড ৩১৮ পৃঃ।

ইমাম হাসান আসকারী (আঃ) বলেছেন, বিষয়টা আরও পরিষ্কার করার জন্য নিম্নোক্ত হাদীসগুলো উদ্ধৃত্ত করা হল।

একজন লোক আল্লাহর রাসূলের (দঃ) নিকট কিছু উপদেশ প্রার্থনা করলেন। নবী (দঃ) উত্তর দিলেনঃ

"মিথ্যা পরিহার কর এবং সত্যবাদিতা দিয়ে তোমাকে সুসজ্জিত কর।"

লোকটা সর্বদা গুনাহের মধ্যে লিপ্ত ছিল। এই প্রতিজ্ঞা করে সে সেখান হতে চলে গেল যে সে আর কখনও একটা গুনাহও করবে না।

বস্তুতঃপক্ষে, যারা সৎলোকদের সাহচর্য করে এবং সর্বদা কথা ও কাজে সততা রক্ষা করে তারা নিশ্চিতভাবে বঞ্চনাবিহীন দুঃখ–কষ্টমুক্ত জীবন যাপন করবে। তারা শঙ্কাহীন, অস্থিরতা শূন্য, ঈমানদীপ্ত মন ও আত্মার অধিকারী হবে এবং তাদের বিচার–বিবেচনার মধ্যে থাকবে না কোন অস্পষ্টতা। যারা সম্মান ও মর্যাদার সাথে জীবন যাপন করতে চায় তারা যদি মিথ্যার পরিণতি সম্পর্কে––সে মিথ্যা বস্তুগত লাভের ব্যাপারে হউক–বা ধর্মীয় ব্যাপারে হউক, সামান্যতম চিন্তাও করে তাহলে মূল্যবান শিক্ষা লাভ করবে। মিথ্যা বলার চূড়ান্ত পরিণতি হচ্ছে দণ্ডরূপে প্রদত্ত কশাঘাতের হুশিয়ারী। সত্যবাদিতা কেবলমাত্র আচার–আচরণ ও ঈমানের ছায়াতলে অর্জিত হতে পারে। এসব শর্তাবলী যেখানে দুর্বল হয়ে যায় সেখানে মানুষের শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৫

কপটতা

* আপনার ব্যক্তিত্বকে সযত্নে লালনের প্রচেষ্টা চালান
* কপটতা ঃ এক কুৎসিৎ বৈশিষ্ট্য
* মুনাফিকদের আস্থানা পুড়িয়ে দিন

আপনার ব্যক্তিত্বকে সযত্নে লালনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যান

সুখের সবচেয়ে বড় প্রয়োজনীয় উপাদান এবং সব চেয়ে সুমহান বৈশিষ্ট্য যা মানুষ উপভোগ করতে পারে তা হচ্ছে তার পূর্ণতা। এ মূল্যবান আত্মিক রত্ন মানব জীবনকে শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশ্বাসযোগ্যতায় ভরে দিয়ে এবং মানুষকে সম্মান ও মর্যাদার শীর্ষে পৌঁছায়ে দেয়। মানুষ হিসেবে সব মানুষ সমান। ইহা সত্বেও চিন্তা ও বিচারবিশ্লেষণ করার সামর্থ ও যোগ্যতানুযায়ী মানুষ মানুষে পার্থক্য ও বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়ে আছে। মানুষের আধ্যাত্মিক চিন্তার অভ্যাস ও আচার-আচরণগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। একজন মানুষের গুণাবলী হচ্ছে সবকিছু যা তাকে অন্যান্য মানুষ হতে আলাদা করে এবং প্রত্যেকের যোগ্যতা ও সামাজিক মর্যাদা নিরূপণ করে। অধিকন্তু, অন্যসব কিছুর চেয়ে মানুষের চরিত্র সর্বাধিক পরিমাণে সরাসরিভাবে আমাদেরকে প্রভাবিত করে।

মানুষকে এ দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল তার যোগ্যতাসমূহকে বৃদ্ধি করে, চিন্তার দিগন্তকে সম্প্রসারিত করে, জ্ঞানকে উন্নত ও আত্মাকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে তার পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। অন্য কথায় বলতে গেলে মানুষকে এ দুনিয়ায় তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। এ কথা মনে রেখে প্রতিটি মানুষের দায়িত্ব হচ্ছে একটি সৎ ও সুস্থ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা যা তার জীবনের জন্য সুখের পথকে সুগম করে দেবে। এ পথে সে যত কঠোর পরিশ্রম করতে থাকবে ততই সে তার জীবনে সফলতার অর্থ উপলব্ধি করতে থাকবে। জীবনের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ নদী পাড়ি জমানোর জন্য যে শক্তি ও সাহসিকতা অত্যাবশ্যক তা যোগান দেওয়ার জন্য মানুষের সুস্থ ব্যক্তিত্বের চেয়ে আর কোন কিছুই তাকে তা দিতে পারে না।

স্কোপেন হারের মতেঃ

"মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। মানবীয় বিভিন্নতার কারণে অর্জিত পার্থক্য হতে মানুষের জীবনে সুখ এবং দুঃখ সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের ব্যক্তিত্বের ভূমিকা সর্বাধিক। এটা এজন্য যে ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ

যেমন সৃজনশীল জ্ঞান ও খাঁটি মমত্ববোধ) কখনও তার মালিকানাধীন সম্পদের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে না। কেননা একজন জ্ঞানী লোক নিঃসঙ্গ অবস্থায় থেকেও তার জন্য একটা উপভোগ্য জীবিকা অর্জন করতে সক্ষম। অপরদিকে একজন মূর্খ লোক তার জীবন-জীবিকার বিপুল প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বে এবং অনেক অর্থ সম্পদ ব্যয় করেও তার নিজেকে অলসতামুক্ত করতে পারছে না। বিচারবিশ্লেষণ ক্ষমতা, পরিচালনা ও স্নেহপরায়ণতার সামর্থ হচ্ছে এমন কিছু অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে তার জীবন লক্ষ্যের কাছাকাছি এনে দেয় এবং তার প্রতি সুখ ও শান্তির দ্বার খুলে দেয়। অতএব, বস্তুগত উন্নয়নের চেয়ে এসব উপাদানের উন্নয়নের প্রতি আমাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া কর্তব্য।"

মানুষের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সকল বৈশিষ্ট্য ও অভ্যাসের কিছু কিছু অবদান রয়েছে এবং প্রতিটি চিন্তা ও অনুভূতি এসব বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যাসকে প্রভাবিত করে থাকে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মানুষের প্রতিটি আচার-আচরণ ও চরিত্র অবিরত পরিবর্তিত হতে হতে পূর্ণতার দিকে বা অন্য দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বক্তিত্বের উন্নয়ন ও পূর্ণতা অর্জনের পথে প্রথম পদক্ষেপ হবে, একজন মানুষের স্বীয় আভ্যন্তরীণ লুকায়িত শক্তি ও সম্ভাবনাসমূহকে পুরাপুরি কাজে লাগানোর পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং তার ব্যক্তিত্বকে এমনিভাবে গড়ে তোলা, যাতে তার পূর্ণতা অর্জনের পথে সম্ভাব্য বিঘ্ন সৃষ্টিকারী সমস্যাসমূহকে উপড়ে ফেলা যায়। তখনই মানুষ সকল নীচতা হতে নিজেকে মুক্ত করতে পারে। একজন মানুষ যদি তার নিজের মূল্যই বুঝতে না পারে তাহলে সে, পুরুষ বা মহিলা, তার জীবনে কখনও প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। সে সক্ষম হবে না তার মধ্যে কোন ফলপ্রসূ পরিবর্তন ঘটাতে।

কথা বা কাজের কোন সঠিক মূল্য থাকে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার প্রেরণা কোন মানুষের অস্তিত্বের গভীরতা থেকে না আসে। মানুষের মনে যা কিছু ধারণ করে আছে তার কথার মাধ্যমে তারই প্রকাশ ঘটে। এটাকে তার মনের মধ্যে সঞ্চিত গোপনীয়তাসমূহের ভাষান্তর বলা যায়। কথা যখন কাজের বিরোধী হয়ে যায় তখন তা তার ব্যক্তিত্বের অস্থির চিত্ততারই পরিচায়ক, যা কোন ব্যক্তির জীবনে ধ্বংসাত্মক পরিণতি বয়ে আনে।

কপটতা ঃ কুৎসিততম বৈশিষ্ট্য ঃ

কপটতা নিঃসন্দেহে, সবচেয়ে ঘৃণ্য একটা দোষ। সুখ ও স্বাধীনতাকে মানুষ স্বভাবতঃই পেতে চায় এবং তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে উন্নীত করতে চায়। এতদসত্ত্বেও, মানুষ যখন মিথ্যাবাদীতা, ওয়াদা খেলাপী ও চুক্তি ভঙ্গ ইত্যাদি খারাপ বৈশিষ্ট্যসমূহ দ্বারা অপবিত্র হয়ে পড়ে, তখনি কপটতা সেখানে অবাধে বিচরণ করার মত প্রশস্ত ক্ষেত্র পেয়ে যায়, এবং এসব অসৎ প্রকৃতির লোকদের স্বভাবের মধ্যে ঢুকে পড়ার জন্য প্রস্তুত হয়। এমনসব পরিস্থিতিতে কপটতা প্রসার লাভ করতে করতে শেষ পর্যন্ত তা এক কঠিন রোগের আকার ধারণ করে। কপটতা যে শুধু মানুষকে সত্যে পৌছার বা সত্যের পথে প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারেই বাধা দেয় তা নয়, বরং ইহা মানুষের মহৎ গুণাবলী অর্জনের পথে এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

অবশ্য, আধ্যাত্মিক পূর্ণতার উপর নির্ভরশীল সচেতন ও সুদৃঢ় মনস্তাত্বিক ক্ষমতার অধিকারী লোকদের সম্মুখে সুখ শান্তি বিনষ্টকারী যতসব বাধা দেখা দেয় তা তারা সফলতার সাথে মুকাবিলা করে।

কপটতা হচ্ছে এক ভয়াবহ মহামারী যা মানুষের সম্মান ও মর্যাদাকে হুমকির সম্মুখীন করে। মানুষকে দায়িত্বহীনতা ও নীচতার পথে পরিচালিত করে এবং মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের স্থলে সন্দেহ, হতাশা ও দুশ্চিন্তা দেখা দেয়।

যে সব লোক তাদের অসদাচরণের দিক থেকে এক বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌছে যায়, তারা তাদের নিজেদেরকে এভাবে আশ্বস্ত করে যে তারা সকল মানুষের সাধারণ কল্যাণ কামনা করে। এ অস্থির মানুষ (কপটলোক) যখন কোন সমন্বয়বিহীন দম্পতির সঙ্গে মেলামেশা করে তখন সে নিজেকে এমনভাবে পেশ করে যেন সে তাদের একজন বিশ্বস্ত বন্ধু এবং শুভাকাঙ্খী এবং অতঃপর সে তার এ অবস্থান পাল্টে দেয় এবং তাদের একজনের বিরুদ্ধে অন্যজনের বেশী বেশী করে সমালোচনা করে অপদস্থ করতে থাকে। বস্তুতঃপক্ষে, সে উভয়ের কারুর প্রতিই কোন প্রকার নৈতিক বা আত্মিক কোন সম্পর্কই অনুভব করে না।

মিথ্যা সৌজন্য প্রদর্শন, নিঃশর্তভাবে অন্য আদর্শ গ্রহণ, সততাকে সংরক্ষণ করা, যখন অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে তখন ন্যায়পরায়নতার সপক্ষে কিছু করা হতে বিরত থাকা, এসবই হচ্ছে কপট লোকদের বৈশিষ্ট্য।

একজন বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতে কপট লোক স্পষ্ট দুশমনদের চেয়েও বিপজ্জনক ঃ

"শত্রুদের প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য উভয়বিধ বৈশিষ্ট্য রয়েছে কারণ শত্রুতার যথার্থ রূপ একটাই। প্রকাশ্য বন্ধুত্বের ভানকারীদের বাহ্যিক দিকটা বিচারকরা হলে এসব বন্ধুরাও শত্রুদের পর্যায়ে পড়বে। নিঃসন্দেহে, কপট বন্ধুরা সাধারণ দুশমনদের চেয়েও মারাত্মক খারাপ হয়ে থাকে।"

কপট লোক যাদের সঙ্গে মিলেমিশে চলে তাদের ভালবাসা ও সম্মান লাভে ব্যর্থ হওয়ার কারণে তার জীবনটা বিরক্তি ও অপমানে ভরে ওঠে। সত্যকে লুকায়ে রাখার প্রচেষ্টার কারণে সে নিরাপদ, নিশ্চিত ও স্বস্থির জীবন যাপন করতে সক্ষম হয়না, কেননা তাকে সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকতে হয়। কি জানি কখন তার প্রকৃত স্বরূপটা নিশ্চিতভাবে অন্যদের গোচরীভূত হয়ে পড়ে।

সামাজিক দুঃখ–দুর্দশার একটা কারণ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সততা ও আন্তরিকতার অভাব এবং কপটতার প্রসার। একটা সমাজের অবকাঠামোর মধ্যে যদি কপটতার অনুপ্রবেশ ঘটে এবং সদস্যদের অন্তরকে যদি এটা আচ্ছন্ন করে ফেলে তাহলে এর সঙ্গে সঙ্গে শঠতা ও নীচতা ব্যাপক আকারে দেখা দেবে এবং এ ধরণের সমাজকে অনিবার্য ধ্বংসের সম্মুখীন হতে হবে। ব্রিটিশ পণ্ডিত এস স্মাইলস বলেনঃ

"সমসাময়িক রাজনীতিকরা বিশৃংখলা ও দুর্নীতির আচরণ অবলম্বন করছে। তারা তাদের সমর্থনা সভায় যে মতামত ব্যক্ত করে থাকে তার সঙ্গে তাদের জনসভায় প্রদত্ত বক্তৃতার সামঞ্জস্য থাকেনা। উদাহরণস্বরূপ, এসব রাজনীতিবিদরা জনগণকে তাদের দেশাত্ববোধের জন্য প্রশংসা করে থাকে এবং অতঃপর এখান হতে সরে গিয়ে তাদের প্রাইভেট মিটিংএ একই বিষয়ে জনগণের আচরণকে নিয়ে হাসাহাসি করে। আমাদের এ যুগে মতামতের এতই উঠানামা হয়ে থাকে যা অতীতের অন্য কোন সময় এতখানি দেখা যায়নি, স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গে নীতিও বদলাতে থাকে। আমার মনে হচ্ছে কপটতা তার নীচ অবস্থান হতে ধীরে ধীরে হামাগুড়ি দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত একটা প্রশংসনীয়

গুণে পরিণত হয়ে যাবে। যদি সমাজের উপরের স্তরের লোকেরা কপটতায় এভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তাদের দেখাদেখি সমাজের অন্যসব লোকেরাও এটাকে গ্রহণ করতে থাকবে। কেননা, এসব লোক সমাজের নেতৃস্থানীয় লোকদের আচার-আচরণ, চাল-চালনের অনুকরণ করে থাকে। আজকাল যে সুনাম অর্জিত হয় তা মানুষের উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী উপেক্ষা করে তাদের খারাপ বৈশিষ্ট্যসমূহ প্রকাশিত হওয়ার কারণে হয়ে থাকে।"

একটা রুশ প্রবাদ প্রচলিত আছেঃ

" শক্তিশালী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোককে উচ্চতর দায়িত্বে উন্নীত করা হবে না।"

যশ ও খ্যাতির পূজারীরা শেষ পর্যন্ত এতই দুর্বল ও নমনীয় হয় যে তারা অতি সহজে ধোঁকাবাজ লোকদের প্রশংসার স্রোতের টানে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা জনগণের কাছে সত্যকে গোপন করে এমনসব কথা বলে যা জনগণ শুনতে চায়। এত সব কিছুর চেয়েও মারাত্মক হচ্ছে সমাজের প্রচলিত বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বিরাজমান হিংসা বিদ্বেষ ও কপটতার সুযোগ গ্রহণ। এ ধরনের সুনাম সত্যনিষ্ঠ লোকদের কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। বরং তারা এটাকে বিরক্তি ও অসন্তোষের সাথে দেখে ও ঘৃণা করে। এ শ্রেণীর লোকদের কোন সম্মান বা মর্যাদা নেই।

সততা ও আন্তরিকতা হচ্ছে আত্মার পবিত্রতারই বহিঃপ্রকাশ এবং এসব হচ্ছে জীবনের সম্মানিত বৈশিষ্ট্য। পবিত্র আত্মার অধিকারী লোকদের মধ্যেই এসব গুণাবলীর বিকাশ ঘটে। বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে এরা ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠা করে সমাজের মধ্যে শান্তি, ঐক্য ও শক্তি আনয়ন করে। এটা স্বাভাবিক যে মানুষ তার বিশ্বস্ত বন্ধুকে তার সন্দেহজনক বন্ধু হতে বেশী ভালবাসবে এবং যতই বিশ্বস্ত লোকদের প্রতি ভালবাসা বাড়তে থাকবে ততই কপট লোকদের প্রতি ঘৃণাও বাড়তে থাকবে।

মোনাফেকদের আস্তানা গুড়িয়ে দিন ঃ

ইসলামের দ্রুত প্রসারের সাথে সাথে মুনাফিকদের দল বুঝতেছিল যে অন্যান্য বিরোধী গ্রুপের চেয়ে তাদের অস্তিত্বই সর্বাধিক হুমকির সম্মুখীন। সুতরাং তারা ইসলামের ভিত্তিমূলে আঘাত হানার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে লাগলো।

তারা আল্লাহর রাসূলের (দঃ) সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু যখন চুক্তির শর্তাবলী অনুযায়ী কাজ করার সময় আসলো। তখন তারা তা মেনে চলতে অস্বীকার করলো। তারা ঈমানদারদের সমালোচনা করতে লাগলো। ধ্বংসাত্মক ও দুর্নীতিপরায়ণ এই ক্ষুদ্র দলটি আল্লাহর রাসূলের (দঃ) প্রতি জনগণের বিশ্বাস ও নিষ্ঠাপূর্ণ ভালবাসাকে সহ্য করতে পারছিল না। এমন মুনাফিকদের সর্দার আবু আমের (পুরোহিত) ছিল মদীনার আহলে কিতাবদের সর্দার। মদীনার একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। নবীর (দঃ) সত্য প্রচারের পূর্বে এবং নবুয়্যতের প্রাথমিক পর্যায়ে সে শেষ নবীর (দঃ) আগমন সম্পর্কে ভবিষ্যতবাণী করেছিল। পরবর্তীতে ইসলামের প্রসারের কারণে তার সুনাম সুখ্যাতির যে ক্ষতি হয়েছে তা মেনে নেওয়া তার জন্য সম্ভব ছিল না। এজন্য সে মদীনা ত্যাগ করে মক্কায় গিয়ে সেখানকার মুশরিকদের সঙ্গে মিলিত হয়ে নবীর (দঃ) বিরুদ্ধে বদর ও ওহোদের যুদ্ধ করে।

অতঃপর আবু আমের রোমে পালিয়ে গিয়ে ইসলামের বৃক্ষটিকে উপড়ে ফেলার জন্য সেখানে রোমানদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এসময় তারই প্ররোচনায় তার সঙ্গীরা মদীনায় 'বিরোধের মসজিদ' নির্মাণ করে। যে সময় এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল সে সময় রাসূলুল্লার (দঃ) অনুমতি ব্যতিরেকে কোন মসজিদ নির্মিত হতো না। নবী (দঃ) তাদেরকে মসজিদ নির্মাণের অনুমিত দিয়েছিলেন, তবুকের যুদ্ধ হতে ফিরে আসার পর মসজিদের লোকেরা রাসূলুল্লাহ (দঃ) কে মসজিদটির উদ্বোধন করার জন্য আমন্ত্রণ জানালো। মহান আল্লাহ পূর্বেই অহিযোগে রাছুলাল্লাহকে (দঃ) জানিয়ে দিলেন যে, অসদোদ্দেশ্যে ঐ মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। নবী (দঃ) তাদের এ কাজকে অনুমোদন করতে অসম্মত হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর নবী (দঃ) মসজিদটিকে ধ্বংস করার জন্য সৈন্য বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন।

"তারাই তো আল্লাহর মসজিদের দেখাশুনা করবে, যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না। ওদেরই সৎপথ প্রাপ্তির আশা আছে।"

–আল কোরআন ৯ঃ১৮

এভাবে আল্লাহ তাদের বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ণ ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিলেন এবং তাদের কপটতার প্রথম স্থানকে ধ্বংস করে দিলেন।

পবিত্র কালামে পাক তীব্রভাবে এ গ্রুপের সমালোচনা করে অনেক আয়াতে তাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হয়েছেঃ

"এমন কিছু লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও শেষদিনের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি' তারা (কোনক্রমেই) ঈমানদার নয়।"

"তারা আল্লাহ ও ঈমানদানদেরকে ধোঁকা দিতে চায় এবং তারা বুঝে না যে তারা তাদের নিজেদেরকে ব্যতীত কাউকে ধোঁকা দেয় না।" সুতরাং তাদের অন্তরে রোগ আছে, আল্লাহ তাদের এ রোগকে বাড়িয়ে দিলেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। কেননা তারা মিথ্যাবাদী।"

"এবং যখন তাদেরকে বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা", তারা বলে, আমরাই তো শান্তি প্রতিষ্ঠাকারী।"

"এখন নিশ্চিতরূপে তারা নিজেরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝতে পারে না।"

-আল কুরআন ২ঃ১২

কপটতা হচ্ছে একটা আত্মিক রোগ। এটাকে নির্দেশ করে ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন, "কপটতাপূর্ণ লোকদের সম্পর্কে সতর্ক হও কেননা তারা ভুলপথে পরিচালিত, তারা বিভ্রান্ত। লোকদেরকে এবং নেতাদেরকে ভুলপথে পরিচালিত করে। তাদের অন্তর রুগ্ন, তাদের চেহারা পবিত্র।"

- গুরার আল হিকাম ১৪৬ পৃঃ

ডাঃ এইচ শাখতার বলেছেনঃ

"এমন কিছু লোক রয়েছে যারা যুক্তিতর্ক করে অন্য কিছুর জন্য নয় একমাত্র তাদের খ্যাতির জন্য। এসব লোকের বিশ্বাস সম্পর্কে যেমন তারা নিশ্চিন্ত নয়, তেমনি তারা তাদের প্রদর্শিত যুক্তি সম্পর্কেও সত্যিকারের বিশ্বাসী নয়, তথাপি এসব লোক চুপচাপ না থেকে অন্যদের সমালোচনা করতে থাকে। কেননা তাদের প্রতি অন্যদের উদাসীনতা তারা সহ্য করতে পারছে না। তারা কপটতার পথ অনুসরণ করে মতবিরোধ সৃষ্টি করে এবং এভাবে তারা তাদের অস্তিত্ব প্রমাণ করে।"

- রুশ্‌দে শাখচিয়্যাত

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ

"একজন মুনাফিকের কথাগুলো সুন্দর এবং তার অভ্যন্তরীণ (বিবেক) রুগ্ন।"

-গুরার আল-হিকাম ৬০ পৃঃ

একজন কপট লোকের নির্ভরযোগ্য লোকজনের কোন গ্রুপের সাথে

সম্পর্ক না থাকার কারণে তাকে সব সময় দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করতে হয়।" নবী (আঃ) কপটতা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন।ঃ

"একজন কপট লোক দু'টো ভেড়ার পালের মধ্যে বিভ্রান্তিতে আক্রান্ত ভেড়ারমত।"

– নাহজ আল ফাসাহা ৫৬২ পৃঃ

নবী (দঃ) বলেছেনঃ মুনাফিকদের তিনটি লক্ষণ থাকেঃ

"লক্ষণ তিনটি হচ্ছে ঃ যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন তারা কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তারা তা রক্ষা করেনা, যখন তাদের কাছে কোন আমানত গচ্ছিত রাখা হয় তারা তার খেয়ানত করে।"

– বিহার আল আনওয়ার ১৫৩ তম খণ্ড পৃঃ ১৭২

ইমাম বাকের (আঃ) বলেছেনঃ

"একজন ইবাদতকারীর জন্য এটা খুবই খারাপ যে, সে দ্বিমুখী হবে এবং দু'রকম কথা বলবে। তার ভাই–এর উপস্থিতিতে তার প্রশংসা করবে আর তার অনুপস্থিতির সময় তার বিরুদ্ধে বলবে। যদি সে তাইকে কিছু দান করে ভাই তাকে হিংসা করে। যদি সে তাইকে পরীক্ষা করে, সে অকৃতকার্য হয় (তাকে সাহায্য করতে)।"

ইমাম আলী (আঃ) কপট লোকদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে তাদের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন যে কপট লোক সর্বদা আত্মপক্ষ সমর্থনকারী এবং অন্যদের সমালোচনাকারী।

"কপট লোক নিজে নিজের তোষামোদকারী এবং অন্যদের বদনামকারী।"

– গুরার আল হিকাম পৃঃ ৮৮

ডাঃ এস স্মাইলস বলেছেনঃ

"তোষামোদকারী এবং কপট লোকেরা সব সময় তাদের নিজেদের সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং অন্যদের ব্যাপারে তাদের কোন চিন্তা নাই। তারা তাদের সকল চেষ্টাযত্ন তাদের নিজস্ব কাজকর্ম ও বিষয়াদিতে কেন্দ্রীভূত রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ক্ষুদ্র ও নীচ অস্তিত্বটাই তাদের একমাত্র দুনিয়াও শ্রেষ্ঠ মূর্তিতে পরিণত হয়ে যায়।" আখলাক

লোকমান তার ছেলের উদ্দেশ্যে যে উপদেশ দিয়েছিলেন

তার ব্যাখ্যা দিতে যেয়ে ইমাম সাদেক (আঃ) বলেছেনঃ "মুনাফিকের তিনটা চিহ্ন থাকেঃ তার অন্তরে যা থাকে মুখে তার বিপরীত বলে, তার অন্তর তার আচরণের বিরোধী, চোহারা তার অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের বিরোধী"

–বিহারুল আনোয়ার ১৫৩ তম খণ্ড পৃঃ ৩০

মানুষের চিন্তাধারা তার প্রকৃত আমিত্বের বিকাশ ঘটায়। মানুষ তার অন্তরের আসল অবস্থাকে কপটতা ও তোষামোদের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। কিন্তু এ চেষ্টা কিছুতেই সফল হবে না। কেননা প্রকৃত অবস্থাও সত্য শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে পড়বে।

জনৈক ব্যক্তি ইমাম সাদেক (আঃ)কে বললেনঃ

"যখন কোন লোক আমাকে বলেঃ আমি আপনাকে পছন্দ করি বা (ভালবাসি)। আমি কি করে বুঝবো যে সে সত্য কথা বলছে।" লোকটিকে ইমাম (আঃ) উত্তরে বললেন।ঃ

"আপনার অন্তরকে পরীক্ষা করুন। যদি সে আপনাকে ভালবাসে তবে আপনিও তাকে ভালবাসবেন। আপনার অন্তরের দিকে লক্ষ্য করুন। যদি ইহা আপনার সঙ্গী হতে অস্বীকার করে তবে আপনার মধ্যে কেউ একজন কিছু একটা করেছেন।"

–আল ওয়াসি পৃঃ ১০৬

ডাঃ মর্দিন বলেছেনঃ

"আপনি যদি সত্যিই মনে করে থাকেন যে, কথার মাধ্যমেই কেবল নিজেকে পরিচিত করে তুলবেন তবে আপনি আপনাকে প্রতারিত করছেন। কারণ অন্যরা আপনাকে আপনার আরোপিত নিয়ম দ্বারা বিচার করবে না। বরং তারা আপনাকে আপনার কাজকর্ম, কথাবার্তা, অবস্থা, বিবেক ও আপনার আভ্যন্তরীণ আমিত্ব দিয়ে আপনাকে বিচার করবে। যে সব লোকের সাথে কথা বলেন তারা আপনার চিন্তার শক্তি ও দুর্বলতার প্রতি লক্ষ্য করবে। আপনার বক্তব্য এমনকি আপনার নীরবতা হতে তারা আপনার কপটতা বা সততা লক্ষ্য করতে থাকবে। আপনার চতুর্দিকে লোকেরা আপনার ইচ্ছা ও আকাঙ্খা খুঁজে বের করবে এবং তা হতে আপনার সম্পর্কে তারা তাদের মতামত তৈরী করবে। আপনি যদি আপনার সম্পর্কে তাদের সৃষ্ট মতামতের কোন দিকের প্রতি আপত্তিও উথাপন করেন তবুও তারা তা পরিবর্তন করতে রাজী হবে না।

কোন কোন সময় আমরা লোকদেরকে এমন কথা বলতে শুনি 'ঐ নির্দিষ্ট লোকটার চেহারার প্রতি তাকাবার জন্য আমার দাঁড়াতেও ইচ্ছা হয় না।' এসব ব্যক্তিরা তাদের ঘৃণ্য লোকদের সহ্য করতে পারছে না। যদিও তাদের চেহারা সুন্দর এবং তারা কিছু প্রশংসনীয় গুণের অধিকারী। তারা অন্যান্য অনেক লোকের যুক্তি ও অনুভূতিকে পরীক্ষা করে দেখেছে এজন্যই তাদের এ অনুভূতি হয়েছে। আমরা ও কতিপয় লোক সম্পর্কে একই ধরনের অনুভূতি পোষণ করি। এটা বিচার–বিবেচনারই ফল। আমাদের বিচার বিবেচনা ও অনুভূব করার

অসংখ্য বিষয় আমাদের চতুর্দিকে ছড়িয়ে আছে এবং অনেকেই তাদের বুদ্ধির দিপ্তী দিয়ে তা উপলব্ধি করে।"

– *ফিরোজী ফিক্‌র*

ইমাম (আঃ) বলেছেনঃ

"অলঙ্কারপূর্ণ বক্তব্যের চেয়ে সুস্থ বিবেকসমূহের মধ্যে অধিকতর বিশ্বস্ত তথ্যাদি রয়েছে।"

গুরার আল হিকাম পৃঃ ১০৫

কপটতা বলতে আমরা যথার্থ আদর্শগত, আচার–আচরণগত, নৈতিক অথবা মৌখিক মুনাফেকী ছাড়াও আর অনেক ব্যাপক অর্থে বুঝে থাকি। কেননা ইসলাম তার সকল অনুসারীকে কপটতামুক্ত আন্তরিকতাপূর্ণ এক সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবন যাপনের আহ্বান জানিয়েছে, যেখানে থাকবে না কোন প্রকার পারস্পরিক বিরোধ, শত্রুতা, সংঘাত ও বিশ্বাসঘাতকতা।

৬

মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদ

* পাপে পরিপূর্ণ অপবিত্র সমাজ
* মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদ রটানোর পরিণতি
* মিথ্যা অপবাদ রটানোর প্রসার লাভের কারণ
* ধর্ম বনাম খারাপ আচার-আচরণ

পাপে পরিপূর্ণ অপবিত্র সমাজ

নিঃসন্দেহে, এটা সত্য যে বর্তমান সময়ে, মানব সমাজ নৈতিক অধঃপতন ও মনস্তাত্ত্বিক দুর্নীতিতে ভুগছে। যে গতিতে মানুষ তার বস্তুগত সম্পদাদি বাড়াতে সক্ষম হয়েছে সে গতিতে সে তার আচার-আচরণকে উন্নত করতে ব্যর্থ হয়েছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই এ ধরনের সমাজ নানা রকম মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে যা তার জীবন সমুদ্রকে নানা প্রকার সর্বনাশা দুঃখ দুর্দশায় আচ্ছন্ন করছে। যন্ত্রণা পরিহারের জন্য আন্তরিক সংগ্রাম চালাতে গিয়ে একদল লোক আরও মারাত্মকভাবে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং আত্মিক দুর্দশা ও দুশ্চিন্তা কমাতে গিয়ে নীচতা ও হীনতার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করে। তথাপি শান্তির দিপ্তীমান সূর্যের উজ্জ্বল আভা তাদের জীবনকে কখনও আলোকিত করে না।

এসব লোক এ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নিজেদেরকে প্রতারিত করছে যে তারা নিজেরা সকল প্রকার কড়াকড়ি ও নিয়মের অধীনতা হতে নিজেদেরকে মুক্ত করেছে এবং তারা নীচতা-হীনতা ও ব্যর্থতার ময়দানে প্রতিযোগিতায় নিয়োজিত। যারা তাদের আচার-আচরণে কোন নিয়ম-কানুন মানে না তাদের জীবনকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, যে লক্ষ্যকে সম্মুখে রেখে দায়িত্ব পালন করার জন্য তাদেরকে দুনিয়ায় আনা হয়েছিল তার পরিবর্তে তারা বস্তুগত উন্নতিকে ব্যবহারের কাজে নিয়োজিত। বস্তুগত দৃশ্যমান বিষয়সমূহকে তারা তাদের আশা আকাঙ্খার একমাত্র উৎস বানিয়ে নিয়েছে এবং অন্যায় ও দুর্নীতির অন্ধকার আবর্তে তারা তাদের সমাজকে নিমজ্জিত করে ফেলেছে।

যদি তারা তাদের এই বিপুল সম্পদকে বিভ্রান্তি ও বিশৃংখলার পথে ব্যয় না করে স্থায়ী ও নির্ভুল আচার-আচরণের ক্ষেত্রে ব্যয় করতো তাহলে কতই না ফলপ্রসূ হতো। তাসত্ত্বেও তাদের গৃহীত আচার-আচরণের রীতিনীতি সদা পরিবর্তিত হচ্ছে। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যতদিন পর্যন্ত মহৎ গুণাবলীকে, কোন সমাজের ভাল মানুষ বাছাই করার মানদণ্ড হিসেবে গৃহীত না হবে, ততদিন পর্যন্ত সে সমাজের লোকেরা তা অনুসরণ করবে না। বরং তারা ব্যাপকভাবে সমাজের প্রচলিত নিয়মনীতি

দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকবে, যা তাদেরকে অন্যদের অনুসৃত কাজের সম্ভাব্য ক্ষতিকর পরিণতি বিচার না করে অন্যদের দেখাদেখি চলতে শেখাবে। এর আলোকে আমাদের উপলব্ধি করা উচিৎ যে সমসাময়িক সভ্যতাগুলোর একদিকে যেমন সুস্থ ও মহৎ বৈশিষ্ট্য যোগ্যতার অভাব রয়েছে তেমনি তারা সমাজের মুক্তি ও সুখের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারে না।

প্রখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত ডাঃ কার্ল বলেন ঃ

আমাদের এমন একটা পৃথিবীর প্রয়োজন যেখানে প্রতিটি মানুষ তার বস্তুগত বা আত্মিক প্রয়োজন নির্বিশেষে তার নিজের জন্য একটা নির্দিষ্ট স্থান দেখে নিতে পারে। এভাবে আমরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবো যে কিভাবে আমাদেরকে বাঁচাতে হবে, তখনই আমাদের কাছে ধরা পড়বে যে সত্যপন্থী পথ প্রদর্শকের সাহায্য ব্যতীত এ জীবনের পথে অগ্রসর হওয়া একটা বিপজ্জনক কাজ। এখন যেহেতু আমরা এ বিপদকে উপলব্ধি করি। এটা বিস্ময়কর, যে কিভাবে আমরা যুক্তিসঙ্গত বিচারের জন্য পন্থাসমূহের অন্বেষণকে উপেক্ষা করেছি। বস্তুতঃপক্ষে, অত্যন্ত মুষ্টিমেয় সংখ্যক লোক সত্যিকারভাবে এ বিপদকে খুঁজে বের করেছে। বেশী সংখ্যক লোক তাদের লালসার হাতে বন্দী হয়ে পড়েছে। তারা ওসবের মধ্যে এতই প্রমত্ত হয়ে পড়েছে যে উন্নত কারিগরি জ্ঞান তাদেরকে কত কি দিয়েছে তা বিচার বিশ্লেষণ না করেই, একটা উৎকৃষ্ট সভ্যতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাদের অবৈধ আমোদ ফুর্তিকে ছাড়তে রাজী হয়নি।

"আজকাল জীবন এক বিশাল নদীর মত যা একটা খাড়া ঢালু পথের উপর দিয়া প্রবাহিত। এ জীবন-নদী আমাদের তাৎক্ষণিক আশা আকাঙ্খা ও প্রয়োজনসমূহ পূরণ করতে গিয়ে আমাদের বহু স্বপ্ন ও আকাঙ্খাকে ধুয়ে দুর্নীতি ও বিভ্রান্তির সমুদ্রে নিয়ে যাচ্ছে। অনেক লোক নতুন নতুন প্রয়োজন উদ্ভাবন করেছে এবং এসব পূর্ণ করতে গিয়ে এখন অধিকতর কঠিন প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এসব প্রয়োজনের অতিরিক্ত আরও কিছু কিছু জিনিস রয়েছে যা তাদেরকে সাময়িকভাবে সুখ প্রদান করছে এবং ওসব হচ্ছে মিথ্যা অপবাদ রটানো, অসাক্ষাতে নিন্দা, অর্থহীন কথাবার্তা ইত্যাদি যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য মাদকদ্রব্যের ক্ষতির চেয়েও বেশী ক্ষতিকারক।"

সামাজিক অধঃপতনের জন্য দায়ী কারণগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে মিথ্যা অপবাদ বা কলঙ্ক রটানো। এর বিশেষ অর্থ সম্পর্কে বুঝিয়ে বলা নিষ্প্রয়োজন, কেননা বিষয়টা সকলেরই জানা আছে।

মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদ রটানোর পরিনতি

মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদ রটানোর সবচেয়ে ভয়াবহ কুফল হচ্ছে রটনাকারীর বিবেকের আত্মিক ব্যক্তিত্বের ধ্বংস সাধন। যেসব লোক তাদের বিচার–বিবেচনার স্বাভাবিক পথ ত্যাগ করবে তারা তাদের উৎকৃষ্ট আচরণ প্রণালী ও বিচার–বিবেচনার ভারসাম্য হারাবে। অধিকন্তু, সে অন্যলোকদের গুপ্ত বিষয়াদি ও দোষ ত্রুটির কথা প্রকাশ করে দিয়ে তাদের অনুভূতির ক্ষতি সাধন করবে।

মিথ্যা কলঙ্ক ও অপবাদ মানুষের নৈতিকতার সিংহাসন নষ্ট করে দেয় এবং বিস্ময়কর দ্রুততার সাথে মানুষ তার মর্যাদা ও মহৎ গুণাবলী হতে বঞ্চিত হয়। বস্তুতঃপক্ষে, এটা অপবাদ রটনাকারীর অন্তরের নৈতিকতার শিরাকে পুড়ে ছাই করে দেয়। অপবাদ রটনা মানুষের নির্মল মনোযোগকে এমনভাবে হরণ করে নেয়, যাতে যুক্তি ও জ্ঞানের দরজা চিরতরে মরে যায়। যখন আমরা সমাজের জন্য এর ক্ষতিকর দিকের কথা চিন্তা করি, তখন খুঁজে দেখতে পাই যে এটা সমাজের লোকদের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করছে।

সমাজের বিভিন্ন লোকদের মধ্যে শত্রুতা ও ঘৃণার সৃষ্টির কাজে মিথ্যা অপবাদ রটনা করা এক ধ্বংসাত্মক ভূমিকা পালন করে। এটাকে কোন জাতির মধ্যে অব্যাহতভাবে চলতে দেওয়া হলে অপবাদ রটানো ঐ সমাজকে তার শ্রেষ্ঠত্ব ও সুনাম সুখ্যাতি হতে বঞ্চিত করে সমাজের লোকদের মধ্যে সংশোধনের অযোগ্য এমন এক অনৈক্য ও শত্রুতা সৃষ্টি করবে।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক হলেও এ সত্য আমাদেরকে মেনে নিতে হবে যে সমাজের সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে অপবাদ রটানোর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এ অবস্থা হতে এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, জীবনের ঘটনাপ্রবাহ পরস্পর ঠিক যেভাবে সম্পর্কিত, এমনিভাবে আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক অধঃপতনও সমাজের এক শ্রেণীর লোকের মধ্যে দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সমাজের অন্যসব লোকদের মধ্যেও এর সংক্রমণ ঘটে। মিথ্যা অপবাদ রটানোর প্রসারের ফলে হতাশা ও সন্দেহ সমাজের মনকে আচ্ছন্ন

করে ফেলে, জনগণ পরস্পরের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে এবং সন্দেহ ও অবিশ্বাস এর স্থলাভিষিক্ত হয়। এটা মনে রেখে আমরা নিরাপদে বলতে পারি যে যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজের লোকদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্বের মনোভাব ও উন্নত গুণাবলীর বিকাশ না হয়, ততদিন পর্যন্ত সমাজের লোকদের মধ্যে কখনও সহযোগিতার মনোভাব দেখা দিবে না। একটা সমাজে যখন মহৎ গুণাবলীর আশীর্বাদের অভাব দেখা দেয় তখন তা নিশ্চিতরূপে জীবনের প্রকৃত বৈশিষ্ট্য হতে দূরে সরে যাবে।

কি কি কারণে মিথ্যা কলঙ্ক বা অপবাদ রটানোর প্রসার ঘটে

মিথ্যা অপবাদ রটানোর ব্যাপারটা বাস্তব অপরাধের বহিঃপ্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও, এটা মানুষের আধ্যাত্মিকতার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। অপবাদ মানুষের অভ্যন্তরীণ মনস্তাত্ত্বিক গোলযোগের একটা বিপজ্জনক লক্ষণ এবং এজন্য আমাদেরকে অবশ্যই আত্মিক ও মনস্তাত্ত্বিক এলাকাসমূহে অনুসন্ধান চালাতে হবে।

আচরণ সম্পর্কিত পণ্ডিতরা অপবাদ রটানোর কতিপয় কারণের উল্লেখ করেছেন। এসব কারণসমূহের মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে হিংসা, রাগ, অতিশয় আত্মগর্বী, ধার্মিকমন্যতা ও অবিশ্বাস। নিঃসন্দেহে, যে কোন মানুষের প্রতিটি কাজ তার বিবেকের একটা নির্দিষ্ট অবস্থা হতে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এ ধরনের বিবেকের অবস্থার এটা হচ্ছে একটা প্রতিফলন যা শীতল ছাই-এর তলে জ্বলন্ত কয়লার মত, তার জিহ্বা, মানুষের অনুভূতির ভাষাদানকারী হিসেবে, মিথ্যা অপবাদের কথা বলে ফেলে।

যখন কোন একটা বৈশিষ্ট্য মানুষের বিবেকের মধ্যে বিশেষভাবে শিকড় গেড়ে বসে, এটা তার চোখ অন্ধ করে ফেলে ও তার বিচারশক্তির উপর শাসক হিসাবে কাজ করে। অপবাদ রটানোর বিরাট প্রসার লাভের একটা প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে অপবাদ রটনাকারীরা এর বিপজ্জনক পরিণতি সম্পর্কে অমনোযোগী। আমরা এমন লোকদের সম্পর্কে জানি

যারা অন্যান্য অনেক পাপ হতে বিরত হয়, কিন্তু এ দুঃখজনক পাপ হতে বিরত থাকার কথা একটিবারও চিন্তা করে না। অপবাদ রটানোর পরবর্তী ফলাফলের কথা চিন্তা না করে এর পুনরাবৃত্তি হতে থাকলে, এর ভয়াবহ বাস্তবতার জ্ঞান থাকুক, বা না থাকুক মানুষ তার লালসার অনুসরণ হতে বিরত থাকার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা হতে বঞ্চিত হবে। এসব লোক ন্যায়পরায়ণতা ও পূর্ণতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট থাকে। এ ধরনের ব্যক্তিরা সুখী জীবন লাভের পথে সামান্য কষ্টও করতে রাজী না হয়ে, নিজেদেরকে বাস্তবতা হতে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে তারা তাদের নীচ লালসার শাসনের শিকারে পরিণত হয়।

যারা তাদের নিজেদের বা অন্যদের মান-সম্মানের প্রতি খেয়াল রাখে না তারা নৈতিকতার আইন-কানুন মেনে চলে না। একজন মানুষ যে জীবনকে তার লোভ লালসার কর্মক্ষেত্রে পরিণত করে, সে অন্যের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে এবং স্বভাবতঃই দুঃখ ভোগ করে।

আচার-আচরণের উৎস্য হচ্ছে ঈমান। নীচু মানের আচার-আচরণ ঈমানের দুর্বলতা হতে সৃষ্টি হয়। যদি একজন লোকের ঈমান না থাকে, সে সুন্দর নৈতিকতার অনুসরণ করে না এবং ভাল আচরণ করার সদিচ্ছাও তার থাকে না।

মানুষকে নৈতিক অধঃপতন ও দুর্দশা হতে মুক্ত করার ব্যাপারে, প্রত্যেক মানুষেরই অনুসরণযোগ্য সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতির ক্ষেত্রে একটা মতামত রয়েছে। আমার মতে, সবচাইতে ফলপ্রসূ পন্থা হচ্ছে তাদের মধ্যকার মানবীয় অনুভূতি ও ভালোর প্রতি সাড়া দেয়ার মনোভাবকে জাগানোর মাধ্যমে, সদিচ্ছার গুণাবলীকে উৎসাহিত করে, মনের সম্পদসমূহকে সুখ লাভের পথে কার্যকরীভাবে নিয়োজিত করা। মন্দ আচার-আচরণের খারাপ পরিণতির প্রতি মানুষকে সতর্ক করে, এবং তাদের ইচ্ছাশক্তিকে সুদৃঢ় করার মাধ্যমে, আমরা সমস্ত খারাপ বৈশিষ্ট্যের উপর বিজয়ী হতে পারি এবং এভাবে মহৎ বৈশিষ্ট্যসমূহ তাদের অন্ধকার লৌহ বর্ত্মের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে।

ডাঃ জাগো লিখেছেন ঃ

"আমরা যখন একটা অবাঞ্ছিত অভ্যাসের মূলোৎপাটন করতে চাই তখন সর্বপ্রথম আমাদেরকে এর কুফলগুলো সম্পর্কে সম্যক অবহিত হতে হবে। অতঃপর, আমাদের মধ্যে যে এ বদভ্যাস রয়েছে তা মেনে নিতে হবে, এবং

সর্বশেষে ঐসব ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে, যা আমাদেরকে এমন একটি অভ্যাসের শিকারে পরিণত করেছে। যদি আমরা এই অভ্যাসের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদেরকে সুপরিচিত করে নিতে পারি, আমরা তখন এটার মূলোৎপাটনের সফলতার আনন্দানুভূতি দিয়ে, ঐ অভ্যাসের প্রেরণাদানকারী অনুভূতিসমূহের উপর বিজয়ী হতে পারবো।"

মানবাত্মার মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার যে বীজ রয়েছে তা সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় পন্থাবলম্বন করে, আমরা আমাদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত হওয়া ও বিভ্রান্তির পেছনে যে কারণসমূহ রয়েছে তা চিনতে পারি। আর এর মাধ্যমে আমাদের আত্মা ও বিবেক হতে এসবের মূলোৎপাটন করে আমরা আমাদের সীমাহীন চাহিদা ও লোভ লালসার মুখে একটা শক্তিশালী প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলতে পারি।

কর্মের মাধ্যমে মানুষ তার প্রকৃত অবস্থা আমাদের সামনে তুলে ধরে। সুতরাং, মানুষের কাজকর্মই হচ্ছে তার সম্মান ও প্রকৃত অবস্থার প্রতিফলন। এ কারণে মানুষ যদি সুখী হতে চায় তবে তাকে অবশ্যই নির্ভুল কাজকর্মকে বাছাই করতে হবে, যাতে এসবকে তার সুখের মূল্যবান বীজ হিসেবে পরিবর্তিত করা যায়। মানুষকে অবশ্যই একথা মনে রাখতে হবে যে, তার প্রতিটি কাজ তা যত ছোট হোক আর বড় হোক তা সবই আল্লাহ জানেন।

জনৈক দার্শনিকের মতে ঃ

"কখনও একথা বলোনা যে এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন চেতনাও নেই, কোন কারণও নেই। কারণ এ কথা বলে তুমি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করছো যে তুমি নিজেই চেতনাহীন ও যুক্তিজ্ঞান বিবর্জিত। একইভাবে যদি বিশ্বজাহান চেতনাহীন অযৌক্তিক হতো তাহলে তুমিও হতে কাণ্ডজ্ঞানহীন।"

একইভাবে একটা সমাজের বেঁচে থাকার ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন রয়েছে অত্যাবশ্যকীয় বস্তুগত উপাদানের। সমাজের সদস্যদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য এদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের ঐক্য ও সহযোগিতা থাকা অত্যাবশ্যক। একটা সমাজ যে তার সামাজিক দায়িত্বের বোঝা কঠোরভাবে প্রতিপালন করে, সে এসবের দ্বারা ন্যায়নীতি অর্জনের ক্ষেত্রে প্রভূত পরিমাণে উপকৃত হতে পারে।

আমাদের আত্মাকে অন্ধকার হতে আলোর দিকে আনার জন্য অবশ্যই

মনের মধ্যে উন্নত চিন্তা ভাবনাকে শক্তিশালী করতে হবে, যাতে তা যে কোন প্রকারের ধ্বংসাত্মক চিন্তা ও প্রেরণার মোকাবিলা করতে পারে। আমাদের জিহ্বাকে মিথ্যা অপবাদ রটানোর বিরুদ্ধে পাহারা দিয়ে, জীবনে সুখ অর্জনের লক্ষ্যে, প্রথম পর্যায় অতিক্রম করতে হবে। সমাজ জীবন হতে ব্যাপক দুশ্চিন্তার প্রসার রোধ করতে হলে, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে জনগণের মধ্যে একটা মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব সৃষ্টি করা। সমাজের অন্য লোকদের অধিকার রক্ষা করার মাধ্যমে আমরা এটা করতে পারি, যা পরবর্তী পর্যায়ে আমাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা ও মানবতার শিকড় গজাতে শুরু করবে। এভাবে মহৎ গুণাবলীর সমর্থনে আমরা আর একধাপ অগ্রসর হতে পারি যা যে কোন সমাজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য অত্যাবশ্যক।

ধর্ম বনাম অসদাচরণ

পবিত্র কালামে পাক অপবাদ রটানোর বাস্তবতাকে একটা ছোট কিন্তু তেজোদ্দীপ্ত আয়াতের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেঃ

"তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে পছন্দ করবে? কিন্তু ইহা তোমরা ঘৃণা করবে।"

অতএব, যে যুক্তিতে মানুষ তার মৃত ভাই-এর মাংস খাওয়া প্রত্যাখ্যান করবে, সে যুক্তিতেই তার ভাই-এর অনুপস্থিতিতে তার বিরুদ্ধে অপবাদ রটানোকে ঘৃণা করা উচিৎ। ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ নাস্তিকতা ও শিরক-এর মূলোৎপাটনের জন্য যত কঠোর সংগ্রাম করেছেন ঠিক একই ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন মানুষের অনুভূতি ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহের সংশোধনের লক্ষ্যে।

আল্লাহর নবী (দঃ) বলেছেন ঃ

"মহৎ গুণাবলীর পূর্ণতা প্রদান করার জন্যই আমি প্রেরিত হয়েছি।"

বলিষ্ঠ ও যুক্তিবাদী জ্ঞানের সমর্থনে শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদরা মানুষকে নৈতিকতার পথে পরিচালিত করেছেন। নৈতিকতার সীমানার উপর যে কোন অন্যায় হস্তক্ষেপকে ইসলাম সবসময় একটা শ্রেষ্ঠ ও

নিন্দনীয় অপরাধ হিসাবে গণ্য করেছে। বস্তুতঃপক্ষে, ইসলাম মিথ্যা অপবাদ রটানোকে একটা মারাত্মক অপরাধের অন্তর্ভুক্ত করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং প্রতিটি মুসলমানের জন্য মিথ্যা অপবাদের দায়ে আক্রান্ত ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করাকে তাদের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে।

"তোমার উপস্থিতিতে যদি কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আনা হয় তখন তুমি লোকটির সাহায্যকারী হও। অপবাদ রটনাকারীকে ঘৃণা কর এবং ঐ গ্রুপকে পরিত্যাগ কর।" –নাহাজ আল ফাসাহা, পৃঃ ৪৮।

আল্লাহর নবী (দঃ) আরও বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি তার ভাই–এর অবর্তমানে তার সম্মান রক্ষা করবে, তখন আল্লাহর উপর তার অধিকার হবে দোযখের আগুন হতে পরিত্রাণ পাবার।" –নাহাজ আলা ফাসাহা, পৃঃ ৬১৩।

নবী (দঃ) আরও বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি রমজান মাসে কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটাবে সে তার রোজার জন্য আল্লাহর নিকট হতে কোন পুরস্কার পাবে না।"

–বিহার আল–আনোয়ার, ১৬তম খণ্ড, পৃঃ ১৭৯।

নবী (দঃ) মুসলমান সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন ঃ

"একজন মুসলমান ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যার হাত এবং মুখ হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ।"

এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে একজন মুসলমান যদি তার জিহ্বা দিয়ে তার মুসলমান ভাই–এর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটায় তাহলে সে নিশ্চিতরূপে নৈতিকতার বিধি লংঘন করে এবং ইসলাম ও মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে সে অপরাধী হিসাবে গণ্য। ইসলামের সকল মাযহাব সর্বসম্মতভাবে মিথ্যা অপবাদ রটানোকে একটা প্রধান গুনাহ হিসাবে গণ্য করার ব্যাপারে একমত হয়েছে, কেননা অপবাদ রটনাকারী আল্লাহর নির্দেশ লংঘন করে অন্য ব্যক্তির অধিকারে হস্তক্ষেপ করেছে। সে সৃষ্টিকর্তার নির্দেশের প্রতি অমনোযোগী।

একজন অনুপস্থিত ব্যক্তি যেমন তার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারছে না, একজন মৃত ব্যক্তি তার সপক্ষ সমর্থন করতে পারছে না, সুতরাং মৃত ব্যক্তির মর্যাদা রক্ষা সম্পর্কিত বিধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

অপবাদ রটানো ও পরনিন্দা হচ্ছে একই ধরনের আত্মিক পাপ।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"অপবাদ রটানো হচ্ছে দুর্বলের উপর জবরদস্তি করা।"

– *গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৩৬।*

ডাঃ এইচ শাখতার বলেছেন ঃ

"একজন লোকের প্রয়োজন পূর্ণ হওয়ার ব্যাপারে হতাশা মানসিক নিপীড়ন সৃষ্টি করে। এই মানসিক নির্যাতন আমাদের মধ্যে এক ধরনের আত্মরক্ষামূলক কাজ করার জন্য আমাদেরকে প্ররোচিত করে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পতিত লোকদের গৃহীত কর্মপন্থার ধরনের বিভিন্নতা দেখা যায়। যদি একজন এটা মনে করে যে অন্যরা তার প্রতি ইপ্সিত মনযোগ দিচ্ছে না, প্রত্যাখ্যাত হওয়ার আশংকায়, সে সামাজিকতার স্থলে বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতার পথ গ্রহণ করে। সে হয়তোবা একটা জনসমাবেশের এক কোণে একাকী নীরবে বসে থাকে, কারুর সাথে কোন কথা বলে না, তাদের সমালোচনা করতে থাকে অথবা কারণ ছাড়াই নিজে নিজে হাসে, অথবা সে অন্যদের সঙ্গে তর্ক করে। যারা উপস্থিত নেই তাদের বিরুদ্ধে যে অপবাদ রটায়, অবশিষ্ট লোকদের সে সমালোচনা করে, এ অবস্থা চলতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার উপস্থিতি প্রমাণ করতে সক্ষম হয়।"

– *রুশদে শাখছিয়্যাত।*

ডাঃ ম্যান তাঁর মনস্তত্ত্বের মূলনীতি নামক বইতে লিখেন ঃ

"আমরা আমাদের মান সম্মান বজায় রাখার জন্য এবং পরাজয় বা দুর্বলতাকে ঢাকার জন্য অন্যের উপর দোষ চাপাতে থাকি। উদাহরণস্বরূপ, পরীক্ষায় আমাদের অকৃতকার্যতার জন্য প্রশ্ন প্রণয়নকারী শিক্ষককে দোষারূপ করি। যদি কোন পদে আমরা উন্নীত হতে ব্যর্থ হই তখন আমরা ঐ পদের অবমাননা শুরু করি অথবা ঐ পদ দখলকারীদের বিরুদ্ধে অপবাদ রটনা করি অথবা আমাদের অক্ষমতার জন্য অন্যদেরকে দায়ী করতে থাকি, যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা দায়ী নয়।"

উপসংহারে, ভালগুণাবলী অর্জনের উদ্দেশ্যে আমাদেরকে অবশ্যই নিজেদের প্রতি লক্ষ্য রেখে উদ্দেশ্যের পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। আমাদের নিজেদেরকে দিয়েই যাত্রা শুরু করতে হবে যেন সর্বক্ষেত্রে সমাজের সুখের সঠিক ভিত্তি খুঁজে পেতে পারি।

৭

ছিদ্রান্বেষণ

* নিজের দোষ ও অক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞতা
* ব্যঙ্গোক্তি ও অপমানকরা
* ধর্মীয় শিক্ষা বনাম বক্রোক্তি

নিজের দোষ ও অক্ষমতা সম্পর্কে অজ্ঞতা

মানুষের আচরণ সম্পর্কিত বড় দুর্বলতাসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে তার নিজের দোষ ও অক্ষমতা সম্পর্কিত অজ্ঞতা। অনেক ক্ষেত্রে মানুষের আত্মা একটি ভাল বৈশিষ্ট্যকে প্রত্যাখ্যান করে যার ফলে তার অবচেতন মনে দুঃখ সৃষ্টিকারী এমন কিছু বৈশিষ্ট্য গৃহীত হয়ে যায়। যখন একজন মানুষ তার অজ্ঞতার গোলাম হয়ে যায় তখন সে নিজেই তার নিজের মধ্যকার নৈতিক শক্তিকে হত্যা করে। এভাবে সে তার মনের ঝোঁক প্রবণতা ও বহুবিধ লোভ-লালসার শিকারে পরিণত হয়ে যায়, যা তাকে সুখশান্তি হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। এহেন পরিস্থিতিতে পথের নির্দেশনা বা গঠনমূলক উপদেশ এর কোনটাই তার জন্য ফলপ্রসূ হবে না।

তার মুক্তির জন্য প্রথম প্রয়োজন হচ্ছে তার দুর্বলতার উপলব্ধি। যদি সে তার এসব খারাপ আচার আচরণকে চিন্‌তে পারে তবে এটাই হবে তাকে দুঃখ দুর্দশায় নিক্ষেপকারী তার ব্যক্তিত্বের বিপদ হতে পরিত্রাণ লাভের একমাত্র পথ।

মানুষকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তার মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে সতর্কতার সহিত ভালভাবে জেনে নিতে হবে। এটা তার আত্মিক উন্নতি ও আচার-আচরণগত সততার জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক শর্ত। একজন মানুষ তার নিজের সম্পর্কে যতই চিন্তা করবে ততই সে তার নিজের ভাল দিক ও খারাপ দিক দু'টোই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। অতঃপর সে যদি তার অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মুলোৎপাটন করে তার আচার-আচরণকে উন্নত করার লক্ষ্যে মৌলিক সংশোধন প্রচেষ্টা চালায় তবে তার আত্মার আয়না হতে পাপের ময়লা পরিষ্কার করতে পারবে।

আমাদের কার্যক্রমের দর্পণে ফুটে উঠা প্রতিবিম্বকে যদি আমরা উদাসীনতার বশে অবজ্ঞা করি তাহলে আমরা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ করব। আমাদের মধ্যকার বৈশিষ্ট্যসমূহকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা আমাদের কর্তব্য যাতে অবাঞ্ছিত বৈশিষ্ট্যসমূহ যা আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের মধ্যে জন্মেছে তৎপ্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করা যায়। নিঃসন্দেহে, আমরা এসব বৈশিষ্ট্যের মূলোৎপাটনে সক্ষম হবো। এমনকি এসবের

বিরুদ্ধে অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে আমাদের মধ্যে এসব বৈশিষ্ট্যের আগমণ বন্ধ করে দিতে পারবো। যেভাবেই হউক না কেন, উন্নত গুণাবলী অর্জন করতে হলে দীর্ঘদিন ধরে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার মত ধৈর্যের অধিকারী হতে হবে। এটাকে কার্যে পরিণত করা সহজ ব্যাপার নয়।

এসব বিপজ্জনক ও ক্ষতিকারক অভ্যাসগুলোর মূলোৎপাটন করতে হলে আমাদেরকে এসব চিনলেই চলবে না বরং চেনার সঙ্গে সঙ্গে সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সহকারে কাজে লেগে যেতে হবে। যত বেশী আমরা আমাদের সর্বাধিক শক্তিকে সুসংগঠিত করে কাজে লাগাতে সক্ষম হবো ততই আমাদের চিন্তা সঠিক ও ফলপ্রসূ হতে থাকবে। এ প্রক্রিয়ার প্রতিটি পদক্ষেপের সুফল যতই আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হতে থাকবে ততই আমরা পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে এগিয়ে যেতে থাকবো।

ডাঃ কার্ল লিখেছেনঃ

"আমাদের দৈনন্দিন কর্মসূচীকে সর্বাধিক ফলপ্রসূ ও গ্রহণযোগ্য করার জন্য প্রতিদিন সকালে এর খুঁটিনাটি ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং প্রতিদিন বিকাল বেলা পরীক্ষার ফলাফল পুরাপুরি পর্যালোচনা করে দেখতে হবে। এভাবে একই পদ্ধতিতে আমরা যদি নির্দিষ্ট কাজ নির্দিষ্ট সময়ে সম্পন্ন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে সে কাজের তালিকার মধ্যে এমন কতিপয় পদক্ষেপ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে অন্যরা আমাদের কাজ হতে উপকৃত হতে পারে। আমাদের আরচণ ন্যায়পরায়ণ ও সঠিক হতে হবে।

হীন আচার-আচরণ দৈহিক নোংরামীর মতই ঘৃণ্য। তাই আমাদের দেহকে ময়লা হতে পবিত্র করা যতখানি গুরুত্বপূর্ণ, আচার-আচরণকে নোংরামীমুক্ত করাও তেমনি অত্যাবশ্যক। কোন কোন মানুষ সকাল বিকাল ব্যায়াম করে, আমাদের চিন্তা ও আচরণের নিয়মিত বিচার ও পর্যালোচনা একই ধরনের প্রয়োজনীয় ব্যায়াম হিসেবে করতে হবে। পন্থা ও পদ্ধতি জেনে নেওয়ার পর আমাদেরকে নির্ধারিত সীমানার মধ্যে থেকে এ লক্ষ্যে সংগ্রাম চালাতে হবে। তাহলে কোন বাধাবিপত্তি ছাড়াই আমরা বাস্তবতাকে দেখতে পাবো। আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সফলতা সরাসরি আমাদের আভ্যন্তরীণ 'আমিত্বের' সাথে সম্পর্কিত। প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য হতে হবে, হউক সে যুবক বা বৃদ্ধ, ধনী বা দরিদ্র, জ্ঞানী বা মূর্খ, দৈনন্দিন যা কিছু আয়-ব্যয় করেছে তা উপলব্ধি করা, যেভাবে বৈজ্ঞানিকেরা তাদের প্রতিদিনের গবেষণা কার্যের ফলাফল লিপিবদ্ধ করে থাকে। ধৈর্য ও খুঁটিনাটি সহকারে এসব পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে আমাদের দেহ ও আত্মা ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করবে।

ব্যঙ্গোক্তি ও অপমানকারীরা

কিছু লোকের স্বভাব হচ্ছে অন্যলোকদের দোষ, ভুল ত্রুটি ও গোপনীয় ব্যাপারাদির খোঁজ করা এবং এসবের জন্য তাদের দোষী করা ও তাদের সমালোচনা করা। অনেক সময় দেখা যায় এসব লোকের দোষত্রুটি ও দুর্বলতা এদের উন্নত গুণাবলীর চাইতে অনেক বেশী হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের নিজেদের প্রতি নজর না দিয়ে অন্যদের দূর্বলতা নিয়ে বেশী ব্যতিব্যস্ত থাকে।

অন্যদের অপমান করা একটা বদ অভ্যাস যা মানুষের জীবনকে অপবিত্র করে এবং তার আচার-আচরণের সৌন্দর্যকে কলুষিতকরে।

যে সব কারণে অন্য মানুষকে খাটো করে দেখাতে মানুষ প্ররোচিত হয় তা অত্যধিক বিপজ্জনক আকার ধারণ করে যখন তার সঙ্গে থাকে অতিশয় আত্মগর্ব, গোড়ামী ও ধার্মিকম্মন্যতা। এসব আচরণগত জটিলতা মানুষকে মিথ্যা রায় দানে প্ররোচিত করে আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে এ ধারণা হতে থাকে যে তারা নিজেরা সঠিক সত্য অবস্থানে রয়েছে।

যারা সব সময় অন্যদের সমালোচনা করে তারা তাদের প্রচেষ্টাকে এমন কাজে নষ্ট করে যা যুক্তি বা কোন দৃষ্টিতেই গ্রহণযোগ্য নয়। তারা তাদের বন্ধুদের দোষ খুঁজে বের করে তাদেরকে অপমানিত করা ও হেয় প্রতিপন্ন করার ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদান করে থাকে। এটা করতে গিয়ে তারা তাদের নিজেদের ভুলের প্রতি লক্ষ্য করে তা সংশোধন করার মত সত্যকে উপেক্ষা করে। এভাবে তারা তাদের নিজেদেরকে সত্য ও সঠিক হেদায়েতের পথ হতে সরিয়ে নিয়ে যায়। যাদের মধ্যে সাহসিকতার অভাব রয়েছে তারা কোন নিয়ম কানুন মানে না অথবা অন্যদের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে না; তারা তাদের নিকটস্থ লোকদের সঙ্গেও মিলেমিশে চলতে পারে না। যখন তারা অপমান করার মত পরিচিত লোক পায় না তখন তারা তাদের বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়দের তাদের আক্রমণের শিকার বানায়। আর এজন্য এসব লোক ভালবাসা ও সম্মান পাওয়ার মতো খাঁটি বন্ধু বানাতে পারে না।

মানুষ তার সমগ্র জীবনব্যাপী সম্মান অর্জন করে; সুতরাং, যারা

অন্যদের সম্মানের উপর আঘাত করে তারা তাদের নিজেদের সম্মানকে অপমান ও ধ্বংসের কবলে নিয়ে যায়, যারা সব সময় অন্যদেরকে অপমানিত করে যদিও তারা বুঝতে পারে না যে তারা তাদের এহেন আচরণের দ্বারা নিজেদের কতখানি ক্ষতি করছে, তারা তাদের অন্যায় কাজসমূহের ক্ষতিকর সামাজিক প্রতিক্রিয়া কিছুতেই রোধ করতে পারে না। অন্যায় কাজ মানুষের জন্য ঘৃণা, শত্রুতা ও বিরক্তি ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনে না। হয়ত তারা দুঃখ অনুভব করে, কিন্তু প্রবাদ আছে, "যে পাখী একবার তার বাসা হতে উড়ে যায় তাকে আর তার বাসায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়।" যে অন্যদের সঙ্গে সামাজিকভাবে মিলেমিশে চলতে চায় তাকে অন্যের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত করে নিতে হবে। তন্মধ্যে একটি কাজ হতে হবে অন্যদের ভাল ভাল কাজ ও গুণবৈশিষ্ট্যের প্রতি নজর দিয়ে এসবের জন্য তাদের প্রশংসা করা। তাকে এমন সব বৈশিষ্ট্য হতে অবশ্যই মুক্ত হতে হবে যা অন্যের মর্যাদার প্রতি অপমানকর এবং ভালবাসার মূলনীতির বিরোধী। কেননা ভালবাসা তখনই টিকে থাকে যখন তা উভয়ের মধ্যে বিনিময় হয় এবং উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে। যারা ভালবাসার পাত্র ও বন্ধুদের দোষগুলো গোপন করে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলছে তারাই সম্পর্কের স্থায়িত্ব বহাল রাখতে সক্ষম হবে। সঙ্গে সঙ্গে ভালবাসার পাত্রদের দুর্বল দিকগুলোর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়া হলে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আরো জোরদার হবে।

অবশ্য, বন্ধুর কোন দূর্বলতার প্রতিকারের প্রতি তার মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হলে বিশেষ দক্ষতার সহিত তা প্রয়োগ করতে হবে যাতে তার অনুভূতি অপমানিত বোধ না করে।

জনৈক শিক্ষকের মতেঃ

"শ্রোতার কোন ভুলের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে তা ইশারা ও অঙ্গভঙ্গির দ্বারা সম্ভব। স্বাভাবিকভাবে সরাসরি বলার প্রয়োজন নেই। তুমি যদি কাউকে বল, 'তুমি ভুল করেছো' সে কখনও তোমার কথা মেনে নিতে রাজী হবে না। কেননা তুমি তার যুক্তি, চিন্তাশক্তি ও আত্মবিশ্বাসকে অপমান করেছো। সরাসরি তার মুকাবিলা করার কারণে সে তোমার মতের সঙ্গে ঐক্যমত না হয়ে তোমার কাজকে প্রতিহত করবে যদিও সন্দেহাতীতভাবে তুমি প্রমাণ করেছো যে তুমিই সঠিক। কারোর সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করতে গিয়ে একথা দিয়ে

আরম্ভ করো না যে, 'আমি একথা প্রমাণ করবো, অথবা আমি এর সত্যতা প্রমাণ করে ছাড়বো।' কেননা এটার অর্থ হচ্ছে তুমি যার সাথে কথা বলছো তার চাইতে তুমি বেশী চালাক ও বুদ্ধিমান। কারো চিন্তার সংশোধন হচ্ছে অত্যন্ত জটিল কাজ। সুতরাং ভুল পদ্ধতির অনুসরণ করতে গিয়ে কোন বিষয়কে জটিলতর করে বাধার সৃষ্টি করা হবে।

যখন তুমি কোন বিষয় প্রমাণ করতে চাও তখন এটা খুবই প্রয়োজনীয় যে অন্যরা যেন তোমার ইচ্ছা সম্পর্কে টের না পায়। তুমি তোমার লক্ষ্যের দিকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকবে যাতে অন্যরা তোমার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানার কোন সুযোগ না পায়। এ ময়দানে কাজ করতে গিয়ে সবসময় এ কথাটার প্রতি খেয়াল রাখবে–"শিক্ষক না হয়ে অন্যদেরকে শিখাবে।"

ধর্মীয় শিক্ষা বনাম কটুক্তি ঃ

পবিত্র কালামে পাক কটুক্তিকারীদের বিষাদময় পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে এবং তাদেরকে তাদের মন্দকাজের পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে।

কালামে পাকে বলা হয়েছেঃ

"বদনাম রটনাকারী ও হেয় প্রতিপন্নকারীদের জন্য আক্ষেপ।"

ঐক্য বজায় রাখার জন্য ইসলাম ভাল আচরণ ও উত্তম চালচলনের নিয়ম মেনে চলাকে সকল মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক বলে গণ্য করে। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সম্পর্কের অবনতি রোধে এবং বিচ্ছিন্নতা পরিহারের লক্ষ্যে ইসলাম বদনাম রটানো এবং কটুক্তিকে নিষিদ্ধ করেছে। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হচ্ছে অন্য মুসলমানের অধিকার রক্ষা করা ও অন্যদেরকে অপমানিত করা ও লজ্জা দেওয়া হতে বিরত থাকা।

ইমাম সাদেক (আঃ) বলেছেনঃ

"একজন তৃষ্ণার্ত মানুষ ঠান্ডা পানি পেলে যতখানি তৃপ্ত বোধ করে ঠিক তেমনি একজন ঈমানদার অন্য ঈমানদারের সাক্ষাত পেলে তার চাইতেও অধিক স্বস্তি বোধ করে।"

– *আল কাফী ২য় খন্ড ১৪৭ পৃঃ*

ইমাম বাকের (আঃ) বলেছেনঃ

একজন ছিদ্রান্বেষণকারী অন্যের দোষ খুঁজতে সদা তৎপর অথবা নিজের

মধ্যে যে সব দোষ রয়েছে তার প্রতি সে উদাসীন। এমন সব দোষের কারণে সে অন্যের সমালোচনা করে যা তার মধ্যেও আছে। এইভাবে করতে করতে সে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মনে এমন বিষয়ে আঘাত দেয় যে দোষের অস্তিত্ব ঐ বন্ধুর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

একজন লোকের দোষের জন্য এটাই যথেষ্ট যে সে অন্যদের দোষের প্রতি লক্ষ্য করে এবং তার নিজের মধ্যে যেসব দোষ রয়েছে তৎপ্রতি কোন খেয়াল করে না, এমনসব কারণে অন্যদের সমালোচনা করে যেসব তার মধ্যেও রয়েছে, ঘনিষ্ঠ বন্ধুর মনে এমন বিষয়ে আঘাত দেয় যে ব্যাপারে সে বন্ধুসংশ্লিষ্ট নয়।

– আল কাফী ২য় খন্ড পৃঃ ৪৫৯

তাঁদের পিতামহ হজরত আলী (আঃ) বলেছেনঃ

"এমন সব লোকদের সাহচর্য পরিহার কর যারা অন্যের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায় কারণ তাদের সাথীরাও তাদের ক্ষতিকর প্রভাব হতে মুক্ত নয়।"

–গুরার আল হিকাম, পৃঃ ১৪৮

সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করা যদিও মানুষের স্বভাবের একটা অংশ তবুও গঠনমূলক সমালোচনার প্রতি মনোযোগী হওয়া দরকার। গঠনমূলক উপদেশাবলীর ছায়াতলে থেকেই আমরা এমন কিছু উপাদান তৈরী করতে সক্ষম হবো যা আল্লাহ পাকের ইচ্ছায় আমাদের অগ্রগতির সহায়ক হবে।

আমীরুল মুমেনীন হজরত আলী (আঃ) উপরোক্ত সত্যকেই তুলে ধরেছেন যখন তিনি বলেছেনঃ

"লোকদের মধ্য হতে এমন সব লোককে তোমার অন্তরঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করবে যে তোমাদের দুর্বলতাসমূহ (খুঁজে বের করার) ব্যাপারে তোমাকে সুপথ দেখাবে এবং তোমাকে খারাপ কাজ হতে বিরত রাখবে।"

– গুরার আল হিকাম পৃঃ ৫৫৮

ডেল কার্ণেগীর "বন্ধু ও প্রতিপত্তি লাভের উপায়" নামক গ্রন্থ হতে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি প্রদান করা গেলঃ

"আমাদেরকে অবশ্যই সমালোচনা মনোযোগ দিয়ে শোনা ও মেনে নেওয়া উচিৎ। আমাদের দুই তৃতীয়াংশ কাজ ও চিন্তাকে সঠিক বলে আশা করা ঠিক নয়। আলবার্ট আইনষ্টাইন স্বীকার করেছেন যে, তাঁর শতকরা ৯৯ ভাগ চিন্তা ও সিদ্ধান্ত ছিল ভুল। যখন কোন লোক আমার সমালোচনা করতে চায় তখন সে কি বলতে চায় সেদিকে লক্ষ্য না করে আমি আমাকে আত্মরক্ষাকারী হিসেবে দেখতে পাই। কিন্তু পরমুহূর্তে আমি এর জন্য দুঃখ বোধ করি। আমরা সকলে

প্রশংসা ও সুখ্যাতি পছন্দ করি এবং তিরস্কার ও সমালোচনা অস্বীকার করি। কিন্তু এসব মন্তব্যের নির্ভুলতা ও যথার্থতার পরিমাপ সম্পর্কে আমরা খেয়াল করি না। বস্তুতঃপক্ষে, আমরা প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা নয় বরং আবেগ ও অনুভূতির দ্বারা পরিচালিত হই। সর্বদাই আমাদের মন অন্ধকার সমুদ্রে চলন্ত জাহাজের মত যা অনুভূতির উত্তাল ঢেউয়ের দোলায় দোদল্যমান। বর্তমান সময় হয়তো আমাদের অধিকাংশ লোক আত্মবিশ্বাসী, কিন্তু আরও চল্লিশ বছর পর আমরা যখন আমাদের পূর্বেকার কাজ ও চিন্তার প্রতি ফিরে তাকাবো তখন আমরা হাসবো।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ

"যে অন্যের দুর্বলতার অনুসন্ধান করে তাকে প্রথমে নিজের দিকে তাকাতে হবে।"

– *গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৬৫৯*

ডাঃ এইচ শাখতার বলেছেনঃ

"অন্যের কথা ও কাজের ব্যাপারে আপত্তি করার পূর্বে এটা অপেক্ষাকৃত ভাল যে মানুষ তার নিজ নিজ সমস্যা ও দুঃখ-দুর্দশা নিয়ে চিন্তা করবে এবং সম্ভব হলে তা সংশোধন করবে। আমাদের সকলের কর্তব্য এই যে আমরা প্রত্যেকে আমাদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি, আমাদের দোষ ও দুর্বলতাসমূহ অনুসন্ধান করে বের করি এবং সম্ভব হলে তা সংশোধন করি।"

–রাশ্‌দে শাখচিয়্যাত

অজ্ঞ লোকেরা তাদের দুর্বলতাসমূহ উপড়ে ফেলার প্রচেষ্টা না চালিয়ে তা লুকানোর চেষ্টা করে।

ইমাম আলী (আঃ) এর মতেঃ

"মানুষের নির্বুদ্ধিতার জন্য সে অন্য লোকের ছিদ্রান্বেষণ করে এবং নিজের মধ্যে লুকানো দোষকে উপেক্ষা করে।"

– *গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৫৫৯।*

ডাঃ আইবুতি বলেছেনঃ

"আমাদের মুর্খতার কারণে আমরা প্রায়ই আমাদের দুর্বলতা, আমাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতাকে আড়ালে ঢেকে রাখি এবং এইভাবে আমরা আত্মতৃপ্ত হই। এটা পরিহাসের বিষয় যে মানুষ তার দুর্বলতাকে দূর করার কোন চেষ্টা না করে তা জনগণের দৃষ্টির আড়ালে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।" তথাপি যখন তাদের একটা দোষ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন তা তারা ঢেকে রাখতে

পারে না। তখন তারা তাদের নিজেদেরকে ও অন্যদেরকে খুশী করার জন্য হাজার হাজার অজুহাত সৃষ্টি করে। তারা লোকচক্ষুর সম্মুখে তাদের দোষের গুরুত্বকে খাটো করে দেখাতে চেষ্টা করে। এসব করতে গিয়ে তারা একথা ভুলে যায় যে যতই দিন যেতে থাকবে ততই তাদের এ দোষের ব্যাপকতা লোকের সম্মুখে আরও সুস্পষ্ট হতে থাকবে ঠিক যেমনিভাবে একটা বীজ বেড়ে একটা প্রকান্ড গাছে পরিণত হয়।"

– দার যস্তোয়ুয়ে খুশবাখতী

বিভিন্ন রোগ নির্বাচন ও চিকিৎসার জন্য মনোবিজ্ঞানীদের নিকট গৃহীত একটি মাত্র পদ্ধতি হচ্ছে ব্যক্তিত্বকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা। ইমাম আলী (আঃ) মানুষকে এই একই পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

"জ্ঞানী লোকের দায়িত্ব হবে তাদের ধর্মীয় দোষত্রুটি, মতামত ও আচার–আচরণ একত্র করে একটা বইতে লিপিবদ্ধ করা বা মনের মধ্যে গেঁথে রাখা এবং তা দূর করার জন্য কাজ করা।"

–গুরার আল হিকাম পৃঃ ৪৪৮

একজন মনোবিজ্ঞানীও এ সম্পর্কে বলেছেনঃ

"পরিষ্কার মন নিয়ে একটা নির্জ্জন কক্ষে আরামে বসুন এবং পরিবারের লোকজনদেরকে বলে দিন কেউ যেন আপনাকে বিরক্ত না করে। স্থানটা যত বেশী আরামদায়ক হবে আর আপনি যত বেশী অবসর থাকবেন তত বেশী ভাল হবে কারণ আমরা যা করতে চাই তার জন্য একটা মৌলিক নিয়ম মেনে চলা প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে আপনার মনোযোগকে নষ্ট করতে দেওয়া যাবেনা এবং আপনার চিন্তা প্রধান লক্ষ্যের উপর কেন্দ্রীভূত থাকবে। আপনার দেহ ও কোন দৈহিক চাহিদা দ্বারা মনোযোগকে ভিন্নমুখী করতে পারবে না।"

আপনার সাথে কিছু সস্তা কাল কাগজ ও সহজে লেখার উপযোগী একটা কলম নিন। আমি সস্তা কাল কাগজের কথা এজন্য উল্লেখ করেছি যাতে খরচের কথা চিন্তা না করে আপনি অনেক কাগজ সংগ্রহ করতে পারেন। আমি সহজ কলমের কথাও এজন্য উল্লেখ করেছি যে আপনি আপনার নিজের পরীক্ষা কাজ চালানোর সময় আপনি হাজার হাজার আত্মিক ও মনস্তাত্বিক কারণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়বেন, আপনার এমন একটা কলমের প্রয়োজন যা আপনার মনকে অন্যদিকে না সরিয়ে যে সহজে লিখতে সাহায্য করবে। আপনাকে আজকের দিনে ও পূর্ববর্তী দিনে যেসব ধরনের অনুভূতি ও প্রতিক্রিয়ার মুকাবিলা করতে হচ্ছে তা তালিকাভুক্ত করুন। এখন এর প্রতিটি সম্পর্কে পর্য্যালোচনা

করুন। গভীরভাবে এসব নিয়ে চিন্তা করুন, অতঃপর এসব অনুভূতি সম্পর্কে কোন প্রকার সংশয় ছাড়া যা আপনার মনে আসে লিপিবদ্ধ করুন। যদি অধিক সময়ও লেগে যায় তার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনি আপনার সকল কাজ, চিন্তা, অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করার পর আত্মপ্রীতি, নির্জনতা, আত্মভিমান ইত্যাদি প্রবণতা সমূহকে মনে আনুন। এখন প্রতিটি চিন্তা ও কাজকে উক্ত চিন্তা ও কাজের প্রেরণা প্রদানকারী অনুভূতির সহিত মিলান। এবং এ সহজ প্রশ্নটা নিজেকে করুন কোন্ প্রবণতা আপনাকে একথা বলতে বা এ কাজ করতে প্রেরণাযুগিয়েছে। ?"

"এ মনস্তাত্ত্বিক আত্মবিশ্লেষণের উদ্দেশ্য হচ্ছে রোগীকে এমন সুযোগ দেওয়া যাতে সে তার জীবন্ত ও গঠনমূলক সম্ভাব্য সর্বাধিক চিন্তাশক্তি দিয়ে তার মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া ও স্নায়ুবিক দুর্বল অবস্থা উপড়ে ফেলবে এবং এভাবে তার সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন ঘটাবে। এখন সে সচেতনভাবে অনুভব করতে থাকবে যে সে একজন নূতন মানুষ। সে জীবনের নূতন লক্ষ্য ও অর্থ উপলব্ধি করতে শুরু করবে এবং নিজের জন্য পূর্ববর্তী পথের বদলে একটা নূতন পথ তৈরী করতে সক্ষম হবে।"

– *রাতান কাভী*

৮

পরশ্রীকাতরতা

* একটি বিভ্রান্ত ও কলুষিত বাসনা
* পরশ্রীকাতর লোকেরা বঞ্চনা ও ব্যর্থতার আগুনে দগ্ধ হয়
* ধর্ম বনাম পরশ্রীকাতরতা

একটা বিভ্রান্ত ও কলুষিত বাসনা!

মানুষ তার এ অস্থায়ী জীবনে সর্বদা সমস্যা ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে বাস করে। সে তার আত্মা ও দেহের উপর হতে দুঃখ কষ্টের চাপ হ্রাস করার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে যাতে আশার ফসল লাভ করতে পারে যা একের পর এক তার জীবনে বিকশিত হয়। যতদিন পর্যন্ত জীবনের সাথে মানুষের সম্পর্ক মৃত্যুর ভয় দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হয় ততদিন সে একটা আশার পথ দেখতে থাকে, সে সর্বদা সুখ অর্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। উপসংহারে, আশার আলো মানুষকে জীবন দান করে, জীবনের তিক্ততাকে মধুর করে তোলে।

আমাদের মধ্যে কেউ কেউ ধনী ও সম্পদশালী হতে চায় এবং এসব লাভ করার জন্য এমনিভাবে চেষ্টা চালাতে থাকে যার কোন সীমানা থাকে না। আবার অনেকে চায় পদবী সুনাম ও সুখ্যাতি।

মানুষের কাজকর্ম তার দৈহিক চাহিদা, আধ্যাত্মিকস্তর ও মনস্তাত্ত্বিক সততার সাথে সম্পর্কিত, চিন্তার ধরনের বিভিন্নতার সাথে সাথে মানুষের আশা-আকাঙ্খাও বিভিন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের এটা উপলব্ধি করা দরকার যে আশা আমাদের জীবনে তখনই সুখ নিয়ে আসে যখন তা পারলৌকিক প্রয়োজনের নিশ্চয়তা দেয় ও মানসিক প্রয়োজন মেটায়। আশা আমাদের জ্ঞানের পর্যায়কে উন্নত করে জীবনের পথসমূহকে আলোকিত করার মাধ্যমে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-আপদ হতে রক্ষা করে। বদমেজাজ বা অতিশয় আত্মগর্বিতার মত প্রবণতা দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ হয়ে থাকে। পরশ্রীকাতরতা এমন একটা প্রবণতা যা মানুষকে সঠিক পথ হতে সরিয়ে নেয় এবং মানুষের বিবেককে বন্দী করে। এটি তাকে বাস্তব লক্ষ্যে পৌছার পথে বাধা প্রদান করে। পরশ্রীকাতর লোক অন্যদের সুখে থাকাকে সহ্য করতে পারে না। অন্যের কল্যাণের প্রতি হতাশাজনিত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা নিজেদের উপর অত্যধিক চাপ অনুভব করে।

কথিত আছে যে সক্রেটিস বলেছেনঃ "অন্যেরা যা লাভ করেছে তা সে লাভ করতে পারেনি একথা ভেবে পরশ্রীকাতর লোকেরা দুঃখ অনুভব করে এবং তাদের দিনগুলো ধ্বংস করে। সে সর্বদা দুঃখ-যন্ত্রণা অনুভব করতে থাকে এবং

অন্য মানুষকে সুখশান্তি হতে বঞ্চিত রাখার জন্য সর্বদা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে সে এ আশাই করতে থাকে অন্যরা সবসময় দুঃখকষ্টে থাক, এ কামনাই সে করে।"

জনৈক খ্যাতনামা লেখক লিখেছেনঃ "আমাদের আত্মাগুলি মরুভূমির মধ্যখানে অবস্থিত এমন একটা শহরের মত যাকে সুরক্ষিত রাখার মত কোন প্রাচীর বা দুর্গ নেই, তারা সর্বদা সুখশান্তি বিনষ্টকারী চোর ডাকাতদের উপদ্রবের শিকার। সামান্যতম বাতাসই আমাদের আত্মাসমূহের ঢেউকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়, আমাদের প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমাদের আত্মার একাধিক শত্রু আত্মার গভীরে প্রবেশ করে আমাদের উপর আদেশ নিষেধ চালাবার ক্ষমতা অর্জন করে। প্রতিটি সাধারণ লোকও জানে যে তার মাথাব্যথা শুরু হলে তাকে ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়, কিন্তু পরশ্রীকাতরতার রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিটি কোন সময় তার রোগের কথা স্বীকার করবে না এবং চিকিৎসার জন্যও কাউকে পাবে না।"

হিংসুটে লোকেরা অন্যদের সৌভাগ্যকে তাদের লক্ষ্য বানিয়ে নেয়, তারা যে কোন পন্থায় তাদেরকে তাদের সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত করতে চায়। তারা পশু প্রবৃত্তির শিকার, অথচ তারা তা উপলব্ধি করে না। যাদের ভাল তারা সহ্য করতে পারে না তাদের বিরুদ্ধে অপবাদ ও তারা মিথ্যা প্রচার করে বেড়ায়। এসব করেও যদি তাদের লালসা চরিতার্থ না হয় তখন তারা আরও বেশী অগ্রসর হয়ে তাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করে, এমন কি তারা সীমাহীন চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে তাদের বেঁচে থাকার অধিকারের উপরও হস্তক্ষেপ করে। প্রকৃতপক্ষে, এসব হচ্ছে এক ধরনেরপ্রবণতা।

এসব প্রবণতা কি মানব-জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ? এবং এটা কি স্বাভাবিক?

পরশ্রীকাতর লোকদের যে শুধু মনুষ্যত্বের গুণ থাকে না, তা নয় তারা জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা যে মানুষ অন্য মানুষের ব্যথা-বেদনার প্রতি সহানুভূতিশীল নয় তার মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়নি।

হিংসুটে লোক ব্যর্থতা ও বঞ্চনার আগুনে দগ্ধ হতে থাকে

জীবনে অগ্রগতি ও উন্নতি লাভের একটা ফলপ্রসূ উপায় হচ্ছে অন্যদের অন্তরের ভিতর ঢুকে পড়া ও তাদেরকে প্রভাবিত করা। যারা

তাদের মহৎ গুণাবলীর পরিচালনা ও যোগ্যতার দ্বারা অন্যদের হৃদয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়, তারা তাদের অগ্রগতিতে সমাজের অন্য লোকদের সহযোগিতা লাভে সক্ষম হয়। আর এটাই হচ্ছে সফলতার চাবিকাঠি। ভাল মানুষ হচ্ছে সমাজের আলোকবর্তিকার মত, তারা আলো বিকীর্ণ করে এবং সমাজের লোকদের আচরণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, তাদের চিন্তাধারাকে পরিচালিত করে।

অপরপক্ষে, হিংসা মানুষের সুন্দর গুণাবলী ও উন্নত আচরণকে ধ্বংস করে, মানুষের মনে সুকুমার বৃত্তির, বিকাশ না হওয়ার কারণে তাদের সঙ্গী সাথীরা তার সাহচর্যের মূল্যবান সুযোগ হতে বঞ্চিত হয় অথবা তাদের জীবন আকাশে দীপ্তিমান ভালবাসার তারকা খুঁজে পায় না। তাই হিংসুটে লোকেরা হিংসার কারণে সাহায্য-সহযোগিতার সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। অধিকন্তু, পরশ্রীকাতর লোকেরা যখন তাদের কথা ও কাজের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিকে প্রকাশ করতে থাকে এবং জনগণের সম্মুখে তাদের নোংরামী ও দুর্নীতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়, তখন এদের বিরুদ্ধে জনগণের পক্ষ হতে ব্যাপক ঘৃণা ও বিদ্বেষ দেখা দেয়। পরশ্রীকাতরতার কারণে পরশ্রীকাতর লোকদের অন্তরের মধ্যে যে যন্ত্রণা ও সুস্পষ্ট উদ্বেগ দেখা দেয় তার চাপের ফলে তাদের অন্তরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। এই আগুন তাদের প্রিয় আত্মাকেও জ্বালিয়ে ফেলে।

হিংসুটে লোকদের আত্মা যে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার অগ্নিশিখায় জ্বলতে থাকে তা সুস্পষ্ট। অবিরত দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের কারণে তাদের আত্মা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। পরশ্রীকাতরতা এক ধ্বংসাত্মক ঝড়ের মত যা নৈতিকতার গাছটিকে এমনভাবে সমূলে উপড়ে ফেলতে থাকে যা হিংসুটে লোকের পক্ষে কোনক্রমেই বন্ধ করা সম্ভব নয়।

যখন কাবিল দেখতে পেলো যে তার প্রদত্ত কোরবানী গৃহীত না হয়ে হাবিলের কোরবানী কবুল হয়েছে, কাবিলের মনে হিংসার আগুন জ্বলে উঠলো। সে কাবিলকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নেয়। কাবিলের অন্তরে প্রতিহিংসা জেগে উঠলো এবং তাকে মানবতা ও ভ্রাতৃত্বের অনুভূতি হতে বঞ্চিত করলো। এটা তাকে প্ররোচিত করলো তার ভাইয়ের মস্তককে এক প্রকাণ্ড প্রস্তরাঘাতে দ্বিখন্ডিত করে তার দেহকে পবিত্র রক্তে ডুবিয়ে দিতে কাবিল একটি মাত্র কারণ ছাড়া আর অন্য কোন কারণে এ কাজটি করেনি এবং তা হলো তার ভাই হাবিলের নিয়্যত ও আচরণের পবিত্রতা।

নীরব পৃথিবী প্রত্যক্ষ করলো প্রতিহিংসার সর্বপ্রথম অপরাধ যা হযরত আদম (আঃ)–এর পুত্রের ঘৃণ্য অপরাধের ফলে সংগঠিত হয়েছিল। এ ভয়াবহ অপরাধ সংগঠিত হওয়ার পর কাবিল দুঃখ অনুভব করেছিল। কিন্তু কাবিলের সে দুঃখ জীবনে তার কোন কাজে আসেনি। কেননা তার অবশিষ্ট জীবনের জন্য সে তার বিবেকের তীব্র ঘৃণার শিকারে পরিণত হয়ে পড়েছিল। কাবিলের চিন্তা যদি নির্ভুল ও বাস্তব পন্থায় পরিচালিত হতো তাহলো ঐশী অনুগ্রহ হতে বঞ্চিত হওয়ার ব্যাপারটি তার কাছে ধরা পড়ে যেতো। আল্লাহ একমাত্র ধার্মিকদের নিকট হতেই (কোরবানী) কবুল করে থাকেন।

স্কপেন হয়ের এর মতেঃ

"মানুষের অনুভূতিসমূহের মধ্যে হিংসা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী বিপজ্জনক। সুতরাং প্রধান শত্রু হিসাবে মনে করে মানুষের উচিত তার জীবনের সুখের পথ হতে একে অপসারিত করা।"

অধিকন্তু, সমাজে পরশ্রীকাতরতার বহুল প্রসার ঘটতে থাকলে মানুষের মধ্যে বহু অবাঞ্ছিত বিষয় দেখা দেয় যেমন তর্কবির্তক ইত্যাদি। দুঃখ–যন্ত্রণা ও সমস্যা ভারাক্রান্ত সমাজের প্রতিটি মানুষ অন্য মানুষের উন্নতি ও সুখ শান্তির জীবনের পথে, পূর্ণতা ও সামাজিক উন্নতির সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ না করে, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী হিসেবে কাজ করে। কোন সমাজে হিংসা ঢুকে পড়লে সামাজিক মুক্তি বাধাগ্রস্থ হয়, এর ফলে সমাজের লোকদের মন হতে পারস্পরিক সহযোগিতা, আস্থাশীলতা ও শান্তির মনোভাব তিরোহিত হয়, যা সমাজের উন্নতি ও সভ্যতা সত্ত্বেও তাকে ধ্বংসের দিকে পরিচালিত করে।

ডাঃ কার্লের মতেঃ

"আমাদের কৃপণ স্বভাবের কারণে হিংসার জন্ম হয়। শিল্পোন্নত দেশসমূহের অর্জিত অগ্রগতি তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে প্রসার লাভের পথে হিংসা একটি বাধা। এমনকি তাদের হিংসার কারণে অনেক সুযোগ্য লোক দেশ পরিচালনা করতে পারছেন না।"

বর্তমান সময়ে অধিকাংশ মারাত্মক অপরাধ, হিংসার কারণে সংগঠিত হয়। সামাজিক ঘটনা প্রবাহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই এ বক্তব্যের সত্যতা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

ধর্ম বনাম পরশ্রীকাতরতা

সর্বশক্তিমান আল্লাহ কালামে পাকে বলেছেনঃ মানুষ স্বভাবতই নিজেকে ভালবাসে এবং নিজের জন্য সুযোগ সুবিধা পেতে চায়। এ সত্য সত্ত্বেও তাকে অনুরোধ করা হয়েছে, সে যেন তার স্বভাবের আবেদনে সাড়া দিতে গিয়ে আইন শাস্ত্রের বিধিসমূহ, ন্যায়শাস্ত্রসম্মত যৌক্তিকতা ও সামাজিক কল্যাণের প্রতি খেয়াল রেখে চলে। সুতরাং আল্লাহ যখন কারো প্রতি কোন অনুগ্রহ করেন তখন কেউ যেন তার ঈর্ষাকাতর লালসা চরিতার্থ করার জন্য অথবা কোন প্রকার সুবিধা আদায় করার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বস্তুর উপর হস্তক্ষেপ কিংবা এটা হতে তাকে বঞ্চিত না করে। বরং এটাই আশা করা হয় যে, মানুষ জীবনে তার আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ করতে গিয়ে একটি যুক্তিসঙ্গত পথের অনুসরণ করবে।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলেনঃ

"যা দিয়ে আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারুর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তার প্রতি লোভ করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর, আল্লাহ সর্ববিষয়ে অবহিত।"

– *কোরআন ৪ঃ৩২*

এভাবে আমাদের উচিৎ সর্বোত্তম প্রচেষ্টা চালানো এবং আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা জানানো তিনি যেন তাঁর অনন্ত কালীন সম্পদ দিয়ে আমাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, আমাদের কঠিন বিষয় সমূহকে আমাদের জন্য সহজ করে দেন এবং আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য ও আশার কাছাকাছি আমাদের পৌছে দিন। হিংসুটে ব্যক্তিরা যদি তাদের চিন্তা ও অনুভূতিকে স্বাভাবিক পথের বাইরে ব্যয় না করে তাদের জীবনের লক্ষ্যের পথে পরিচালিত করতো তাহলে সুখের আলো অবশ্যম্ভাবীরূপে তাদের পথকে উদ্ভাসিত করতো।

সম্মানিত ইমামদের (আঃ) বর্ণনা থেকে জান' যায় যে তারা আমাদেরকে এই ক্ষতিকর বৈশিষ্ট্যসমূহ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছেন এবং এর বিপজ্জনক পরিণতি হতে পরিত্রাণ লাভের জন্য আহবান

জানিয়েছেন। ইমাম সাদেক (আঃ) হতে বর্ণিত নিম্নোক্ত হাদীস এখনকার জন্য যথেষ্ট। তিনি হিংসার পেছনে যে দুটো আত্মিক কারণ রয়েছে এই হাদীসে তার প্রতি নির্দেশ দান করেছেন।

"পরশ্রীকাতরতা আত্মার অন্ধত্ব ও মহিমান্বিত আল্লাহর অনুগ্রহের অস্বীকৃতি হতে জন্মলাভ করে এবং এ দুটো হচ্ছে অবিশ্বস্ততার দুটো উপাদান। ঈর্ষার কারণেই আদমের সন্তানকে অনন্তকালের জন্য দুঃখ-যন্ত্রণার শিকারে পরিণত হতে হয়েছে এবং অনন্তকাল ধরে শাস্তি ভোগ করতে হবে যা থেকে মুক্তি পাবার কোন উপায় নেই।"

ছোটবেলায় ছেলেমেয়েদেরকে বাড়ীতে খারাপ পরিবেশের মধ্যে প্রতিপালন এমন একটি বিষয় যা হতে হিংসার উৎপত্তি হয়। যদি বাপ-মা দু'ছেলের মধ্যে একজনের প্রতি বিশেষ ভালবাসা ও মায়া মমতা প্রদর্শন করতে থাকে এবং অন্য ছেলে এসব হতে বঞ্চিত হতে থাকে তা হলে তার মধ্যে অপমান ও বিদ্রোহের মনোভাব জন্ম নেবে। যে ধরনের হিংসা অধিকাংশ লোকের মধ্যে দেখা যায়, তা প্রধানতঃ বাড়ীতেই জন্মলাভ করে এবং তা সমাজের অধিকাংশ লোকের জন্য দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কারণ হয়ে থাকে। যদি কোন সমাজের শাসন ব্যবস্থা অন্যায়, অত্যাচার, সাম্প্রদায়িকতা, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এ ধরনের অবস্থা ঐ সমাজের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসাবে দেখা দেয়।

এ ধরনের সমাজে লোকদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ ব্যাপক আকারে দেখা দেবে এবং তাদের অন্তর পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের আগুনে জ্বলতে থাকবে।

আল্লাহর রাসূল (দঃ) মুসলমানদেরকে তাদের সন্তান সন্ততিদের ক্ষেত্রে অন্যায় ও বৈষম্যমূলক আচরণ করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে মানুষের জীবন হিংসা কিংবা অন্যান্য অপরাধের দ্বারা অপবিত্র না হয়।

তিনি বলেছেন,

"ছেলেমেয়েদের মধ্যে উপহার উপঢৌকন বিতরণের ব্যাপারে সকলকে সমান বলে গণ্য করতে হবে।"

প্রফেসার বার্ট্রান্ড রাসেল মানুষের লুকিয়ে থাকা অপরাধসমূহ পরিহারের ব্যাপারে 'দি ফেয়ার চাইল্ড ফ্যামিলি' নামক গ্রন্থের লেখকের

নিম্নোক্ত অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

"লুসীকে তার অন্তরে যে সব কু চিন্তা উদয় হতে পারে তা লিপিবদ্ধ করার জন্য একটা নোট বই দেওয়া হয়েছিল। সকাল বেলা নাশ্‌তার টেবিলে তার পিতামাতা তার ভাইকে একটা গ্লাস ও তার বোনকে একটা ক্যাসেট দিয়েছিল কিন্তু লুসীকে কিছুই দেয়া হয়নি। লুসী তার নোট বইতে লিখেছে যে ঐ মুহূর্তে তার মনের মধ্যে একটা খারাপ চিন্তার উদয় হয়েছিল। সে চিন্তা করলো যে তার পিতামাতা তার চাইতে তার ভাই বোনকে বেশী ভালবাসে।"

ইমাম আলী (আঃ) হিংসা ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বলেন,

"পরশ্রীকাতর লোকদের শারীরিক সুস্থতা সম্পর্কে অজ্ঞতা দেখে আমি বিস্মিত।"

– গুরার আল হিকাম ৪৯৪ পৃঃ।

ডাঃ ফ্রাঙ্ক হর্কও বলেনঃ "তোমার নিজেকে এবং তোমার চিন্তাকে মানসিক অনুভূতির যন্ত্রণা হতে রক্ষা কর। কেননা এই অনুভূতিগুলো হচ্ছে অন্তরের শয়তান যা মানুষের চিন্তা পদ্ধতিকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত থাকে না বরং তার মধ্যে বিষাক্ত কোষ জন্মাতে সাহায্য করে। এরা শরীরের মর্মান্তিক ক্ষতিসাধন করে থাকে। এসব যন্ত্রণা রক্ত সঞ্চালন হ্রাস করে, স্নায়ু ব্যবস্থাকে দুর্বল করে, শারীরিক ও মানসিক কর্মতৎপরতাকে বাধাগ্রস্ত করে, মানুষকে তার উদ্দেশ্য ও আশা আকাঙ্খার বাস্তবায়ন হতে বঞ্চিত করে, চিন্তার মানকে অনেক নীচে নামিয়ে দেয়।

মানুষকে অবশ্যই এসব সর্বনাশা শত্রুর পরিবেশ হতে মুক্ত হতে হবে। এসব মানুষের জীবন হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে অনেক দূরে নির্বাসিত করতে হবে। যারা এটা করতে সক্ষম হবে তারা বুঝতে পারবে যে তাদের ইচ্ছাশক্তি অনেক শক্তিশালী হয়েছে এবং তারা জীবনে যে কোন সম্ভাব্য বাধা বিপত্তির বিরুদ্ধে বিজয়ী হবে।" ফিরোজী ফকির

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ

" হিংসা মানুষের দৈহিক উন্নতির অন্তরায়।" তিনি এর মানসিক ক্ষতির কথাও বর্ণনা করেছেন।

– গুরার আল হিকাম পৃঃ ৩২

যেমনঃ–

"হিংসা হতে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা কর কেননা এটা আত্মাকে উপহাসকরে।"

– গুরার আল হিকাম পৃঃ ১৪১

জনৈক মনস্তত্ত্ববিদের মতেঃ

" অধিক ঈর্ষা পরায়ণতা একটি মানসিক বিষম মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রণা যা আত্মার কষ্ট, সংশোধনাতীত ভুল, অন্যায় ও অত্যাচার সৃষ্টি করে থাকে। এটা আমাদের মনে রাখা দরকার যে ঈর্ষাপরায়ণতার অনেকগুলা কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে হয় না কিন্তু তা ঈর্ষার কুফলজনিত মনোভাবের কারণে হয়ে থাকে।"

– রাডীনকাডী

হীন আশা–আকাঙ্খা ও লোভ মানুষের জীবনের মাধুর্যকে তিক্ততায় পরিবর্তন করে। এদেরকে আমাদের জীবনের সুউচ্চ ও সর্বোৎকৃষ্ট মানবীয় গুণাবলী অর্জনের পথে দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করার সুযোগ দেওয়া কিছুতেই উচিত হবে না। এসব গুণাবলী ও বৈশিষ্ট পারে চিন্তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে এবং শেষ পর্য্যন্ত এরাই আমাদের জীবনকে মহত্তর লক্ষ্যে পরিচালিত করবে।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ

" ভালো আশা এবং মহৎ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রতিযোগিতা করো এবং তোমার পুরস্কার ক্রমেই বাড়তে থাকবে।"

– গুরুর আল–হিকাম ৩৫৫ পৃঃ

ডাঃ মার্ডিন বলেছেনঃ

" কতগুলো নির্দিষ্ট গুণাবলী অর্জনের জন্য যদি তুমি তোমার চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করো তবে তুমি শেষ পর্যন্ত ঐ লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম হবে। প্রকৃতির এইসব বস্তুসমূহ মানুষের স্বাভাবিক চিন্তারই ফসল। অতএব তুমি যদি ঐক্যবদ্ধভাবে, নিরাপত্তা ও সুখে বসবাস করার আকাঙ্খা কর তবে সেভাবেই চলতে পারবে। তোমার দৃষ্টিভঙ্গি যদি হাতাশাব্যঞ্জক হয় এবং প্রতিটি বিষয়কে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখ তবে তুমি এ দুর্বলতা হতে দ্রুত মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে তোমার নেতিবাচক চিন্তাকে সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে এমনভাবে পরিচালিত করতে শুরু কর যা তোমার জীবনকে সক্রিয়তা, সুখ ও শান্তির লক্ষ্যে পরিবর্তিত করবে। মহৎ বৈশিষ্ট্য অর্জনকে জীবনের লক্ষ্য স্থির করে সেই লক্ষ্য অর্জনের জন্য দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সহকারে চেষ্টা করো। কারণ এ লক্ষ্য অর্জনের পথে সুদৃঢ় প্রচেষ্টা চালানোর ফলে তোমার মধ্যে এসব মহৎ গুণাবলী অর্জনের জন্য মানসিক প্রস্তুতি চলতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমাকে সে লক্ষ্যে পৌছে দেবে।

তোমার অভীষ্ট লক্ষ্য ও আকাঙ্খার ব্যাপারে তোমার সিদ্ধান্তের কথা পুনরাবৃত্তি করতে কখনও ইতঃস্তত করো না। তোমার সিদ্ধান্তের কথা তোমার মুখমন্ডলের মধ্যে দেখা দিতে দাও এবং স্বল্প সময়ের মধ্যেই দেখতে পাবে

কিভাবে চুম্বকের মত তোমার চিন্তা তোমাকে তোমার লক্ষ্যের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।" ফিরোজী ফকির

ডাঃ ম্যান তার গ্রন্থে এ বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেনঃ

" আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা হতে খুঁজে পেয়েছি যে, কোন নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্কে চিন্তা শুরু করার সামান্য পূর্বক্ষণ হতে তার কাজ শুরু হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি হাতকে মুষ্টিবদ্ধ করতে চাই তখন আমরা দেখতে পাই যে আমাদের হাতের মাংসপেশীগুলোএকটু একটু করে সঙ্কুচিত হচ্ছে এবং স্নায়ুগুলো অধিক পরিমাণে সঙ্কুচিত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এমন কিছু লোক রয়েছে যারা তাদের শরীরের পশমকে খাড়া করে ফেলতে পারে, চোখের তারাকে বড় বা ছোট করতে পারে, অথবা তারা জমানো পানির উপর রয়েছে মনে করে তাদের শিরাগুলোকে সঙ্কুচিত করতে পারে। এ সব কিছু চিন্তাকে কেন্দ্রীভূত করার মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।"

– উসূলে রাভান সিনাচী

সত্যকে উপলব্ধি করার মাধ্যমে আমাদের মন, ইচ্ছাশক্তি ও প্রবণতাসমূহ সক্রিয় হতে থাকে। লোভ–লালসার আবরণ আমাদের মনকে অন্ধকারে রাখে এবং এদের মধ্যে গোলযোগ সৃষ্টি করে। এভাবে সত্য ও বাস্তবতার আয়নাকে রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য। আত্মার উপর চাপ সৃষ্টিকারী ঘৃণা বিদ্বেষের শিকলকে মুছে ফেলতে হবে যাতে আত্মা এসব রোগ এবং যন্ত্রণা হতে মুক্ত হতে পারে। অতঃপর মানবতার বিধি অনুযায়ী অন্যলোকদের কল্যাণ করার মাধ্যমে তাকে তার আত্মার ক্ষতিপূরণ করতে হবে।

৯

অহমিকা

* জীবনের দিগন্তে ভালবাসার আলো
* অহমিকা মানুষকে ক্ষোভ ও দুঃখ-দুর্দশার দিকে পরিচালিত করে
* বিনয় ও আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা

জীবনের দিগন্তে ভালবাসার আলো

ভালবাসা মানুষের জীবনের দিগন্তকে আলোকিত করে। এটা বিস্ময়কর ও চমৎকার ক্ষমতার অধিকারী। ভালবাসা মানুষের বস্তুগত ও আত্মিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে গভীর ভূমিকা পালন করে থাকে। এ শক্তিকে মানুষের বিবেকের ভিতর প্রোথিত করে দেওয়া হয়েছে এবং এটা বৃদ্ধি পেতে পেতে কোন কোন ব্যক্তির জীবনে সীমাহীন সমুদ্রের মত হয়ে যায়।

আমরা যদি আমাদের জীবনের দিগন্ত হতে ভালবাসার আলো নিভিয়ে ফেলি তাহলে হতাশার অন্ধকার ও নির্জনতার ভীতি আমাদের শক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে এবং পৃথিবীটাকে বিষাদময় মনে হবে।

মানুষকে সমাজের উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সামাজিকতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। মানুষের মধ্যে মানসিক ভারসাম্যহীনতার কারণেই, তার মধ্যে সমাজের প্রতি অনীহা, নির্জনতা ও একাকীত্বের প্রতি অধিকতর আগ্রহী হতে দেখা যায়। এটা সুস্পষ্ট সত্য যে, মানুষ অন্যদের ছাড়া জীবনে সুখী হতে পারে না। কেননা তার দৈহিক চাহিদাসমূহ যেমন তাকে অন্য লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করার দিকে পরিচালিত করে তেমনি তার আত্মা ও তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য কিছু দাবী পেশ করে, যা হচ্ছে সামাজিকতা। আত্মা ভালবাসা চায় এবং মানুষ তার এ আত্মিক চাহিদা পূরণের জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

মানুষ তার জীবনের সূচনালগ্ন থেকে অবিরত স্নেহ, মায়া–মমতা ও ভালবাসার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকে। তার জীবন পথের শেষ দরজায় পৌছার ঠিক শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত এ প্রয়োজনীয় ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে। মানুষ তার বিবেকের মধ্যে ও ভালবাসার সুফল অনুভব করতে থাকে। মানুষ যখন তার জীবনের বোঝা বইতে অক্ষম হয়ে পড়ে, তার দুর্ভাগ্য ও দুর্দশাক্লিষ্ট অন্তর যখন দুঃখে ভরে যায়, আশার ক্ষীণরশ্মিও যখন জীবনকে আলোকিত করে না, ঠিক এই মুহূর্তে মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও সহানুভূতির আকাঙ্খা তীব্রভাবে বেড়ে যায়। এ আকাঙ্খাই তার অন্তরকে স্বস্তি ও উপশমের আশায় আলোকিত করে। ঠিক এমনি

মুহূর্তে একমাত্র ভালবাসার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই তার অন্তরের প্রশান্তি ও আনন্দের নিশ্চয়তা দিতে পারে না। দুঃখ-দুর্দশা ও যন্ত্রণার চিকিৎসা যে ভালবাসার মাধ্যমে হয়ে থাকে এ কথার সত্যতা এখানে প্রমাণিত।

ভাইয়ের প্রতি সহানুভূতি হচ্ছে মানবীয় সহানুভূতির সত্যিকারের বহিঃপ্রকাশ যা সকল মহান নৈতিক গুণাবলী ও প্রশংসনীয় ভাল দিকসমূহের উৎস হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

ভালবাসা স্থানান্তরযোগ্য এবং এটা প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আমাদের সমগোত্রীয় মানুষের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা যে আমাদের দায়িত্ব, এ উপলব্ধি এবং অন্যদের প্রতি আন্তরিকতাপূর্ণ দয়া ও সহানুভূতি প্রদর্শনের দ্বারাই, আমরা মানুষের ভালবাসা লাভ করতে পারি।

প্রতিদান লাভের দিক থেকেও অন্যদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন অধিকতর লাভজনক, কেননা একজন লোক যখন তার এ মহামূল্যবান অনুভূতির কিছু অংশ অন্যদেরকে দান করে তখন সে এর বিনিময়ে তাদের নিকট হতে এ জিনিস আরও অধিক পরিমাণে পাবে। মানুষের অন্তরের চাবিকাঠি মানুষের হাতে, যে এ মহামূল্যবান রত্নরাজির অনুসরণ করতে চায়, তাকে অবশ্যই অন্যদের প্রতি রুষ্ট হওয়ার মনোভাবকে সম্পূর্ণ উপড়ে ফেলে মনকে সততা ও প্রশান্তির আলো দিয়ে ভরে দিতে হবে। দার্শনিকদের মতে, কোন জীবের পূর্ণতা তার পরিণতি ও বৈশিষ্ট্যসমূহের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং মানুষের বৈশিষ্ট্য, ভালবাসা ও সামাজিকতার মধ্যে নিহিত।

মানুষের মধ্যে বিরাজমান পারস্পরিক ভালবাসা ও আত্মিক সম্পর্কই হচ্ছে ঐক্যবদ্ধভাবে স্থায়ী শান্তিতে বসবাসের ভিত্তি।

ডাঃ কার্লের মতে ঃ

"একটা সমাজকে সুখী হতে হলে এর সকল সদস্যকে অবশ্যই একটা দালানের ইটের মত পরস্পর মিলে মিশে বাস করতে হবে। ভালবাসাই হচ্ছে একমাত্র উপাদান, যা সমাজকে এমনি ঐক্যবদ্ধ করতে পারে, যা সমগ্র মানব পরিবারের মধ্যে বিরাজমান। অন্য মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার দুটো অংশ রয়েছে। প্রথম প্রয়োজনীয় দিক হচ্ছে অন্যকে ভালবাসা এবং দ্বিতীয় দিক হচ্ছে অন্যদের নিকট হতে সসম্মানে ভালবাসা লাভ করা। তথাপি প্রতিটি মানুষ

যতক্ষণ পর্যন্ত অন্যদের প্রতি রাগান্বিত হওয়ার বদভ্যাসসমূহ পরিহার করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা না চালায়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে না। যে দুর্নীতি মানুষকে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লবের মাধ্যমে তা হতে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের পক্ষে এ লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। আর এ সময়ই আমরা প্রতিবেশীদের পরস্পরের প্রতি সদয় আচরণ করতে এবং মালিক, কর্মচারী প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি সৌহার্দপূর্ণ ও সম্মানজনক ব্যবহার করতে দেখতে পাবো। ভালবাসাই হচ্ছে একমাত্র উপাদান যা মানব সমাজে ঐ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পারে যা পিপীলিকা ও মৌমাছিদের সমাজে সহস্র বছর ধরে বিরাজমান। অহমিকা মানুষের মধ্যে পরস্পরের প্রতি রুষ্ট হওয়ার মনোভাব জন্মায়।"

অহমিকা মানুষকে ক্ষোভ ও দুঃখ দুর্দশার দিকে পরিচালিত করে

আত্মপ্রীতি একটা মৌলিক মানবিক প্রবণতা, এটা নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কেননা এ প্রবণতা হতে বিশ্বের এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের বিশাল সম্পর্ক গড়ে উঠে। এটা একটা মহামূল্যবান বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী ফলপ্রসূ শক্তি হওয়া সত্ত্বেও, এ অস্বাভাবিক উৎসের মাত্রাধিক্য ঘটলে এটা হতে অনেক অপরাধ ও দুর্নীতির জন্ম হতে থাকবে। আত্মপ্রীতির ক্ষেত্রে যথেচ্ছাচারিতা হচ্ছে উন্নত আচরণের পথে একটা প্রধান ও প্রকৃত বাধা। কেননা এটা এমন এক পর্যায়ে পৌছে যেতে পারে যেখানে পৌছার পর অন্তরের মধ্যে ভালবাসার মত আর কোন জায়গাই অবশিষ্ট থাকে না। এ ধরনের অমিতাচারই মানুষকে তাদের ভুল মেনে নিতে বাধা দেয় অথবা এমন সব সত্যকে মেনে নিতে দেয় না যা তার আবেগপ্রবণ অহমিকার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়।

প্রফেসর রবিনসন বলেন ঃ

আত্মপ্রীতি প্রায়ই এমন হয়ে যায় যে কোন প্রকারের দুশ্চিন্তা বা গোলযোগের সম্মুখীন না হয়েই আমরা আমাদের চিন্তা বা আচরণ পদ্ধতির পরিবর্তন করে থাকি, তথাপি যখনই কেউ আমাদের কোন দোষ বা দুর্বলতার

কথা বলে দেয় তখন তা আমাদের কাছে একটা আত্মিক বিদ্রোহের মত মনে হয় এবং এর বিরুদ্ধে আমরা আমাদের আত্মরক্ষায় নিয়োজিত হয়ে যাই।

আমরা অতি সহজে নতুন আদর্শ বা মতবাদ গ্রহণ করে থাকি কিন্তু যখনই কেউ আমাদেরকে নতুন কোন মতবাদ গ্রহণের কথা বলে তখনই উন্মত্ত লোকের মত আমরা তার বিরুদ্ধে লেগে যাই অথচ প্রকৃতপক্ষে আমাদের নিজস্ব বিশ্বাসের প্রতি আমাদের তেমন কোন নিষ্ঠাপূর্ণ প্রবল অনুভূতিও নেই। আমরা মনে করি আমাদের অনুভূতি মারাত্মকভাবে বিপদাপন্ন, যদি কেউ আমাদেরকে বলে, "তোমার গাড়ীটা পুরাতন বা তোমার ঘড়িটা ঠিকমত সময় দেয় না।"

আমাদেরকে যদি একথা বলা হয়, "মার্চগ্রহ বা মিশরের সভ্যতা সম্পর্কে তোমার জ্ঞান কম" তাহলে আমরা নিজেদেরকে আরও বেশী ক্ষতিগ্রস্ত মনে করি।

সুখের প্রধান বাধা এবং মানুষের নিকৃষ্টতম শত্রু হচ্ছে অহমিকা ও নিজের উপর অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস। অহমিকার বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ তার অন্য যে কোন খারাপ বৈশিষ্ট্যের চেয়ে অনেক মারাত্মক। অহমিকা ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসার সম্পর্ক শেষ করেই ক্ষান্ত হয় না বরং তা বৈরিতায় পরিবর্তিত করে দেয় এবং আত্মাভিমানীদের প্রতি সাধারণ অসন্তোষের দরজা খুলে দেয়। যেভাবে একজন মানুষ অন্য মানুষের ভালবাসা ও সম্মান পেতে চায়, ঠিক তেমনিভাবে তাকেও অন্যদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চেষ্টা করা উচিৎ।

সমাজই প্রত্যেক মানুষের অধিকার ও দায়িত্বের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। প্রতিটি মানুষ সমাজের নিকট হতে অতখানি ভালবাসা ও সম্মান পেয়ে থাকে যতখানি সে তার গুণ ও যোগ্যতানুযায়ী পাওয়ার যোগ্য।

যে তার নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে ভালবাসে না, সে অন্যদের কাজকর্ম ও অনুভূতির প্রতি উদাসীন। তার জেদী প্রচেষ্টা তার নিজস্ব সুনাম ও বড় হওয়ার প্রতি, এবং তার আপন বিচারে উপনীত সিদ্ধান্ত সে অন্যদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেয়।

তার আচরণের প্রতি মানুষের অসন্তোষ এবং মানুষের প্রতি তার প্রত্যাশার মধ্যে মারাত্মক বৈপরিত্বের কারণে, তাদের নিকট হতে তার একতরফাভাবে সম্মানের প্রত্যাশা যথোচিত নয়। এ ধরনের সামাজিক প্রতিক্রিয়া, তার মত একজন অতিশয় আত্মগর্বীর দুঃখ , দুশ্চিন্তা ও অসন্তোষ বাড়াবে।

অহমিকার অপরাপর খারাপ পরিণতিগুলো হচ্ছে সন্দেহ ও হতাশা। অতিশয় আত্মাভিমানীর শক্তিসমূহ হতাশা ও সন্দেহের আগুনে দগ্ধীভূত হতে থাকে। সুতরাং সে মনে করে যে অন্যসব লোকেরা তার ক্ষতি করতে চায়। সেও মানুষের নিকট হতে অব্যাহতভাবে অবহেলা, ক্ষোভ ও অপমান ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। সে তার সমাজ হতে সচেতনভাবে বা অবচেতনভাবে এমন ব্যবহার পেতে থাকে যাতে তার মনে ঘৃণার সৃষ্টি হতে থাকে। সুতরাং, সে সম্ভাব্য যে কোন সুযোগে সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহা পোষণ করে। প্রতিশোধ গ্রহণের সন্ধানে না থাকা পর্যন্ত তার আত্মায় কোন শান্তি থাকে না, এবং অতঃপর তার আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

অপমানজনিত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী নীচতার মনোভাব দ্বারা আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অহমিকার ক্ষতিকর দিকগুলো মানুষের বিবেক পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। অনেক বিপদ এবং অপরাধের জন্মদানকারী এ যন্ত্রণাদায়ক ও ধ্বংসাত্মক বিশৃঙ্খলা এমনি একটি ব্যাপার যা অতিশয় আত্মাভিমানীর জন্য আরও অধিক দুঃখ-দুর্দশা ভোগের কারণ হয়ে যায়।

দুনিয়ার ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা হতে এটা প্রতীয়মান হবে যে আত্মগর্বী লোকেরা সবসময় নবী-রাসূলদের দাওয়াতের বিরোধিতা করেছে এবং এ সত্য দাওয়াতকে তারা কবুল করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং অন্যদের এ দাওয়াত কবুল করার পথেও বাধার সৃষ্টি করেছে। এটাও দেখা যাবে যে, অধিকাংশ পাশবিক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী রক্তক্ষয়ী বিশ্বযুদ্ধসমূহ অতিশয় আত্মগর্বী পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী উদ্ধত নেতাদের দ্বারাই সংগঠিত হয়েছিল।

অধিকাংশ আত্মগর্বী লোক কর্তব্যকর্মে অবহেলা প্রদর্শন করে, কারণ তারা অস্থিতিশীল পরিবেশে প্রতিপালিত হয়ে সমাজের নেতৃত্ব লাভে সক্ষম হয়েছিল বলে নিজেদের জন্য গৌরব ও উচ্চ মর্যাদা লাভের প্রচেষ্টা চালায় এবং নিজেদের কল্পনায় অর্জিত সম্মানকে ঔদ্ধত্য ও অহমিকার সঙ্গে প্রদর্শন করে থাকে। এ ধরনের লোক যেখানেই থাকুক না কেন তা অতি সহজেই সকলের চোখে ধরা পড়ে। প্রকৃত সম্মানিত ও মর্যাদাসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি কখনও অন্যের কাছে তার নিজ অহমিকা বা আত্মম্ভরিতা প্রদর্শন করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না, কেননা এটা সে উপলব্ধি করে যে অহমিকা বা আত্মম্ভরিতা এর কোনটাই

মানুষকে প্রকৃত সম্মান দিতে পারে না। সে এটাও অনুভব করে যে, এসব বৈশিষ্ট্য কোন মানুষকে প্রকৃত চরিত্রবান হওয়ার উপযোগী যোগ্যতা দান করে না।

এ ব্যাপারে জনৈক মনোবিজ্ঞানীর পরামর্শ হচ্ছে ঃ তোমার আশা-আকাঙ্খাকে সীমার মধ্যে রাখ, বড় হওয়ার আশা ও সম্ভাবনাকে কমিয়ে ফেল, লোভ-লালসা হতে নিজেকে মুক্ত কর। আত্মম্ভরিতা ও অহমিকাকে সর্বদা বর্জন কর। নিজের জন্য একটা নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী শান্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে অবাস্তব কল্পনা পরিহার কর।"

বিনয়ের ব্যাপারে আমাদের নেতাদের ভূমিকা

সকল উৎকৃষ্ট গুণাবলীর মধ্যে যাকে ভালবাসার নিদর্শন ও অন্যান্য গুণাবলী অর্জনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে, তা হচ্ছে বিনয়। সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্যপালন ও উন্নত আচার-আচরণের অনুশীলনের মাধ্যমে বিনয়ীলোকেরা তাদের সামাজিক মর্যাদাকে উন্নত করে এবং তাদের ভালবাসাকে অন্য লোকদের অন্তরে প্রসারিত করে। ত ৎসত্ত্বেও আমাদেরকে বিনয় ও আত্মাবমাননার মধ্যকার বিরাট পার্থক্য অবশ্যই চিনতে হবে। বিনয় হচ্ছে শ্রেষ্ঠ ও আত্মপ্রত্যয়ী চরিত্রের মত উন্নত বৈশিষ্ট্যেরই একটা বহিঃপ্রকাশ-অথচ আত্মাবমাননা নীতিহীনতা ও আত্মবিশ্বাসের অভাবের কারণে দেখা দেয়।

আল কোরআনের দৃষ্টিতে হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর ছেলেকে অহমিকার বিরুদ্ধে বলেছেনঃ

"ঘৃণা ও অবজ্ঞাভরে মানুষের কাছ থেকে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিও না, গর্ব ও অহঙ্কারের সাথে দুনিয়াতে চলো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় আত্মাভিমানী লোকদেরকে পছন্দ করেন না।"

– আল কোরআন

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন–

আল্লাহ যদি তার কোন আবেদকে অহমিকা করার অনুমতি দিতেন তবে তিনি তার সে অনুমতি দিতেন তাঁর নিকটতম নবী ও আওলিয়াদের। কিন্তু মহিমান্বিত আল্লাহ অহমিকাকে তাদের জন্য ক্ষতিকর বলে অভিহিত করেছেন এবং বিনয়কে তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য করেছেন। সুতরাং তাঁরা তাঁদের গালকে

মাটিতে ঘসতেন এবং মুখমন্ডলকে ধূলি লুণ্ঠিত করতেন। (সিজদার মধ্যে) এবং তারা ঈমানদারদের প্রতি ছিলেন বিনয়ী।

আল্লাহর নবী (দঃ) বলতেনঃ

"অহমিকা পরিহার কর, কেননা একজন আল্লাহর আবেদ অহমিকার উপর জেদ করতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন, তার নাম ঔদ্ধত্যকারীদের তালিকাভুক্ত কর।

– *নাহাজ আল ফাছাহা, পৃঃ ১২।*

ইমাম সাদেক (আঃ) নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যে অহমিকার আত্মিক উৎসের কথা তুলে ধরেছেনঃ

হীনতা ও নীচতা অবলম্বনের পরিণতি ব্যতীত একটা লোকও বিপথগামী হয় না।

– *আল কাফী তৃতীয় খন্ড, পৃঃ ৪৬১।*

ডাঃ এম ব্রিডের মতেঃ

অন্যের উপর এক ব্যক্তি বা জাতির ঔদ্ধত্য, সেই ব্যক্তি বা জাতির অপমানের সমান। অন্যকে খাটো করা বা হেয় প্রতিপন্ন করার মনোভাব থেকেই এখনকার অধিকাংশ মতানৈক্য ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়। তাই অহমিকার ধারণাকে গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে অহমিকাকারীর জীবনে অনুভূত খালিস্থানকে পূর্ণ করার প্রচেষ্টা চালানো বৈ আর কিছু নয়। স্বচ্ছ বিবেকসম্পন্ন এমন একটা ব্যক্তি, মানব শ্রেণী, মানব গোষ্ঠী ও জাতি পাওয়া যাবে না যারা তাদের ও অন্যদের মধ্যকার পার্থক্যকে অনুভব করতে পারে।"

– *উকদায়ে হিকারাত*

অহমিকা ও উদ্ধত আচরণকারী ব্যক্তিরা সবসময় তাদের কথা ও কাজকে উন্নত ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। অধিকন্তু তারা তাদের দুর্বলতাকে ভাল কাজ বলে মনে করে। ইমাম মূসা ইবনে জাফর (সাঃ) যে ব্যখ্যা দিয়েছেন তা হচ্ছেঃ

"অহমিকার অনেকগুলি পর্যায়ের মধ্যে একটা অবস্থা হচ্ছে এই যে একটা লোকের মন্দকাজগুলো তার কাছে সুশোভিত হয়ে দেখা দেয়, যে জন্য তার কাছে ভাল লাগে এবং সে ভাল কাজ করছে বলেই সে বিশ্বাস করে।"

– *ওসাইল আশ শিয়া ১ম খন্ড ৭৪ পৃঃ।*

জনৈক মনোবিজ্ঞানীর মতেঃ

''অহমিকাকারী ব্যক্তিরা তাদের দুর্বলতাসমূহকে সদগুণ এবং

ত্রুটিসমূহকে প্রশংসনীয় গুণ মনে করে উদাহরণস্বরূপ, অন্যদের সহিত হঠাৎ রাগান্বিত হওয়ার ব্যাপারকে তারা তাদের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক তাদের দুর্বলতাসমূহকে তারা তাদের উৎকৃষ্ট সহজ প্রতিক্রিয়াশীল আত্মিক অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ, তাদের অতিরিক্ত ওজনকে স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলে মনে করে। বস্তুতঃপক্ষে, সুস্থ দেহের মধ্যে সুস্থ যুক্তি নিহিত থাকে এবং দুর্বলের উপর নির্ভরশীলতার অর্থ একটা অবাস্তব কল্পনা মাত্র, কেননা তারা সহজে উত্তেজিত হয় এবং তাদের সম্পর্কে পূর্ব হতে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না।''

এখন আমরা ইমামদের (আঃ) এ সম্পর্কিত কিছু বিবৃতির পর্যালোচনা করে দেখতে চাইঃ

"অহমিকা পরিহার কর নতুবা ইহা তোমার শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি করবে।"

– গুরার আল হিকাম।

" অহমিকা মনকে ধ্বংস করে ফেলে "

– গুরার আল হিকাম।

মনোবিজ্ঞানীদের মতে অতিশয় আত্মাভিমানী লোকেরা মানসিক দুর্বলতা ভোগ করে।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ

" যার মন দুর্বল হয়ে পড়ে, তার অহঙ্কার বেড়ে যায়। "

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ১০২।

তিনি আরও বলেছেনঃ

" অহমিকা হচ্ছে অনেকগুলো রোগের সমষ্টি।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৬৭৮

" যে তার অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকে, তার যোগ্যতা দিন দিন হ্রাস পেতে থাকে।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৬৭৮।

ডাঃ এইচ শাখতার বলেনঃ

আমাদের অকৃতকার্যতা বা হতাশার সময় আমাদের প্রতি অন্যদের মনোযোগ আর্কষণ করার একটা পদ্ধতি হচ্ছে নিজের প্রশংসা করা ও নিজেকে বড় করে তুলে ধরা, নিজের আকাঙ্খিত বস্তু সম্পর্কে এমন কিছু মনে মনে কল্পনা করা যে এটা তো আমরা পূর্বে পেয়েছি অথবা আমাদের অতীত সফলতা সম্পর্কে লোকদের কাছে বড়াই করা বা বেশী বেশী করে বলে বেড়ানো।"

আত্মগর্বী লোকেরা নিজকে তাদের নিজেদের উদ্ভাবিত সুশোভিত মিথ্যার মধ্যে প্রলুব্ধ করে রাখে, এভাবে তারা তাদেরকে নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন

করার সুযোগ হতে বঞ্চিত করে।

– রুশদি শাখাচিয়্যাত

এসব লোকেরা উপলব্ধি করতে অক্ষম যে তাদের নিজেদের মধ্যে দোষত্রুটি রয়েছে এবং অন্যরা তাদের চাইতে অনেক বেশী যোগ্যতা ও পূর্ণতার অধিকারী।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি নিজের প্রতি সন্তুষ্ট আছে, তার দোষত্রুটি কখনও তার চোখে ধরা পড়বে না, অন্যেরা যে তার চাইতে অনেক বেশী যোগ্যতার অধিকারী এ উপলব্ধিটাই তার অকৃতকার্যতা ও দোষের জন্য যথেষ্ট হতো।"

– *গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৯৫।*

ইসলাম একটা উন্নত মানব সভ্যতা গড়ে তুলতে চায়, যা মানুষকে সম্মানিত জীবন যাপন করতে শিখায়,তা সর্বপ্রকার অস্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যকে বাতিল করে দিয়েছে। ইসলাম পবিত্রতা ও ধর্মভীরুতাকে তার বৈশিষ্ট্য হিসাবে গ্রহণ করেছে।

ইমাম আলী (ঃ) বলেছেনঃ

" অর্থোপার্জনের উন্মাদনা হতে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও, কেননা অবশ্যই এর মধ্যে দূরবর্তী পবিত্রতা রয়েছে।"

– *গুরার আল হিকাম, পৃঃ ১৩৮।*

একদিন এক ধনী লোক রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। ধনী লোকটার সেখানে থাকা অবস্থায় একজন দরিদ্র লোক ঘরে ঢুকে তাঁর কাছে বসলো। এতে ধনী লোকটা তার কাপড়-চোপড় গুটিয়ে গরীব লোকটার নিকট থেকে সরে গেল, রাসূলুল্লাহ (দঃ) এটা দেখে বললেনঃ

কি হয়েছে! তুমি কি ভয় পাচ্ছো যে তার দারিদ্র তোমার মধ্যে ছড়াবে?"

উপসংহারে, আত্মগর্বী লোকেরা যদি সুখী হতে চায় তাদেরকে এ রোগ হতে মুক্ত হতে হবে। তাদেরকে এমন সব বৈশিষ্ট্য হতে মুক্ত হতে হবে যা তাদের আসল চরিত্র অপবিত্র করে, নতুবা তারা অবশ্যম্ভাবী হতাশা ও বঞ্চনার শিকারে পরিণত হবে। সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই এসব পরিহার করতে হবে।

১০

জুলুম-নির্যাতন

* সমাজে ন্যায়পরায়ণতার ভূমিকা
* অত্যাচারের ধ্বংসাত্মক অগ্নিশিখা
* অত্যাচার ও অত্যাচারীদের মূলোৎপাটনে ধর্মের ভূমিকা

সমাজে ন্যায়পরায়ণতার ভূমিকা

বিপ্লবের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিভিন্ন দেশে সংঘটিত বিপ্লবের ভিত্তিসমূহের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বিচার-বিবেচনার যোগ্য। বহুবার এ শব্দটা এমনসব লোকদের অন্তরে সাড়া জাগিয়েছে যাদের জীবনে ছিল বঞ্চনার পর বঞ্চনা, যাদের সম্মান ও অধিকারের উপর চলছিল অন্যায় হস্তক্ষেপ। নির্যাতিত মানুষ অত্যাচারের সর্বপ্রকার উপায়-উপাদানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, তারা অত্যাচারী পশু প্রবৃত্তি সমূহকে উৎপাটিত করে মুক্তি ও ইনসাফের মহামূল্যবান রত্ন লাভের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, মজলুমরা নির্যাতনকে নির্মূল করার লক্ষ্যে তাদের জীবনকে উৎসর্গ করার জন্য ছিল সংকল্পবদ্ধ।

অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ভাবে দেখা যায় যে, অধিকাংশ অভ্যুত্থান ও বিপ্লব তাদের পবিত্র লক্ষ্য অর্জনে সফলকাম হয়নি, বা বিপ্লবীরাও তাদের জীবন হতে দুঃখকষ্ট মুছে ফেলার লক্ষ্য অর্জনে সফল হয়নি। একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের অতি সামান্য চিন্তা করলেই তাদের ব্যর্থতার পেছনে যে রহস্য রয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে যায়। এটা বলা যায় যে, একটা সমাজ যখন উন্নয়নের স্বাভাবিক গতিপথ হারিয়ে ফেলে, ব্যর্থতা ও অনগ্রসতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন তারা ন্যায়পরায়ণ ব্যবস্থা মেনে চলার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং ইনসাফপূর্ণ ব্যবস্থাকে সহ্য করতে পারে না। যথোপযুক্ত পরিবেশের মধ্যেই একটা ন্যায় বিচারমূলক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সম্ভব, যা না হলে জীবনের দিগন্তে ন্যায়নীতি আসার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

যে কোন সমাজ কাঠামোর জন্য ন্যায়নীতির বিধিবিধান হচ্ছে একটি মৌলিক প্রয়োজন। ইনসাফভিত্তিক আইন, সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর মধ্যে, পারস্পরিক আচার-আচরণের ক্ষেত্রে বহুবিধ নিয়মাবলী কার্যকরভাবে মেনে চলার মাধ্যমে, সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সকলের অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করে।

ন্যায়নীতি হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র প্রতিপালিত একটা স্বাভাবিক আইন। সর্বশক্তিমান আল্লাহ বিশ্বের জন্য ইনসাফভিত্তিক একটা রূপরেখা

নির্ধারিত করে দিয়েছেন যাতে সম্ভাব্য কোন উপায়ে এটা লংঘিত না হয়। আমাদের দেহের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে বিরাজমান সামঞ্জস্য, বিশ্বের মধ্যে নির্ভুল ন্যায়পরায়ণ আইন প্রচলিত থাকার বিস্ময়কর নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম। আমরা আমাদের নিজেদের প্রতি লক্ষ্য করলেই বিশ্বের অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে একই ধরনের বিধান কার্যকর রয়েছে তা উপলব্ধি করার উদ্যোগ নিতে পারি।

যে ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা বিশ্বকে শাসন করছে তা বাধ্যতামূলক, এ অর্থে যে এটা সহজ প্রকৃতিজাত। যেহেতু মানুষকে চিন্তা ও ইচ্ছা করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, তাই সমাজে ইনসাফের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা তার কর্তব্য। এটা সত্য যে কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যকার যুক্তিগত ক্ষমতার ব্যাপারে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশনা প্রয়োজন। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে এটার প্রয়োজন নেই, কেননা মানুষ অনেক সত্য সম্পর্কে নিজেই স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তি কোন একটা বিষয়ের নির্ভুলতা বা যথার্থতা সম্পর্কে রায় দিতে পারে।

ইনসাফ মানুষের জীবনে সূক্ষ্মভাবে অনুভূতিযোগ্য অবস্থান দখল করে আছে, কেননা এটা হচ্ছে তার সমস্ত মহৎ গুণাবলীর উৎস। অন্যকথায় বলতে গেলে ন্যায়পরায়ণতা উৎকৃষ্ট আচরণের জন্য একটা প্রেরণাদায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করে। এটা এমন একটা উপাদান যা সমাজের লোকদের মধ্যে পারস্পরিক শান্তি ও সামঞ্জস্যবিধান করে। বস্তুতপক্ষে, সমাজকে সততার পথে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ইনসাফ হচ্ছে একটা অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক প্লেটো বলেছেন ঃ

"মানুষের আত্মার মধ্যে যখন ইনসাফ প্রবিষ্ট হয় তখন তার উজ্জ্বল আভা তার সমস্ত আত্মিক শক্তিসমূহকে আলোকিত করে। কেননা মানুষের সমস্ত নৈতিকতা ও মহৎ বৈশিষ্ট ন্যায়নীতির ফোয়ারা হতে উৎসারিত হয়। এটা মানুষকে তার ব্যক্তিগত কাজকর্মকে সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার যোগ্যতা প্রদান করে যা হচ্ছে মানুষের চূড়ান্ত শান্তি ও বিশ্বজাহানের সৃষ্টিকর্তা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের নৈকট্যের শীর্ষস্থান হিসাবে পরিগণিত।"

এটা বলা সবচেয়ে বেশী নিরাপদ যে ন্যায়নীতি হচ্ছে সংগঠিত সামাজিক জীবনের একটা মৌলিক উপাদান। ন্যায়নীতির সঙ্গে জীবনের একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। সমাজ এর মধ্যে নতুন শক্তি পায়। এটা

মানুষের জীবনকে সৌন্দর্য ও মহিমান্বিত করে। ন্যায়পরায়ণতার সৌন্দর্য উপভোগকারী সমাজ এমন একটা সমাজ যেখানে জীবনের চাহিদাসমূহ পূর্ণ হয়, এবং সমস্ত সমস্যার সমাধান সেখানে হয়ে যায়।

জুলুম–নির্যাতনের ধ্বংসাত্মক অগ্নিশিখা ঃ

সমাজের ধ্বংস, মানুষের আচার–আচরণের ক্ষতি সাধন ও সমাজের নিরাপত্তা লংঘনের ব্যাপারে জুলুম অত্যাচারের ভূমিকা সম্পর্কে দ্বিমতের কোন অবকাশ নেই। ধর্ম মানেনা এমনসব ব্যক্তি এ সত্য অস্বীকার করতে পারে না। কোন সমাজে জুলুম–অত্যাচার চলতে থাকলে মানুষের মধ্যে তা পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে এবং সমাজের লোকদের পারস্পরিক সম্পর্ক ধ্বংস করে।

শক্তিশালী সরকারসমূহের কুশাসন ও ক্ষমতার ঔদ্ধত্য কিভাবে সভ্যতা ধ্বংস করেছে তা দিয়ে ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ হয়ে আছে। জালিমদের জীবনীতে অনেক শিক্ষণীয় নৈতিক শিক্ষা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, আব্বাসীয় শাসকদের মধ্যে খলিফা মোহাম্মদ ইব্‌নে আবদুল মালিক এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। এ মন্ত্রীর একটা লোহার চুল্লী ছিল, যার আভ্যন্তরীণ ভাগ ধারাল পাত দিয়ে ঢাকা ছিল। যখনই তার কাছে কোন রাজনৈতিক বন্দীকে আনা হতো, তখনই সে ঐ নীরিহ ব্যক্তিটিকে উক্ত চুল্লীর ভিতর রেখে আগুন জ্বালিয়ে দিত। তার দেহ হতে প্রাণবায়ু নির্গত হওয়া পর্যন্ত আগুন জ্বলতে থাকতো। আল মুতাওয়াক্কিল খলিফা হওয়ার পর পর ইব্‌নে মালিককে বন্দী করে তার নিজের তৈরী জেলখানায় রেখে দেওয়া হল, যখন ইব্‌নে মোহাম্মদের মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এলো, তখন সে একটা কবিতা লিখে রেখে দিল যার অর্থ ছিল এই যে এ পৃথিবীতে যে অন্যের উপর কোন অত্যাচার করবে তাকে অবশ্যই সেজন্য শাস্তি ভোগ করতে হবে। আল মুতাওয়াক্কিল এই কবিতা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মদ ইব্‌নে মালিকের মুক্তির নির্দেশ দিল। কিন্তু এ রাজকীয় ফরমান পৌছার পূর্বেই ইব্‌নে মোহাম্মদকে অত্যন্ত ভয়াবহ অবস্থায় তার নিজস্ব তৈরী চুল্লীতে মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল।

– মুরুজ আদ্দাহাব, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮৮।

বস্তুতঃপক্ষে, যারা দুনিয়ার এ জীবনকে শুধুমাত্র বেঁচে থাকার জন্য এক দৈনন্দিন সংগ্রাম বলে মনে করে নিয়েছে, তারা নিজেদের ক্ষমতাকে সুসংহত ও নিজেদের অবস্থানকে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে অবিরত দুর্বলদের উপর, বিভিন্ন ভয়ভীতি ও বঞ্চনার চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। তারা তাদের পশু প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য কোন রকম নিকৃষ্ট অপরাধ করা হতে নিবৃত্ত থাকবে না, তা যত অমানবিকই হউক না কেন। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকে ততই ক্রোধের বহ্নিশিখা মজলুমদের ক্রোধোন্মত্ত করে জালিমের জীবনের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

অত্যাচার বা জুলুম কোন বিশেষ শ্রেণী বা পদবীর লোকদের মধ্যে সীমিত নয়। যে কোন স্তরের লোক যখন তার নিজের ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে অন্যকে কাজে লাগায়, অথবা যুক্তির আইন বা বিধিগত সীমা লংঘন করার চেষ্টা করে তখন তাকে জালিমের পর্যায় ভুক্ত করা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, বর্তমান সময়ে জুলুম চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গেছেঃ অত্যাচারের অগ্নিশিখা ও অবিচার, সমাজের বিভিন্ন স্তরের লোকদের মধ্যে উন্মত্ত আকারে প্রসার লাভ করেছে যা মানবসভ্যতার ভিত্তিমূলকে নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জালিম ও জুলুম মুকাবিলা করার ক্ষেত্রে ধর্মের ভূমিকা

পবিত্র কালামে পাক জালিমদের প্রতি অবশ্যম্ভাবী কঠোর শাস্তির ঘোষণা দিয়ে সর্বশক্তিমান আল্লাহ এরশাদ করলেনঃ

"এবং এসব জনপদ-উহার অধিবাসীদের আমি ধ্বংস করেছিলাম, যখন ওরা জুলুম করেছিল এবং ওদের ধ্বংসের জন্য আমি নির্ধারিত করেছি এক নির্দিষ্ট সময়।" ঃ ১৮-৫৯।

সকল ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ মানব সমাজের নিরবচ্ছিন্ন ধারায় বিশ্বাসী ছিলেন তাই তাঁরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকে তাঁদের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নিয়েছিলেন। যখনই তাঁরা সমাজের মধ্যে কোন প্রকারের বিশৃংখলা লক্ষ্য

করতেন, তখনই তাঁরা জালিমদের অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, এসব বিশৃংখলাজনিত অবস্থা পরিবর্তনের চেষ্টা করেছেন। অনেক ক্ষেত্রে এসব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ জালিমদেরকে পরাভূত ও নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আল কোরআনের দৃষ্টিতে জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে আলেমদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

"নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূল (দঃ) গণকে সুস্পষ্ট যুক্তি ও দলিল প্রমাণ সহকারে প্রেরণ করেছি এবং তাদের সঙ্গে দিয়েছি কিতাব ও মানদণ্ড যাতে মানুষ ন্যায়পরায়ণতার অনুসারী হয়।" *৫ ঃ ২৫*

যেহেতু ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে সমষ্টিগত জীবনে ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠা, তাই ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের অনুসারীদেরকে মানুষের পদবীগত বৈশিষ্ট্য ও তাদের ব্যক্তিগত মর্যাদা নির্বিশেষে নিজেদের ও অন্যান্যদের মধ্যে পারস্পরিক আচার–আচরণের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ করার নির্দেশ দিয়েছে। তাঁরা যে কোন শ্রেণীর মানুষকে তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করা বা তাদের প্রতি জুলুম করা হতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন।

"হে মুমীনগণ ! আল্লাহর উদ্দেশ্যে সত্য সাক্ষ্যদানে তোমরা অবিচল থাকবে; কোন সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ভাব তোমাদেরকে যেন কখনও ন্যায়পরায়ণতা বিসর্জনে প্ররোচিত না করে, ন্যায় বিচার করবে এটা খোদাভীরুতার নিকটতর।"

– আল কোরআন ৫ ঃ ৮

"এবং তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে করবে।"

–আল কোরআন, ৪ ঃ ৫৮।

ইসলাম ন্যায় বিচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে, এজন্য অন্যায় আচরণকারী ব্যক্তিদেরকে বিচারক পদে নিয়োগের অযোগ্য ঘোষণা করেছে। ইসলাম মানুষের জন্য তাদের সন্তানদের মধ্যকার ব্যাপারে ন্যায়ানুগ আচরণ করাকে পিতামাতার জন্য কর্তব্য হিসাবে নির্ধারিত করে দিয়েছে যেন সন্তান–সন্ততিরা এটাকে একটা বিশেষ গুণ হিসাবে গ্রহণ করে এবং জুলুম ও শত্রুতা পরিহার করে। অধিকন্তু, সকল পরিস্থিতিতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আচরণ করতে গিয়ে সঠিক আচরণ

করাকে ছেলেমেয়ে প্রতিপালনের ব্যাপারে একটা অন্যতম মৌলিক নীতি হিসাবে গৃহীত হওয়া উচিৎ, কেননা সন্তান-সন্ততিরা যদি পিতা-মাতার সম্পর্ক বা আচরণের মধ্যে অন্যায় দেখতে থাকে, অন্যদের সাথে আচরণের ব্যাপারেও তাদের কাছ থেকে ন্যায় ও যথাযথ আচরণ আশা করা যায় না। ছেলেমেয়েরা যদি খারাপ আচার-আচরণের মধ্যে প্রতিপালিত হয় তখন এটা তাদের স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, এভাবে তারা সমাজের জন্য একটা ধ্বংসাত্মক শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। অর্জিত অসদাচরণ শেষ পর্যন্ত সমাজকে প্রভাবিত করবে এবং তাদের পিতা-মাতাকে বিচলিত করবে।

আল্লাহর রাসূল (দঃ) এ গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতি তাঁর অনুসারীদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে গিয়ে বলেছেনঃ

"উপঢৌকন দেওয়ার ব্যাপারে আপনার সন্তান-সন্ততিদের প্রতি যথাযথ আচরণ করুন, যদি আপনি তাদের কাছ থেকে সঠিক ও যথাযথ ব্যবহার প্রত্যাশা করেন।"

– *নাহায আল ফাসাহা, ৬৬ পৃঃ।*

প্রফেসার বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন ঃ

মানুষের আত্মা একটা স্রোতধারার মত যা অবিরত প্রসারিত হচ্ছে। ছেলেমেয়েদেরকে যথাযথ প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে বাহ্যিক চাপ যেন নির্যাতন বা শাস্তির আকারে না হয়ে চিন্তা, অভ্যাস ও কল্যাণ কামনার মাধ্যমে দেখা দেয়। যে ধারণা এখানে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে ছেলেমেয়েদের মন ও অভ্যাসের মধ্যে ক্রমান্বয়ে বিষয়টা কার্যকর করতে হবে। অন্যদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে সন্তান-সন্ততিদেরকে ন্যায় বিচারের নির্ভুল পন্থা শিখানো সম্ভব। ছেলেমেয়েদের মধ্যে পুতুল নিয়ে যে প্রতিযোগিতা হয় যা একই সময় একজনের দ্বারাই ব্যবহৃত হতে পারে (বাইসাইকেল) তা ছেলেমেয়েদেরকে ন্যায় বিচার শিখানোর ব্যাপারে আমাদের জন্যে আশার সঞ্চারকারী পন্থা বলে গণ্য হতে পারে। অপেক্ষাকৃত বড় ছেলেটি যখন তার পুতুলটি অন্য ছেলেমেয়েদেরকে দিয়ে ইনসাফের দৃষ্টান্ত পেশ করে এবং এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা কিভাবে তাদের স্বার্থপরতা পরিহার করতে পারে তা বিস্ময়কর। প্রথমদিকে আমি বিশ্বাস করতে পারিনি যে ন্যায়পরায়ণতা মানুষের একটা স্বাভাবিক বা স্বকীয় প্রেরণাসঞ্জাত প্রবণতা। এটা দেখতে পেয়ে আমি বিস্মিত হলাম যে, ন্যায়পরায়ণতার জ্ঞান ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহজেই সৃষ্টি করা যায়। ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষা দেওয়ার সময় তাদেরকে অবশ্যই সত্যবাদী

সুবিচারের কার্যকরী শিক্ষা দেওয়া অত্যাবশ্যক। অন্য কথায় বলতে গেলে এক ছেলেকে অন্য ছেলের উপর কিছুতেই প্রাধান্য দেওয়া উচিৎ নয়। আপনি যদি একজনকে অন্যজনের চাইতে বেশী ভালবাসেন, তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেন আপনার এ অধিক পছন্দ, তাদের উভয়ের সুখ-শান্তি বিতরণের ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাব না ফেলে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে খেলনা বিতরণ করতে গিয়ে সবাইকে একই মানের খেলনা দেওয়া একটা সাধারণভাবে স্বীকৃত অভ্যাস হতে হবে।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে ন্যায়পরায়ণতার অভাবকে যে কোনভাবে অগ্রাহ্য করা একটা মস্তবড় ভুল।"

আল্লহর রাসূল (দঃ) বলেছেন ঃ

"আল্লাহকে ভয় কর, সন্তান-সন্তোতিদের প্রতি সুবিচারকারী হও যেমন তোমার প্রতি তাদেরকে তুমি সদয় দেখতে চাও।" – নাহাজ আল ফাসাহা।

ইমাম আলী (আঃ) মোহাম্মদ ইবনে আবু বকরকে মিশরের গভর্নর পদে নিয়োগ করার পর নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়েছিলেনঃ

"ঐশী দূতরা সমাজে সত্যিকারের ন্যায়পরায়ণতার প্রতিষ্ঠাকারী। তাঁরা হলেন এমন সব ব্যক্তি যাঁরা মানব জাতির পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে গতিপথের পরিকল্পনা প্রদানকারী।"

ইমাম হোসেন (আঃ) অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে সত্যিকারের ন্যায়পরায়ণতা ও মানুষের ঈমানের প্রকৃত অর্থকে তুলে ধরেছেন। তাঁর জীবনের ঘটনাবলী গ্রন্থ ও ইতিহাসের পৃষ্ঠাকে আলোকিত করে রেখেছে এবং এটা চিরদিনের জন্য এভাবে চলতে থাকবে।

১১

শত্রুতা ও ঘৃণা

* আমরা ক্ষমা করবো না কেন?
* শত্রুতার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকর দিক
* অসদাচরণকারীদের সঙ্গে ইমাম সাজ্জাদ (আঃ)-এর ব্যবহার

আমরা ক্ষমা করবো না কেন?

নিঃসন্দেহে, মানুষ সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে পারে না। সে পরনির্ভরশীল এক সৃষ্টি, যার প্রয়োজন অসীম। মানুষ যে সামাজিকভাবে পরনির্ভরশীল এ সত্যটা তার স্বভাব ও প্রয়োজনসমূহের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা তাকে সহযোগিতার ছায়াতলে বসবাস করার উপযোগী করে। সমাজ জীবনে এমন বহু প্রয়োজন রয়েছে যা মানুষকে কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম ও কর্তব্য পালনে বাধ্য করে যা সঠিকভাবে সম্পন্ন করার উপর মানব জীবনের সফলতা নির্ভরশীল।

মানুষের চরিত্র উন্নয়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাবশালী উপাদান হচ্ছে সামাজিক জীবন। ইহা বস্তুগত সত্তার মধ্যে সীমিত থাকতে পারে না, বরং ইহা মানুষের আত্মা ও মানবিক সুসম্পর্কের মিলনের ফল হওয়া উচিত।

ব্যক্তিদের সামষ্টিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে যদি কোন সমাজে বাহ্যিক ও আত্মিক ঐক্য থাকে তাহলে ঐ সমাজে মানুষ তার জীবনের সৌন্দর্য ও শান্তি কিছুতেই হারাতে পারেনা। অন্যদের ভুলত্রুটি ক্ষমা করতে পারা অন্যদের সাথে সম্পকের ক্ষেত্রে আমাদের একটি মৌলিক কর্তব্য। সর্বদা অন্যান্য মানুষের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করার প্রয়োজনেই এ কর্তব্য আমাদের উপর আরোপিত হয়েছে। সুখী জীবন যাপনের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে অন্যদের সাথে শান্তিতে বসবাস করা।

এ দুনিয়ায় কেউ ত্রুটিমুক্ত নয়, এ সত্যটি কারুরই উপেক্ষা করা উচিৎ নয়। পুরোপুরি স্থিতিশীল ও স্বাভাবিক স্বভাব ও আচরণের লোক খুব কমই দেখা যায়। আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে খুব মহৎ চরিত্রের লোকেরাও পুরোপুরি দোষত্রুটি মুক্ত নন। অতএব, অন্যদের অপ্রত্যাশিত ভুলত্রুটি আমাদেরকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্থায়ী ও সুদূর প্রসারি শান্তি পেতে হলে অবশ্যই অকপটে সেই দোষত্রুটি মেনে নিতে হবে। জনৈক প্রাচীন কবি বলেছেন, প্রত্যেকের জন্য তার সময়কার পাওনা হলো যা কিছুতে সে নিজেকে অভ্যস্ত করে ফেলেছে। তথাপি মানুষ যা কিছুতে তার নিজেকে অভ্যস্ত করে তা তার নিজের মনোভাব ও আচার-আচরণগত অবস্থা হতে জন্ম লাভ করে। সুদৃঢ়

ইচ্ছাশক্তি ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে ক্ষমা পরায়ণতা। এটা শক্তি ও সাহসিকতার লক্ষণ। ক্ষমাশীল ব্যক্তিরা মহামূল্যবান মানসিক প্রশান্তির অধিকারী। তাঁরা সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও চিন্তার পরিপক্কতার অধিকারী হয়, যা দয়াশীলতার উৎসে পরিণত হয়ে মানুষের শৃংঙ্খলিত আধ্যাত্মিক শক্তিকে মুক্ত করে একটা সিদ্ধান্তকারী শক্তিতে পরিণত করে। অন্যের দোষত্রুটিকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা মানুষের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর। মানুষের বাহ্যিক অপমানকে মেনে নেওয়া কঠিন; তথাপি এ ক্ষেত্রে সে যতবেশী চিন্তাশক্তির অধিকারী হবে, তত কম মানসিক অস্থিরতা ভোগ করবে। বস্তুতঃপক্ষে, শেষ পর্যন্ত সে বিশ্বের জন্য কল্যাণকামী হয়ে যাবে।

এ বিষয়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে ক্ষমাশীলতা, নিঃসন্দেহে, শত্রুর অনুভূতিকে প্রভাবিত করে তার চিন্তা ও আচরণকে দ্রুত পরিবর্তিত করে দেয়। এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যেখানে ক্ষমাশীলতার ছত্রছায়ায় চরম উত্তেজনাকর সম্পর্কেরও উন্নতি সাধিত হয়েছে। অনেক ঘৃণা ও সুদূরপ্রসারী শত্রুতার সম্পর্কও মধুর শান্তিপূর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্কে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এমন অনেক ঘটনাও রয়েছে, যেখানে একজন শত্রু একজন ক্ষমাশীল চিন্তার অধিকারী দয়ালু ব্যক্তির কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দিয়েছে।

বিজ্ঞ ব্যক্তিদের মতে ঃ

অন্যের ভুলভ্রান্তিকে উপেক্ষা করা ও ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা মানুষের একটা বিশেষ গুণ যা জন্তুদের নেই। যখন তুমি অন্যের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হও তখন তাকে ক্ষমা করে দাও, ক্ষমার আনন্দানুভূতি উপভোগ করার একটা সুযোগ গ্রহণ করো। আমাদের শত্রুদেরকে ক্ষমা করে দিতে বলা হয়েছে আমাদেরকে। কিন্তু আমাদেরকে পিতামাতা ও বন্ধু বান্ধবদের দোষত্রুটি ক্ষমা করতে বলা হয়নি, কেননা এটা স্বভাবতঃই আশা করা যায় যে প্রত্যেকে প্রত্যেকের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করে দেবে। তার বিরুদ্ধে তুমি প্রতিশোধ প্রয়াসী হতে গিয়ে তুমি তোমাকে তার অবস্থানে নিয়ে যাচ্ছ, কেননা সে তোমার প্রতি যে আচারণ করেছে তুমিও তার প্রতি একই আচরণ করছো। তুমি তাকে ক্ষমা করে দিয়ে তোমাকে মহত্ত্বের অবস্থানে উন্নীত করতে পারতে। যখন আমরা প্রতিশোধ গ্রহণে সচেষ্ট হই তখন এটা সম্ভবপর যে ঐ ব্যক্তি আমাদের চাইতেও অধিক শক্তিশালী কিন্তু যখন আমরা আমাদের শত্রুদের ক্ষমা করে দেব তখন আমরা নির্দিষ্টভাবে বিজয়ী। যুদ্ধ ছাড়াই আমরা আমাদের শত্রুকে পরাজিত করতে পারি এবং তাদেরকে

আমাদের প্রতি বিনয়ী হতে বাধ্য করতে পারি। প্রতিপক্ষকে ছেড়ে দেওয়া ও তাদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সংগ্রামের পথ পরিহার করা হচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদের গ্রহণযোগ্য সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, কেননা তার পরাজয় অত্যাসন্ন।

যেখানে অন্যরা সীমা লংঘন করে, সেখানে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে অন্যদের প্রতি সদয় হওয়া কেননা কল্যাণ কামনা হচ্ছে এমন এক ঐশী নীতি যা দিয়ে পৃথিবী ও পৃথিবীর বাসিন্দারা সুখে শান্তিতে পরস্পর মিলেমিশে বসবাস করতে পারে।

শত্রুতার কারণে সৃষ্ট ক্ষতিকর দিকসমূহ

শত্রুতা ও অন্যদের প্রতি ঘৃণার মনোভাব পোষণের ফলে সৃষ্ট বিপজ্জনক মনস্তাত্ত্বিক ও আচার-আচরণগত উচ্ছৃংখলতা এবং এর থেকে সৃষ্ট ক্ষতির চেয়ে মারাত্মক আর কোন ক্ষতি মানুষের জীবনে হতে পারে না। মানুষের ঘৃণার অনুভূতি, তার মনের সুখ-শান্তিকে বিনষ্টকারী ক্ষতিকর দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম। ক্রোধ হতে ঘৃণার উৎপত্তি হয় এবং তা মানুষের চিন্তার ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে। একজন মানুষ যখন রাগান্বিত হয় তখন কোন কারণ হয়ত তার অন্তরের ক্রোধের অগ্নিশিখাকে নির্বাপিত করে তার মনস্তাত্ত্বিক অস্থিরতাকে দূর করে। তবে, ঘৃণার একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার অন্তরে অবশিষ্ট থেকে যেতে পারে, যা তার সুখকে জ্বালিয়ে দিয়ে তার অন্তরের শান্তিকে নষ্ট করে। ক্ষমা, দয়াশীলতা ও মানসিক ভারসাম্য সুখ-শান্তির প্রধান উপাদান, আর এর উল্টো হচ্ছে শত্রুতা ও ঘৃণা-বিদ্বেষ যা মানুষের মধ্যে মত বিরোধ ও অনৈক্য ঘটায়। এসব হচ্ছে অপরাধমূলক মনোভাবের বহিঃপ্রকাশ। ক্রোধ আবেগের অস্থিরতা ও দুশ্চিন্তা দূর করে, কিন্তু মন্দকে মন্দের দ্বারা মোকাবিলা করার প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে যে যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তা অন্য কোন দুঃখ-যন্ত্রণার চেয়ে বেশী মারাত্মক। এর কারণ হচ্ছে এই যে, শেষোক্ত ধরনের যন্ত্রণা স্বভাবতঃ সাময়িক হয়ে থাকে, কিন্তু শত্রুতার যন্ত্রণা সাময়িক নয় কারণ শত্রুপক্ষের বীর যোদ্ধারা যখন হাজির হয়ে যায়, তখন তারা মনের গভীরে লুকানো ঘৃণাকে পুনরায় জাগ্রত করে তোলে। অধিকন্তু, একটা মন্দ কাজের দ্বারা শত্রুতা দূর হয় না, বরং পুনরায়

অন্তরের পুরাতন ক্ষতচিহ্নকে আরও প্রসারিত করে, এবং প্রতিরক্ষা বা প্রতিশোধমূলক কাজ করার জন্য প্রস্তুত করে।

শত্রুতা যন্ত্রণাদায়ক পরিণতি ও বিশৃংখলার দিকে ঠেলে দিতে পারে এটিই একবার দেখা দিলে তার প্রতিকার করা সম্ভব নাও হতে পারে। শত্রুতা বা ঘৃণা হতে উদ্ভূত অযৌক্তিক কাজের ফলে একজন ব্যক্তি চিরদিনের জন্য তার এ ধরনের চেতনার শিকারে পরিণত হয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা এত দূর পর্যন্ত গড়াতে পারে যে সে শেষ পর্যন্ত তার নিজের জন্য মারাত্মক ধ্বংস ডেকে আনতে পারে। এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের জীবনে ক্ষমা বা মহত্ত্ব প্রদর্শনের কোন নজির পাওয়া যায় না। কারণ তারা তাদের জীবনে তাদের বিরুদ্ধে কৃত সামান্যতম সীমালংঘন বা দুর্বলতাকেও ভুলে যায় না। এসব উচ্ছৃংখল অনুভূতি এমন যে প্রতিশোধ গ্রহণের মাধ্যমে, তাদের শক্তি ও যোগ্যতার অপচয় করতে তাদেরকে প্ররোচিত করে, তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে হলেও।

এমন কিছু লোক রয়েছে যারা অতি সহজে রেগে যায় এবং দ্রুত প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়। তারা তাদের আচরণের উপর সামান্যতম সমালোচনা শুনতে রাজী নয়। অপরপক্ষে, শক্তিমান ও জ্ঞানি লোকেরা সমালোচনা হতে গঠনমূলক বিষয়াদি শিখে এবং উন্নততর জীবন যাপনে পরিবর্তিত হওয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

জনৈক বিজ্ঞ পণ্ডিতের মতে ঃ

"শত্রু প্রতিক্রিয়ার (সমালোচনার জবাবে) দ্বারা পূর্ণ পরিপক্কতার অভাব বুঝা যায়। কেননা প্রথম হতে বিরোধিতা বা অপমানিত হওয়ার মত পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে থাকলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হওয়ার সুযোগ ঘটতো। একজন লোক প্রথম হতে অপমানিত হওয়ার কারণসমূহ সম্পর্কে মনে মনে চিন্তা করতে পারে। হয় সে সত্যিই অপমানিত হয়নি কিংবা সত্যি অপমানিত হয়েছে। উভয় ক্ষেত্রে দুঃখ পাবার বা অভিযোগ করার কোন্ কারণ নেই। যদি সত্যি সে অপমানিত হয়ে থাকে, তাহলে তা হয়ত তার স্বাভাবিক কোন দুর্বলতার কারণে ঘটেছে এবং এজন্য তার উচিত কোন অভিযোগ না করে দুর্বলতা হতে মুক্ত হবার জন্য কাজ করা অথবা এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীনও হতে পারে এ ক্ষেত্রেও মানুষকে অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিৎ নয় বরং এটাই অনুভব করা উচিৎ যে, যে লোকটি তাকে অপমানিত করেছে সে হয়ত ঈর্ষান্বিত হয়ে খারাপ উদ্দেশ্যে করেছে। একজন হতাশাগ্রস্ত ও অবিবেচক ব্যক্তি তার প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টায় কি বা একজন মূর্খ লোক অন্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন

ঘটনা তৈরী করে তাকে হেয় করার চেষ্টা করছে। যে কোন কারণেই হোক না কেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে এ ধরনের অজ্ঞতাজনিত কারণে কৃত কোন ব্যাপারে দুঃখ অনুভব করা উচিৎ নয়।''

একজন ব্যক্তি যখন অর্থহীন অনুভূতি দ্বারা আক্রান্ত হয় তখন সে প্রতিশোধ গ্রহণের কাজ করে। ছেলেবেলাকার কোন ক্ষত বা আঘাতের ফলে প্রাপ্ত দৈহিক অসুস্থতা কিংবা এমন একটা সামাজিক পরিবেশ, যেখানে দুঃখজনক কোন ঘটনার অভিজ্ঞতা অর্জনের কারণে, একজন ব্যক্তি অর্থহীন অনুভূতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। ফলে তার দ্বারা প্রতিশোধস্পৃহাজনিত কাজ সংঘটিত হয়। অন্যকথায় বলা যায় যে, মানসিক বিকৃতিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরাই, তাদের ব্যর্থতা বা ক্ষুদ্রতা পুরণ করতে গিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণের পন্থাকে গ্রহণ করে থাকে। এসব লোক অন্যদের ক্ষতি করার জন্য পথ খুঁজতে থাকে এবং যে কোন অপরাধমূলক কাজ করতে পারে।

খারাপ অবস্থা হতে মুক্তিলাভের কার্যকরী পন্থাসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জীবনের পবিত্র উদ্দেশ্যসমূহের অনুসরণ, কেননা যে নিজের আত্মা ও আচার-আচরণকে পরিশুদ্ধ করে এবং অপরাপর লক্ষ্যসমূহকে বর্জন করে, সে তার বিরুদ্ধে অন্যদের কৃত দুর্ব্যবহার উপেক্ষা করতে পারে।

অন্যদের দুর্ব্যবহারের দ্বারা আমরা কতখানি প্রভাবিত হব তা আমাদের উপর নির্ভর করে। আমাদের চিন্তাধারাকে পরিবর্তনের কাজটিও আমাদের ইচ্ছাধীন, সুতরাং আমরা ইচ্ছা করলে আমাদের মনের মধ্যকার বিভিন্ন শক্তির প্রভাবকে এমনভাবে পরিবর্তন করতে পারি যাতে আমাদের আত্মার উপর চাপ সৃষ্টিকারী স্পৃহাকে উৎপাটিত করে নিজেদেরকে শক্তিশালী করা যায়। এছাড়াও, আমরা যদি আমাদের নৈতিক দায়িত্বকে উপেক্ষা করি, তাহলে অন্যদের পক্ষে আমাদের দোষত্রুটি দূরীকরণে সাহায্য করা সম্ভব নয়।

প্রতিশোধ গ্রহণের ধরন বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। কিছু লোক এমনসব বস্তু দ্বারা তাদের শত্রুদের উপর আক্রমণ চালায় যা তাদের জন্য পূর্ণ দুর্ভাগ্য ডেকে নিয়ে আসে। যদিও এর মাধ্যমে তারা তাদের প্রতিপক্ষকে ধার্মিকতা ও সততার পথে পরিচালিত করার ভান করে থাকে। এসব প্রতিশোধ গ্রহণকারীরা জেনে শুনে ষড়যন্ত্র করছে।

জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে ঃ

শত্রুতা ও ঘৃণা মানসিক অস্থিরতা হতে উৎপন্ন হয়। অন্য কোন দৃশ্যমান কারণ না থাকলে সাধারণতঃ আমরা আমাদের মধ্যকার সকল সমস্যাই ভ্রাতৃত্বসুলভ আচরণের দ্বারা সমাধা করতে পারি। কিন্তু অহংকার ও দাম্ভিকতা তা কিছুতেই করতে দেয় না। আমরা প্রায়ই আমাদের বন্ধু বান্ধব ও প্রিয়জনদের কৃত ছোটখাটো ভুলের কারণে তাদেরকে পরিত্যাগ করে থাকি। অনেক সময় তাদেরকে নিরাপরাধ জেনেও আমরা তাদেরকে ক্ষমা করতে পারি না। আমি আশা করি যে আমরা তাদের বিরুদ্ধে আমাদের এ ধরনের অবিচার কমাতে সক্ষম হব।"

অসদাচরণকারীদের সঙ্গে ইমাম সাজ্জাদ (আঃ)—এর ব্যবহার ঃ

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের জীবনী হতে আমরা মান সম্মান, মহত্ত্ব, ক্ষমা এবং মানবতা সম্পর্কিত অনেক কিছু শিখতে পারি। তাঁদের অধ্যাত্মিক গুণাবলী আমাদের ব্যবহারিক জীবনের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে ভাস্বর হয়ে আছে।

একদিন ইমাম আলী ইবনুল হোসাইন আস সাজ্জাদ (আঃ) তাঁর অনুসারীদের পরিবৃত হয়ে বসেছিলেন। এমন সময় তাঁর সঙ্গে সম্পর্কিত জনৈক ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হলো এবং ইমামের কাছাকাছি এসে তাঁকে অপমান করতে লাগলো। এই লোকটির নাম ছিল হাছান ইবনুল মুছান্না। ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) লোকটির কথার প্রতি কোন গুরুত্ব দিলেন না। লোকটা চলে যাওয়ার পর তিনি তাঁর অনুসারীদের বললেন "আমি চাই যে আপনারা আমার সঙ্গে গিয়ে শুনবেন যে, লোকটাকে আমি কি জবাব দেই।"

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ)–এর অনুসারীরা তদুত্তরে বললেন ঃ

"আমরা আপনার সঙ্গে যাবো যদিও আমরা চেয়েছিলাম যে আপনি বা আমরা লোকটাকে উচিৎ জবাব দিয়ে দেই।"

ইমাম কালামে পাকের নিম্নোক্ত আয়াত পড়তে পড়তে লোকটার গৃহাভিমুখে রওয়ানা হলেন।

"এবং ওসব (লোক) যারা যখন কোন অশ্লীলতার কাজ করলে অথবা তাদের আত্মার প্রতি অবিচার করলে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তাদের কৃত দোষের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং আল্লাহর চাইতে অপরাধের ক্ষমাকারী আর কে আছে? এবং তারা জেনেশুনে যা করে ফেলে তার পুনরাবৃত্তি করে না।"

–আল কোরআন, ৩ঃ১৩৫

একথা শুনার পর ইমামের সাথীরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) লোকটিকে কিছু সদয় কথাই বলবেন। ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) হাসান ইবনে মুছান্নার বাড়ী পৌঁছলেন এবং বললেনঃ

"তাকে বলুন, এ হচ্ছে আলী ইবনুল হোসেন"। লোকটা একথা শুনে তাঁর সাথে মুকাবিলা করার প্রস্তুতি নিয়ে ঘর হতে বেরিয়ে আসলো। সে নিশ্চিতভাবে মনে করছিল যে ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) তার কৃত কাজের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই এসেছেন। হাছান আল মুছান্না এসে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইমাম সাজ্জাদ (আঃ) বললেন ঃ "হে আমার ভাই। আপনি আমার কাছে গিয়ে কিছু কথাবার্তা বলেছেন। আপনি আমার সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন তা যদি সত্যই আমার মধ্যে থাকে, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি আর যদি এমন কোন বিষয়ে আপনি আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে থাকেন যে ব্যাপারে আমি নিরপরাধ আমি আল্লাহর কাছে আপনার জন্য ক্ষমা চাইছি!!" লোকটি ইমাম সাজ্জাদ (আঃ)–এর কথা শুনার পর তাঁর কপাল চুম্বন করলো এবং বললো ঃ

"প্রকৃতপক্ষে আমি এমনসব বিষয় আপনাকে অভিযুক্ত করেছিলাম যে ব্যাপারে আপনি নিরপরাধ। এ কথাগুলোর মধ্যে আমার অবস্থানের বর্ণনাই রয়েছে।" – ইরশাদ আল মুফিদ, পৃঃ ২৫৭।

ইমাম সাজ্জাদ (আঃ)–এর এ কথাগুলো লোকটার অন্তরকে নাড়া দিল ও তা তার ব্যথার উপশম ঘটালো। তার দুঃখ ও অনুশোচনার মনোভাব তার অঙ্গভঙ্গির মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল।

ইমাম (আঃ) তাঁর অনুসারীদেরকে অন্যদের ভুলকে উপেক্ষা করে কিভাবে তাদেরকে ক্ষমা করে দিতে হয় সে শিক্ষা দিলেন। ক্ষমা প্রদর্শনের ফলে লোকটির মধ্যে যে অনুশোচনার আনন্দ প্রকাশ পেল তাও তিনি দেখালেন।

ইমাম আলী (আঃ) বলেন ঃ

"ক্ষমাশীলতার অভাব হচ্ছে মানুষের দোষসমূহের মধ্যে কুৎসিততম। আর

নিকৃষ্টতম পাপ হচ্ছে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তাড়াহড়ো করা।"

– *গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৭৬৮।*

কালামে পাক সব সময় মুসলমানদেরকে ক্ষমাশীল হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে ঃ

"তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না, তারা যেন তাদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করে। তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"

– *আল কোরআন, ২৪ঃ২২।*

সর্বশক্তিমান আল্লাহ আরও বলেন ঃ

"ভাল ও মন্দ সমান হতে পারে না। ভাল দিয়ে মন্দকে প্রতিহত কর, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা রয়েছে সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে যাবে।"

– *আল কোরআন, ৪১ঃ৩৪।*

প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকাকালীন অবস্থায় ক্ষমা করে দেওয়াটা হচ্ছে মহামূল্যবান বৈশিষ্ট্য। ইমাম সাদেক (আঃ) এটাকে নবী, রাসূল ও ধার্মিক লোকদের গুণাবলীর পর্যায়ভুক্ত করেছেন।

– *সফীনা আল বিহার, ২য় খণ্ড, ৭০২ পৃঃ।*

ইমাম আলী (আঃ) ক্ষমাকে খারাপ লোকদের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বোত্তম প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে গণ্য করেছেন ঃ

"তোমার ভাই-এর প্রতি ভাল কাজ করার মাধ্যমে তাকে তিরস্কার প্রদান কর। তাকে অনুগ্রহ প্রদান করে তার খারাপ মনোভাবকে সরায়ে দাও।"

– *নাহযুল বালাগা, পৃঃ ১১৫।*

ইমাম আলী (আঃ) অত্যন্ত ছোট অথচ প্রাজ্ঞ বাণীতে ঘৃণা সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর তথ্য উদঘাটন করেছেন। তিনি পরোক্ষভাবে বুঝাতে চেয়েছেন যে বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিরা এক ধরনের দয়ামায়া বিবর্জিত মনোভাবের অধিকারী ও অনুশোচনাহীনতায় আক্রান্ত।

"যে আত্মা সর্বাধিক যন্ত্রণা ভোগ করে তা হচ্ছে বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তির আত্মা।"–গুরার আল হিকাম, পৃঃ ১৭৮।

একজন মনোবিজ্ঞানীর মতে ঃ

"একজন বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তি অতি তাড়াতাড়ি রেগে যায় এবং সে একজন

নির্দয় শত্রু। তার ধরনটা এমন একজন লোকের মত যে তার রুমাল হারিয়ে যাওয়ার কারণে বাজার পুড়িয়ে ফেলে। বিদ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিরা উন্নত আচার-আচরণ, সাদাসিদে জীবনযাপনকারী মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তারা তাদের অভ্যন্তরে ঘৃণা ও প্রতিশোধস্পৃহার এক ভয়াবহ আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে রেখেছে। এটি অগ্নুৎপাতের জন্য প্রস্তুত। এ অগ্নেয়গিরির অগ্নি উদগীরণের প্রথম সুযোগে সবুজ এবং শুষ্ক, শত্রু, মিত্র সবই পুড়ে যায়।

-রাভান কাভী।

বিদ্বেষভাবাপন্ন লোকেরা অবিরত এক গভীর আত্মিক যন্ত্রণা ভোগ করে থাকে।

"বিদ্বেষভাবাপন্ন ব্যক্তির আত্মা নিপীড়িত হতে থাকে এবং তার দুশ্চিন্তা অবিরত বৃদ্ধি পেতে থাকে।" - গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৮৫।

ডেল কার্ণেগী তাঁর, "বন্ধুত্ব ও প্রতিপত্তিলাভ" নামক বইতে লিখেছেনঃ "যখন আমরা শত্রুদের প্রতি আমাদের অন্তরের ঘৃণা ও শত্রুতার মনোভাবকে লুকায়ে রাখি, আমরা প্রকৃতপক্ষে আমাদের পানাহার, নিদ্রা,স্বাস্থ্য, সুখ এমনকি আমাদের রক্তের নিয়ন্ত্রণ আমাদের শত্রুদের হাতে অর্পণ করি। আর এটা আমাদের মানসিক চাপের ফলে সংঘটিত হয়। আমরা নিজেরাই কার্যতঃ তাদেরকে আমাদের এসবের নিয়ন্ত্রণকারী বানাই। তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা তাদের বিন্দুমাত্রও ক্ষতি সাধন করে না কিন্তু তা আমাদের জীবনকে অসহনীয় নরকে পরিণত করে।"

আজকালকার মনোবিজ্ঞানীরা পরীক্ষামূলক গবেষণার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক রোগ নির্ণয় করে অতঃপর তারা তার চিকিৎসা করার চেষ্টা করেন। এর অনেক আগে হযরত আলী (আঃ) লোকদের একাই কথা বলেছিলেনঃ যখন বিবেকের চিকিৎসা চলতে থাকে তখন অসদিচ্ছা দেখা দেয়।"

- গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৪৯০।

বিদ্বেষপরায়ণ লোকদের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহা চরিতার্থ না হওয়া পর্যন্ত তাদের অন্তরের ঘৃণার অগ্নিশিখা অবদমিত হবে না।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"ঘৃণা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন অগ্নি যা বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত থামবে না" - গুরার আল হিকাম, পৃঃ ১০৬।

একজন মনোবিজ্ঞানীর মতে ঃ

শক্তি, ভয়ভীতি, গালিগালাজ ও নির্দয় কথা দিয়ে অন্যদেরকে অধীনস্ত করার মধ্যেই প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকেরা তাদের বিজয় দেখতে পায়। প্রতিহিংসাপরায়ণ লোকেরা একে একটি সহজ ও অত্যাবশ্যকীয় কাজ বিবেচনা করলেও আল্লাহর নিকট এটা জঘন্য গুনাহর কাজ।

আমি এমন একজন সামরিক অফিসারকে জানি, যিনি একদিন গাড়ী চালিয়ে যাওয়ার সময় তার গাড়ীর সাথে একজন গরীব মোটর সাইকেল আরোহীর সাইকেলের সাথে জোরে ধাক্কা লেগে যায়। মোটর সাইকেল আরোহীর সাইকেলের পেছনে রক্ষিত মাটির দুই পাত্র ও পেছনের চাকার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। ভগ্ন মাটির পাত্র হতে দুধ পড়ে রাস্তা সাদা হয়ে যায়। হয়ত দরিদ্র লোকটির দোষে দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল। কিন্তু তবুও লোকটার অবস্থা এতই করুণ ছিল যে ঐ পরিস্থিতিতে শিক্ষিত অফিসারের পক্ষে এজন্য তাকে লজ্জা দেওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি সদয় আচরণ করার প্রয়োজন ছিল। যন্ত্রণার চোটে দরিদ্র লোকটি পায়ের উপর ভর করে হামাগুড়ি দিচ্ছিল। সকল আশা ভরসা ছেড়ে দিয়ে মৃত্যুর আশঙ্কা করছিল। গরীব লোকটি যেভাবে অফিসারের কথার জবাব দিচ্ছিল তাতে এটাই বুঝা যাচ্ছিল যে, অফিসারটি লোকটির দীর্ঘদিন পূর্বের পরিচিত একজন শিক্ষক। এ কাজের দ্বারা সে তার অত্যাচারী ও শক্তিশালী শিক্ষকের বিরুদ্ধে তার দীর্ঘদিনের রক্ষিত ঘৃণার মনোভাব প্রকাশ করছিল। আমার বন্ধু (অফিসার) গরীব লোকটাকে তার মত একজন বড় অফিসার কে এভাবে অপমানিত করার মত ধৃষ্টতা দেখানোর জন্য তিরস্কার করতে চেয়েছিল কিন্তু আমিও তার আর একজন বন্ধু তাঁকে একাজ হতে নিবৃত্ত করি। সে রাত্রে আমরা উভয়ে তার মেহমান হিসাবে তার সঙ্গে রাত যাপন করতে গিয়ে দেখলাম যে, সে সারারাত ধরে তার প্রতিকৃত অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ হতে নিবৃত্ত রাখার কারণে আমাদেরকে ও তার নিজেকে বারবার দোষী করছে। গরীব লোকটার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে না পারার জন্য সে আমাদেরকে বা তার নিজেকে কখনও ক্ষমা করতে পারেনি।"

–রাভান কাভী

"প্রতিহিংসা ক্রোধের জন্ম দেয়"

– শুরার আল হিকাম, পৃঃ ২১।

একজন মনোবিজ্ঞানী আরও বলেছেন ঃ

"তুমি যদি প্রতিহিংসাপরায়ণ ব্যক্তির অনুরোধ, তা যত অযৌক্তিকই হউক না কেন, পূরণ না কর সে হতাশ হয়ে পড়বে এবং তার মর্জি পূরণে ব্যর্থ ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তার মধ্যে স্বস্তি ফিরে আসবে না।"

–রাভান কাভী।

ঘৃণার দাগ অন্তর হতে মুছে না ফেলা পর্যন্ত মানুষ তার আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভে সক্ষম হবে না।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি ঘৃণার মূলোৎপাটন করে তার অন্তর এবং চিন্তাশক্তি সহজ হয়।"

-গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৬৬৬।

অন্য একজন মনোবিজ্ঞানীর মতে ঃ

"কোন মানুষ যতই তার নিজেকে উচ্ছৃংখলতা এবং ক্রোধ ও ঘৃণায় আচ্ছন্ন হওয়া থেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হবে, ততই সে তার নিজেকে মানসিক ভারসাম্য বিনষ্টকারী স্নায়ুবিক বিশৃংখলা থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে।"

-সিলেকশন জার্নাল, মনস্তত্ব বিভাগ।

সৌভাগ্যবান ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে শত্রুতা ও প্রতিশোধপরায়ণতা হতে পবিত্র রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"মানুষের সুখ তখনই আসে যখন সে নিজেকে বিদ্বেষ ও প্রতিশোধপরায়ণতা হতে মুক্ত রাখে।"

-গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৩৯৯।

একটা প্রয়োজনীয় বিষয়ে আমরা এ উপসংহারে পৌছতে পারি, তা হচ্ছে কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলাম কোন কোন কাজকে উপেক্ষা করতে নিষেধ করেছে। এটা সত্য যে ইসলাম নিরাপত্তা ও শৃংখলা অর্জনকে লক্ষ্য বানিয়েছে, কিন্তু শাস্তিকেও কোন কোন ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক বিবেচনা করেছে, যখন কাজটা সামাজিক বা সামাজিক নিরাপত্তার ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অন্তর্ভুক্ত হয়। দণ্ডবিধির অনুচ্ছেদসমূহ হচ্ছে মানুষের অধিকার যা মানুষ নিজেরাই ইচ্ছা করলে কার্যকর অথবা পরিহার করতে পারে। এ বিধিগুলো হচ্ছে জনগণের উপর আল্লাহর অধিকার।

১২

ক্রোধ

* আত্ম নিয়ন্ত্রণের সুফল
* ক্রোধ-এর পরিণতি
* ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের উপদেশ

আত্ম নিয়ন্ত্রণের সুফল

যুক্তি ও ইচ্ছাশক্তি নামক দুটো শ্রেষ্ঠ শক্তি দ্বারা সুসজ্জিত মানবজাতিকে অনেকগুলো বিস্ময়কর রহস্য ঘিরে রেখেছে। যুক্তি হচ্ছে আলো যা এ জীবনে মানুষের আত্মার ভাগ্যকে নির্ধারিত করে। এটা মানুষের বাস্তব তথ্যমূলক ব্যক্তিত্বের প্রতিনিধিত্বকারী শক্তি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে এবং এটা মানুষকে ঔজ্জ্বল্যদানকারী আলো যা মানুষের জীবনের ইতিহাসকে উদ্ভাসিত করে তোলে। অতএব, যুক্তির নির্দেশনা ও তদারকি ব্যতীত আমরা জীবনের জটিল সমস্যাসমূহের মুকাবিলা করার জন্য এগিয়ে যেতে পারি না।

মানুষকে তার নিজের মধ্যকার বিভিন্ন অনুভূতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে এসবের মাত্রাধিক্য বা ঘাটতি দুটোর কোনটাই দেখা দিতে না পারে। যুক্তি এমন একটি শক্তি যা আমাদেরকে শক্তিশালী লালসার দ্বারা পরিচালিত হয়ে, তার আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার পথে যেতে না দিয়ে, আমাদের সুস্থ অনুভূতিসমূহ প্রয়োগের একটা যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি আমাদেরকে প্রদর্শন করে। বস্তুতঃপক্ষে, যদি যুক্তির আলো আমাদের অনুভূতির জগৎকে আলোকিত করতে থাকে তখন এটা নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে, একমাত্র তখনই সুখের আভা আমাদের জীবনাদর্শকে দীপ্তিমান করে তুলবে। বিপরীতপক্ষে, আমরা যদি আমাদের আশা-আকাঙ্খার হাতে বন্দী হয়ে যাই, তাহলে আমরা দুর্বল হয়ে যাবো, যার পরিণতি হিসেবে আমরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে হেরে যাবো।

মানুষের ইচ্ছাশক্তি হচ্ছে তার নৈতিক উপাদানসমূহের সর্বাধিক প্রভাবশালী উপাদান যা বলিষ্ঠতম পন্থায় মানুষের নেক বাসনা ও সদিচ্ছাসমূহকে কার্যকর করে, মানুষের জীবনে সুখের ভিত্তি রচনায় রয়েছে এর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র। মানুষের সংকল্পের দৃঢ়তা ও তার ব্যক্তিত্ব তাকে নীচতা ও নোংরামীতে নিমজ্জিত হওয়া হতে রক্ষা করে। সুখী জীবনের একটি শক্তিশালী উপাদান হচ্ছে মানুষের ইচ্ছাশক্তি। এটা মানুষের জীবনে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তারকারী ঘটনাসমূহ প্রতিরোধ করার শক্তি যোগায়। আমরা এ প্রধানশক্তিকে আরও অধিক শক্তিশালী করার জন্য উপযোগী যত বেশী প্রচেষ্টা চালাতে পারবো ততই আমরা দুর্নীতি

পরিহার করে নৈতিক উৎকর্ষ বিধানের উপযোগী উৎসাহ–উদ্দীপনা অর্জনে সক্ষম হব, তখনই আমাদের আত্মা বিভ্রান্তি হতে রক্ষা পাবে এবং প্রশান্তি লাভ করবে।

জনৈক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ এ বিষয়ের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে নিম্নোক্ত বক্তব্য রেখেছেন ঃ

যুক্তির একটা সুন্দর সংজ্ঞা আছে, যা এর ভারসাম্যের প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করে। সংজ্ঞাটি হলোঃ যুক্তি হচ্ছে সাংগঠনিক শক্তি যা গাড়ীসমূহ পরিচালনাকারী এক নূতন ধরনের যন্ত্রের মত প্রতিটি পুরুষ ও মহিলাকে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাত সৃষ্টিতে বাধা দান করে, এটা এমনি এক ব্যবস্থা যা আকস্মিক ধাক্কা বা রাস্তার অনিয়মের কারণে সৃষ্ট বড় রকমের সংঘর্ষকে আত্মস্থ করে গাড়ীর যাত্রীদেরকে শ্রমসাধ্য ও কঠিনতম রাস্তায়ও আরাম প্রদানের নিশ্চয়তা দান করে।

ভারসাম্যহীন ব্যক্তিত্বের কারণে অপরাধসমূহ সংগঠিত হয়ে থাকে। যখনই কোন মানুষ তার যুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, সে তার ইচ্ছাশক্তি ও নিজের উপরও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে। যুক্তির শাসন মেনে না চলার কারণে একটা মানুষ যে তার জীবনে ইতিবাচক ভূমিকাই হারিয়ে ফেলে তা নয় বরং সমাজের জন্য সে এক ভয়াবহ ক্ষতিকর সদস্যে পরিণত হয়ে যায়। ক্রোধ মানুষকে দুটো শক্তিশালী পর্বতের মধ্যে দিয়ে উচ্চ শব্দে প্রবাহিত ছোট একটা নদীর মত বানিয়ে ফেলে। উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী মহান ব্যক্তিরা বড় বড় নদীর মত যা বিলের মধ্য দিয়ে নিঃশব্দে প্রবাহিত হয়ে সাগরে গিয়ে পড়ে।

অমার্জিত প্রকৃতির লোকদের সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি থাকা দরকার যা দিয়ে তারা তাদের আত্মাকে পরাভূত হওয়া থেকে নিবৃত্ত করবে কিংবা দুঃখকষ্টের সময় বা চাপের মুখে তাদেরকে এমন কোন ত্বরিৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতে বিরত রাখবে যা অবাঞ্ছিত পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে পারে।

ক্রোধের পরিণতি

ক্রোধ এমন একটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা যা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিকে তার সঠিক অবস্থা হতে ভিন্নপথে পরিচালিত করে। এটা যখন মানুষকে অবরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করে তখন তা গোঁড়ামীর আকার ধারণ

করে। ফলে এটি মানুষের ইচ্ছাশক্তিতে প্রবেশকারী পথের প্রতিবন্ধকতাসমূহ অপসারণ করে কোন বিচার বিবেচনা ছাড়াই তার শত্রুর ক্ষতিসাধন করার জন্য তাকে প্ররোচিত করে। ক্রোধের আবরণ মানুষের মনকে অন্ধ করে তাকে এক বাস্তবতা অনুভূতিবিহীন পশুতে পরিণত করে ফেলে। এমতাবস্থায় সে এমনসব অপরাধ করে বসে যার কঠিন পরিণতি তাকে সারাজীবন ভোগ করতে হয়। কিন্তু একসময় সে তার ভুল বুঝতে সক্ষম হয়। আর তা সাধারণতঃ অনভিপ্রেত পরিণতি ও দুঃখের আবর্তে পতনের পরই হয়ে থাকে।

এ মন্দ বৈশিষ্ট্য মানুষকে কেবল দুঃখের দিকেই পরিচালিত করে, কেননা এর চূড়ান্ত পর্যায় হতে এর অবদমন ততক্ষণ পর্যন্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার নিন্দাকারী আত্মা তার উপর বিজয়ী হয় এবং তার বিবেকবুদ্ধির বিশ্বাসযোগ্যতা বিলোপ সাধন করতঃ তার যাবতীয় নীচ কাজকে তার ক্রোধোন্মত্ততার ফসলে পরিণত করবে। একজন ক্রোধান্বিত মানুষের মধ্যে যখন যুক্তিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত এসে উপস্থিত হয়, তীব্র যন্ত্রণাসহকারে দুঃখের ঢেউ তার অন্তরে দেখা দেয়। এমনকি তার দেহও ক্রোধের প্রতিকূল পরিণতির দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়, কেননা এটা আত্মার জন্য শক্তির আশ্রয়স্থল।

এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে সঠিক পরিমাণে ক্রোধশক্তি থাকা অত্যাবশ্যক। কারণ পরিমিত ক্রোধ হচ্ছে শক্তি ও তারুণ্যের উপাদান। এটা এমন একটি মানবিক বৈশিষ্ট্য যা মানুষকে জুলুমের প্রতিরোধ ও তার অধিকার রক্ষার দিকে এগিয়ে নেয়।

প্রতিশোধ গ্রহণস্পৃহা যা প্রায়ই ক্রোধের সাথে যুক্ত থাকে, জীবনকে হতাশাচ্ছন্ন করে ফেলে। আমরা যদি সকল ক্ষেত্রে খারাপ আচরণের প্রত্যুত্তরে খারাপ ব্যবহার ও শত্রুদের প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণার্থে অভদ্রোচিত কথাবার্তা বলে বেড়াই তা হলে আমাদের জীবনের বেশীর ভাগ সময় অহেতুক বিতর্কমূলক বিষয়ে অতিবাহিত হয়ে যাবে। অধিকন্তু আমাদের ইচ্ছাশক্তি লোপ পাবে এবং আমাদেরকে দুর্বলতার গ্লানি সহ্য করতে হবে।

মানুষ প্রায়ই ভুলে যায় এবং ভুল করে। অতএব, আমাদের কোন কাজের দ্বারা যদি কাউকে আমরা ক্রোধান্বিত হতে প্ররোচিত করি তবে তার নিকট হতে ক্ষমা প্রার্থনার সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা ভুল স্বীকার ঘরে নেওয়া।

ডাঃ ডেল কার্নেগীর মতে ঃ

"যদি আমাদের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে আমরা শাস্তি বা তিরস্কার লাভের যোগ্য, তাহলে ভুল স্বীকার করে নেওয়াটা অপেক্ষাকৃত ভাল নয় কি?

নিজেদের প্রতি আমাদের তিরস্কার আমাদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অন্যদের তিরস্কারের চেয়ে অধিকতর যথাযথ ও সহনীয় নয় কি? এভাবে আমরা আমাদের তিরস্কারযোগ্য কাজকে স্বীকার করার মাধ্যমে শুরু করতে পারি যাতে আমাদের শত্রুরা তাদের অস্ত্র আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়। এভাবে শতকরা নব্বই ভাগ ক্ষেত্রে আমরা ক্ষমা ও আমাদের দোষ উপেক্ষিত হওয়ার ব্যাপারে সম্মতি লাভের নিশ্চয়তা প্রদান করতে পারি। অতি সহজেই সকলে তার দোষ লুকাতে পারে কিন্তু একমাত্র মহৎ ব্যক্তিরাই তাদের নিজেদের দোষ স্বীকারের মাধ্যমে অনুপম আত্মমর্যাদা ও গর্ববোধ করতে পারে। সত্য ও ন্যায়পরায়ণতা আমাদের পক্ষে রয়েছে এ নিশ্চয়তা যদি আমরা প্রদান করতে পারি এ তাহলে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে অন্যদেরকে আমাদের পক্ষাবলম্বনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা। অপরপক্ষে, আমরা যদি ভুলের মধ্যে থাকি তাহলে অতি তাড়াতাড়ি আমাদের ভ্রান্তিসমূহ সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করে নেওয়া হবে আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। শুধু ভ্রান্তিসমূহ স্বীকারের ফলে আমরা এর সর্বোৎকৃষ্ট সুফলসমূহই ভোগ করবো না বরং ইপ্সিত প্রতিশোধ গ্রহণস্পৃহার পরিবর্তে এক আনন্দানুভূতি অনুভব করবো।

ক্ষমার মাধ্যমে মানুষের অন্তর প্রকৃত সুখের আলোর উত্তরাধিকারী হয় এবং পবিত্র অনুভূতির ঢেউ তার অন্তরে সঞ্চারিত হয়। এমনকি এর মাধ্যমে আমরা আমাদের শত্রুদের উপর বিজয়ী হয়ে যেতে পারি এবং শত্রুরাও বাধ্য হয়ে আমাদের দোষসমূহ ক্ষমা করে দিয়ে আমাদের অনুগত হয়ে যেতে পারে। এটা আমাদের ও অন্যান্যদের মধ্যে পারস্পরিক আস্থাশীলতার মনোভাব সৃষ্টি করে এবং এথেকে ভালবাসা ও একাত্মতার আলো বিচ্ছুরিত হতে থাকে। ক্ষমা কট্টর শত্রুর সঙ্গেও মতবিরোধ ও অনৈক্য উপেক্ষা করতঃ পারস্পরিক সম্প্রীতির মনোভাব গড়ে তোলে।

জ্ঞান হচ্ছে সম্পর্কোন্নয়ন ও হানাহানি হ্রাসের মাধ্যম। একটি লোকের জ্ঞানের পরিধি যতই বৃদ্ধি পেতে থাকবে ততই তার চিন্তার পরিধি বেড়ে গিয়ে তাকে লালসার ফন্দি ফিকির প্রতিহত করার শক্তি যোগাবে।

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের উপদেশাবলী ঃ

ক্রোধের মত বিশৃঙ্খলা হতে মুক্তিলাভের কার্যকর উপায় হচ্ছে নবী ও ইমামদের শিক্ষার যথার্থ অনুসরণ। চিকিৎসাবিদ, দার্শনিক ও মনস্তত্ত্ববিদদের পরিচালিত গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্তসমূহ সম্পূর্ণ অর্থহীন নয়, কিন্তু এ বিশৃঙ্খলা দূরীকরণের জন্য তা অত বিস্তারিত ও ব্যাপক নয়।

ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের সুবিজ্ঞ নির্দেশনার দ্বারা ক্রোধের ভয়াবহ পরিণতি এবং একে দমন করার সুদূরপ্রসারী কল্যাণকর দিকসমূহের প্রতি আমাদের মনযোগ আকর্ষণ করেছেন।

ইমাম সাদেক (আঃ) বলেছেন ঃ

"ক্রোধ পরিহার কর। কেননা এটা তোমার জন্য তিরস্কার বয়ে আনবে।"

ডাঃ মার্ডিন তাঁর নিম্নোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরো সুস্পষ্ট করেছেন ঃ

"একজন বদমেজাজী লোক (তার রাগের কারণ যাই হউক না কেন) তার রাগ চলে যাবার পর রাগের কারণের অর্থহীন উপলব্ধি করতে পারে। সে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যাদেরকে অপমানিত করেছে তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। রাগ দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তুমি যদি এ অর্থহীনতা উপলব্ধি করার অভ্যাস করতে থাকে তা হলে এর অবাঞ্ছিত পরিণতির পরিমাণ হ্রাস করতে সক্ষম হবে।"

– ফিরোজী ফিক্‌র।

ইমাম সাদেক (আঃ) বলেছেন ঃ

"ক্রোধ হচ্ছে জ্ঞানী লোকর আত্মার পরিপূর্ণ ধ্বংস। যে তার রাগকে দমন করতে অক্ষম, সে তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না।"

– উসুলুল কাফী, ২য় খণ্ড, ৩০৫ পৃঃ।

ক্রোধ এবং হতাশা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ক্রোধ যখন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে তখন তা মানুষের আকস্মিক মৃত্যু ঘটায়।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি তার ক্রোধকে সংবরণ করে না, সে তার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে।"

– *গুরার আল হিকাম, ৬২৫ পৃঃ।*

ডাঃ মার্ডিন বলেছেন ঃ

''দুর্বলচিত্ত লোকেরা কি অনুভব করতে পারে যে কোন্ কোন্ হতাশা তাদের জীবনকে বিপন্ন করতে পারে? এটা হয়ত তারা জানে না; তবে তাদের এটা উপলব্ধি করা উচিত যে, সবল স্বাস্থ্যের অধিকারী ব্যক্তিরাও রাগে উত্তেজিত হওয়ার কারণে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। ক্রোধ মানুষের ক্ষুধা নষ্ট করে, পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটায় এবং ঘন্টার পর ঘন্টা বা দিনের পর দিনব্যাপী মাংসপেশী ও স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যকার গোলযোগ সৃষ্টি করে। এটা মানুষের দৈহিক ও মানসিক কার্যক্রমের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। এমনকি শিশু পরিচর্যাকারী মায়ের রাগও তার দুধে বিপজ্জনক বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।"

– *ফিরোজী ফিক্‌র।*

ডাক্তার ম্যান বলেছেন ঃ "দুশ্চিন্তার দার্শনিক ফলাফল সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ফলে জানা গেছে যে, ক্রোধের সময় মানুষের দেহের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথা হৃদপিণ্ড, শিরা, পাকস্থলী, মগজ এবং দেহের অভ্যন্তরীণ রসগ্রন্থির স্বাভাবিক কার্যপ্রণালীর পরিবর্তন সাধিত হয়। রাগের মুহূর্তে অন্য গ্রন্থিরসের পরিবর্তে মূত্রগ্রন্থির পার্শ্বস্থ বৃক্করস জ্বালানির ভূমিকা পালন করে।"

–*উসূলে রাভান শিনাছী।*

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"ক্রোধ পরিহার কর, কেননা এর শুরু হাস্যকর এবং এর পরিণতি দুঃখজনক।"

তিনি আরও বলেছেন ঃ

ক্রোধ হচ্ছে অলৌকিক প্রেরণাসঞ্জাত উন্মাদনার আগুন। যে ব্যক্তি একে দমন করে সে আগুনকে নিভিয়ে ফেলে এবং যে একে অব্যাহতভাবে চলতে দেয় সে সর্বপ্রথম নিজেকে এ আগুনের মধ্যে ভস্মীভূত করে।''

– *গুরার আল হিকাম, ১৩১ পৃঃ।*

ক্রোধকে প্রতিহত করা ও এর ক্ষতিকর পরিণতি পরিহার করার জন্য ইমাম আলী (আঃ) ধৈর্যাবলম্বনের সুপারিশ করেছেন।

তিনিবলেছেনঃ

"ক্রোধোন্মত্ততা হতে নিজেকে বাঁচাও, ধৈর্যশীলতার গুণে নিজেকে

এমনিভাবে গুণান্বিত কর যাতে ক্রোধকে প্রতিহত করা যায়।"–গুরার আল হিকাম, পৃঃ '৩১।

এবং

''রাগের মুহূর্তের আত্মসংযম তোমাকে ধ্বংসের মুহূর্ত হতে রক্ষা করবে।"

–গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৪৬২।

"রাগের মাথায় হত্যাকাণ্ডও সংগঠিত হতে পারে।"

ইমাম বাকের (আঃ) বলেছেন ঃ

"ক্রোধ হতে খারাপ আর কি হতে পারে? অবশ্যই মানুষ ক্রোধান্বিত হতে পারে এবং ক্রোধের বশবর্তী হয়ে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ মানবহত্যা সংগঠিত করে।''

–আল ওয়াফী, তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৮।

জন মার্কোইষ্টের মতে কোন কোন ব্যক্তি (নির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় আক্রান্ত) সিনেমায় প্রদর্শিত দ্রুততার সাথে অপরাধের ঘটনায় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হয়। এসব রোগীর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে তারা মুহূর্তের মধ্যে যে কোন অপরাধ সংঘটিত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরবর্তী মুহূর্তে ইতস্ততঃ না করেই তা করে ফেলে। অন্য কথায়, এরা তাৎক্ষণিক হত্যাকারী।

– ছি মিদানাম

রাসূলুল্লাহ (দঃ) রাগের মুহূর্তে নিম্নোক্ত কার্যক্রম অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেনঃ

"অতএব তোমাদের কেউ যদি তার নিজের মধ্যে এটা (ক্রোধ) দেখতে পাও, যদি সে দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকে তবে তাকে বসে পড়তে হবে, আর যদি সে বসা অবস্থায় থাকে, তবে তাকে শুয়ে পড়তে হবে। এরপরও যদি তার ক্রোধ প্রশমিত না হয়, তাকে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে অজু বা গোসল করে নিতে হবে। কেননা, আগুন কেবল পানি দিয়েই নির্বাপিত হতে পারে।" –ইয়াহইয়া উল উলুম, ২য় খণ্ড, ১৫১ পৃঃ।

ডাক্তার ভিষ্টার পুসী বলেন ঃ

তোমার পক্ষ হতে তেমন কোন তীব্র তিরস্কার ছাড়াই যদি একটা ছেলে হতাশ হয়ে পড়ে তখন তুমি তার শরীরে ঠাণ্ডা পানি ঢেলে দিয়ে বা তার গায়ে ভিজা কাপড় জড়িয়ে বা তাকে ঠাণ্ডা জায়গায় ঢেকে রাখলে তার রাগ দমে যাবে।

–রাহী খোশ বখ্‌তী।

ডাঃ সি রবীনও বলেছেন ঃ

"শরীরের পরিচ্ছন্নতা মানুষের আচার-আচরণকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করে। প্রত্যহ সকাল বিকাল গরম পানি দিয়ে গোসল করলে শরীর শিথিল হয় এবং একঘেঁয়েমীজনিত বিষণ্নতা ও ক্ষুধাহীনতা দূরীভূত হয়, দৈনন্দিন কার্যব্যপদেশে যদি কোন রাগ দেখা দেয় তাও এতে প্রশমিত হয়। এভাবে আমরা একে আমাদের শরীর ও মন উভয়ের গুরুত্বের প্রতি জোর দিতে পারি।" -ছি মিদানাম

আমরা একথা পূর্বেই বলেছি যে, ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ আমাদের জন্য এমনসব মহামূল্যবান উদাহরণ রেখে গেছেন যা নিম্নোক্ত গল্পের ভেতর দিয়ে ইবনে অশ্লোব তাঁর গ্রন্থে বর্ণনা করেছেনঃ

মুবারাদ ইবনে আয়েশা বর্ণনা করেছেন যে সিরিয়াবাসী জনৈক ব্যক্তি ইমাম হাসান (আঃ)কে একদা ঘোড়ায় চড়ে যাবার সময় দেখতে পেয়ে তাঁকে অপমান করতে লাগলো। ইমাম হাছান (আঃ) প্রত্যুত্তরে লোকটাকে কিছুই বললেন না। যখন সিরিয়াবাসী লোকটা থামলো, ইমাম হাসান (আঃ) তার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং আনন্দের সাথে তাকে অভিবাদন জানানোর পর বললেন ঃ

বৃদ্ধলোক, আমি মনে করি আপনি একজন অপরিচিত লোক। হতে পারে আপনি আমাকে চিনতে ভুল করেছেন। যদি আপনি এজন্য ক্ষমা চান আমি তা আপনার জন্য মঞ্জুর করলাম। আপনি যাওয়ার জন্য যদি যানবাহন চান, আপনার সে বন্দোবস্ত করতে আমরা প্রস্তুত আছি। আপনি যদি ক্ষুধার্ত হন, আমরা আপনাকে খাবার দিব। আপনার কাপড়ের প্রয়োজন থাকলে আমরা তা ও দিব। আপনি যদি বঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকেন, আমরা আপনার অভাব পূরণ করব। আপনার কোন প্রতিপক্ষ যদি আপনার খোঁজে আসে, আমরা আপনাকে আশ্রয় প্রদান করবো। আপনার যদি কোন প্রয়োজন থাকে, তা আমরা পূরণ করবো এবং আপনি যদি আপনার নিরাপত্তার কারণে আপনার সঙ্গে ভ্রমণরত মরু যাত্রীদলের সঙ্গে একত্রিত হতে চান তবে তাদের প্রতীক্ষায় যতদিন এখানে অবস্থান করার দরকার মনে করেন ততদিন আমাদের মেহমান হিসেবে আমাদের সঙ্গে অবস্থান করতে পারেন। এটা আপনার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। কেননা আমাদের ভাল অবস্থা, শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও বিপুল সম্পদ রয়েছে।

লোকটা ইমাম হাসানের (আঃ) কথা শুনে চীৎকার করে বলে উঠলোঃ

"আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে, আপনি আল্লাহর জমীনে আল্লাহর উত্তরাধিকারী। আল্লাহ নিশ্চিতরূপে জানেন যে কাকে তিনি তাঁর বার্তা পৌছানোর জন্য দায়িত্বশীল করবেন। হে রাসূলুল্লার সন্তান সাক্ষাতের হবে আপনি ও আপনার পিতা ছিলেন আমার মহাশত্রু কিন্তু এখন আপনি হলেন আমার কাছে সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়।"

অতঃপর লোকটি তার কাফেলাকে নির্দেশ দিল এবং তাঁদের ভালবাসার প্রতি বিশ্বস্ত হওয়া পর্যন্ত সে শহরের মেহমান হল।

– *আল মালাকিব, ৪র্থ খণ্ড, ১৯ পৃঃ।*

১৩

বিশ্বাস ভঙ্গ

* কতিপয় দায়িত্ব
* বিশ্বাসের গুরুত্ব ও তা ভঙ্গ করার ক্ষতিকর দিক
* বিশ্বাস ভঙ্গ করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে

কতিপয় দায়িত্ব

মানুষ ভালমন্দ বাছাই করার পর্যায়ে উপনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার দায়িত্ব উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তখনি সে জীবন ব্যবস্থার নির্দেশাবলী মেনে চলার যোগ্যতা অর্জন করে এবং মানুষের সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে পারে যার উপর মানুষের সুখ ও সংহতি নির্ভরশীল। অন্যকথায় বলতে গেলে, সে তার দৈহিক ও আত্মিক চাহিদার সহিত তার আচার-আচরণের সামঞ্জস্য বিধান করতে সক্ষম হয়।

যুক্তি ও বিবেক উভয়ের দ্বারা যথাযথভাবে পরীক্ষা করার পরই মানুষ তার বস্তুগত ও আধ্যাত্মিক দায়িত্বের প্রয়োজনীয়তাপূর্ণ করে। এজন্য তাকে অত্যন্ত ধীর স্থিরভাবে অগ্রগতির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে এবং জীবন প্রণালীতে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী উপাদান সমূহ পরিত্যাগ করতে হবে। আচার-আচরণ ও আধ্যাত্মিকতার উন্নয়নের জন্য মানুষের কর্তব্যনিষ্ঠ হওয়ার অবদান সর্বাধিক। কতিপয় বিশ্বাস সত্ত্বেও দায়িত্বশীলতা গোলামী নয় বরং এটাই প্রকৃত স্বাধীনতা। কর্তব্যনিষ্ঠা মানুষের মধ্যে এমন এক আচরণবিধির দারী করে যা উন্নত জীবনযাপন প্রণালীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার দায়িত্ব রয়েছে। তবে সে দায়িত্বের ধরন বিভিন্নমুখী। একজন লোকের দায়িত্বশীল হওয়ার কথা তখনই আশা করা যেতে পারে যখন তার মধ্যে সে দায়িত্ব পালনোপযোগী যোগ্যতা ও ইচ্ছা বর্তমান থাকে।

দায়িত্বহীনতা ও নিয়মনীতির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন হচ্ছে জীবনের মূল ভিত্তি সম্পর্কে অজ্ঞতারই নামান্তর। এটি দুঃখ ও ধ্বংসের পথে অগ্রযাত্রা। সমাজের লোকদের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের মত বড় রকমের ভ্রান্তি আর একটিও নেই। অতএব, আমাদেরকে আমাদের নিজস্ব ভোগ লালসা চরিতার্থ করার লক্ষ্যে পরিচালিত কর্তব্য পালনের এ প্রক্রিয়ার অবশ্যই অবসান ঘটাতে হবে। লোভ লালসার হাতে বন্দী লোকেরা তাদের আশা-আকাঙ্খা ও ব্যক্তিস্বার্থকে তাদের কর্তব্যের উর্ধে স্থান দেয়, যা হচ্ছে ব্যর্থতার মূল কারণ ও মানব সমাজের ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান অন্তরায়।

ডাঃ কার্লের মতে ঃ

মানুষ সীমাহীন মুক্ত আকাশে বিচরণকারী ঈগল পাখীর মত নয় যে সে যখন যা ইচ্ছা তা করতে থাকবে, বরং সে রাস্তার মধ্যে বা গাড়ীর ভীড়ের মধ্যে ছুটে পলায়নকারী কুকুরের মত। এ লোকটাকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে, এজন্য যে সে তার মনের ইচ্ছামত যখন যা খুশী তাই করে, এরপর সে কুকুরের চেয়েও বেশী বিভ্রান্ত, কেননা সে জানে না যে সে কিভাবে তার চতুর্দিকে পরিবেষ্টনকারী অসংখ্য বিপদ আপদ হতে নিজেকে মুক্ত করবে। আমরা সকলে এ ব্যাপারে একমত যে প্রকৃতি কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। আমাদেরকে অবশ্যই একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, মানুষের জীবনকে অবশ্যই ধারাবাহিক আইন কানুনের নিয়ন্ত্রণাধীন হতে হবে। আমরা নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির অধীনতা মুক্ত স্বাধীন, যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারি বলে মনে করি। আমরা একথা স্বীকার করতে চাই না যে, আমাদের জীবন পরিচালনা ও গাড়ী পরিচালনার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এ দৃষ্টিকোন থেকে যে উভয় ক্ষেত্রেই কতিপয় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটা যেমন আমরা মনে করে থাকি যে মানুষের জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো ও যৌন সঙ্গম এবং গাড়ী, রেডিও ইত্যাদির অধিকারী হওয়া।

নিয়মের অনুসারী হওয়া মানব সমাজের জন্য অত্যাবশ্যক, অবিরত নিয়ম নীতির অনুসরণ ব্যতীত এটা কিছুতেই অর্জিত হতে পারে না। যারা তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল, তারা তাদের যুক্তি ও জ্ঞানের আলোর সাহায্যে জীবনের বাস্তবতাকে মেনে চলতে পারে। সুতরাং তারা কতিপয় দায়িত্ব প্রতিপালন করে চলতে সক্ষম। সত্য ও ন্যায়পরায়ণতার মূলনীতি অনুযায়ী তারা তাদের জীবনকে গঠন করে এবং কোন অভিযোগ উত্থাপন না করেই তারা তাদের কর্তব্য পালন করে। যদি কোন কারণে একজন লোক অকৃতকার্য হয়, তথাপি তার গর্ব অনুভব করার কারণ রয়েছে, কেননা কোন দায়িত্ব পালন না করার কারণে নয় বরং দায়িত্বসমূহ প্রতিপালনের পরই তার এ ধরনের অকৃতকার্যতা এসেছে।

আমাদেরকে অবশ্যই যথার্থ অর্থে প্রকৃত সুখের অন্বেষণকারী হতে হবে। যারা সফলতার সাথে তাদের বিবেকের আনুগত্য করে চলে তারাই সুখের সাথে প্রশান্তি উপভোগ করে। দায়িত্বসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন কারীদের পুরস্কার হচ্ছে আত্মবিশ্বাস এবং মন ও বিবেকের সামঞ্জস্যশীলতা। যারা তাদের জীবনে দায়িত্বসমূহ প্রতিপালন করে চলে

তাদের অন্তর হতে এ ধরনের আনন্দানুভূতির জন্ম হয়।

বিশ্বাসের গুরুত্ব এবং তা ভঙ্গ করার ক্ষতিকর দিক

মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে প্রতিশ্রুতি পালন করা। মানুষ স্বভাবতঃ প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হলে অসন্তুষ্ট হয়। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনে মানুষ তার অঙ্গীকার রক্ষা করলে খুশী হয় ও তার কাছে ভাল লাগে। এমনকি তার ধর্মও একে সমর্থন করে। যে মূলনীতিসমূহের মধ্যে মানুষ প্রতিপালিত হয় তা তার ভবিষ্যৎ আচরণের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এভাবে যথোপযুক্ত লালন পালনের প্রয়োজনীয়তা ও এর ফলপ্রসূতার উন্নয়ন এবং মানুষের স্বভাব ধ্বংসকারী বিষয়াদি হতে বিরত থাকার ব্যাপারে দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারটা সুস্পষ্ট হয়। সন্তান-সন্ততির উন্নত প্রতিপালন তাদের আচার-আচরণ উন্নয়নের চাবিকাঠি। আইনগত নিশ্চয়তা লাভের অভাব সত্ত্বেও বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত মৌলিক প্রতিশ্রুতিসমূহ রক্ষা করা ও তৎপ্রতি সম্মান প্রদর্শন নৈতিকতার দৃষ্টিতে অত্যাবশ্যক। ওয়াদা ভঙ্গ করা, সম্মান ও মর্যাদার নীতির পরিপন্থী বলে পরিগণিত।

বুজার জুমেহেরের মতে ঃ

"প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা মান-সম্মানের জন্য ক্ষতিকারক।"

যে ব্যক্তি চুক্তিভঙ্গ করার মাধ্যমে সত্য পথ হতে সরে যায় সে অন্যদের অন্তরে অগ্রহণযোগ্যতা ও অসন্তোষের বীজ বপন করে। শেষ পর্যন্ত ওয়াদা ভঙ্গকারীর কর্মসমূহ তার জন্য লজ্জা ও অপমানের গ্লানি বয়ে আনবে। অতঃপর সে আর কতকাল মিথ্যা অজুহাত ও স্ব-বিরোধিতার আড়ালে তার কৃতকর্মসমূহকে ঢাকা দিতে চেষ্টা করতে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তার পরিচিত লোকেরা ঠিকই বুঝে ফেলবে যে লোকটা বিপথগামী ও মুনাফিক বৈ আর কিছুই নয়।

সামাজিক বিরোধ সৃষ্টি ও সম্পর্ককে শিথিল করার ব্যাপারে ওয়াদা ভঙ্গ করা নিশ্চিতরূপে সর্বশ্রেষ্ঠ সক্রিয় উপাদান। নিঃসন্দেহে, পারস্পরিক বিরোধ ও অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন সমাজ, শেষ পর্যন্ত তার সামাজিক জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলবে, ফলে সমাজের লোকদের পক্ষে কারোর উপর আস্থা স্থাপন করা সম্ভব হবে না, এমনকি তাদের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দের

প্রতি আস্থাশীল হওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমন এক ধরনের লোক দেখা যায় যারা কেবল তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যাপারে অবহেলা করেই ক্ষান্ত হয় না বরং তারা তাদের বিশ্বাস ভঙ্গ করার কাজটাকে অধিকতর চালাকি ও দক্ষ পরিচালনা বলে আখ্যায়িত করে এবং এমনকি এজন্য অন্যদের কাছে নিজেদের কাজের বড়াই করে বেড়ায়।

সমাজে বসবাসকারী লোকদের জন্য পরস্পরের ওয়াদা পূরণ করা অত্যাবশ্যক; এটা সামাজিক সুখ, উন্নতি ও সফলতার বুনিয়াদ।

বর্ণিত আছে যে হাজ্জাজের আমলে একদল খারেজীকে বন্দী করা হয়েছিল এবং হাজ্জাজ তাদের মামলা পর্যালোচনা করে তাদেরকে ইচ্ছামত শাস্তি প্রদান করলো। যখন দলের সর্বশেষ লোকটি তার মামলার রায়ের প্রতিক্ষায় হাজ্জাজের সম্মুখে অপেক্ষা করছিল ঠিক তখনই নামাজের সময় হল। হাজ্জাজ নামাজের আজান শুনে বন্দীটিকে জনৈক মহান ব্যক্তির হেফাজতে রেখে পরবর্তী দিন সকালে তার কাছে পুনঃহাজির করার নির্দেশ দিয়ে নামাজে চলে গেল। মহৎ লোকটি বন্দীটিকে সঙ্গে নিয়ে রাজপ্রাসাদ হতে বিদায় নিল। যেতে যেতে বন্দীটি বলতে লাগলো, "আমি খারিজীদের অন্তর্ভুক্ত নই। আমি আমার নিরপরাধিতা প্রমাণের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ কামনা করি, কেননা আমি তাদের হাতে একজন নিরপরাধ জিম্মি। আপনি যদি আমাকে এ রাত্রটা আমার স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততিদের সাথে কাটাবার অনুমতি দিতেন তাহলে আমি তাদেরকে আমার অন্তিম অছিয়তটা জানিয়ে দিতাম। আমি আপনাকে এ প্রতিশ্রুতি প্রদান করছি যে, অত্যন্ত ভোরে মোরগ ডাকার পূর্বেই আমি আপনার কাছে ফিরে আসবো।"

এক মুহূর্তের নিরবতার পরই মহৎ লোকটি ঐ লোকটার সনির্বন্ধ অনুরোধে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন এবং তাকে ঐ রাত্রটা নিজ বাড়ীতে কাটাবার অনুমতি দিলেন। অল্পক্ষণ পরেই ঐ মহৎ লোক ভীত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর এ চিন্তার উদয় হল যে তাঁকে তাঁর এ কাজের জন্য হাজ্জাজের রোষানলে পড়তে হবে। সারা রাত ভদ্রলোক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে রইলেন এবং বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তাঁর অনুমতিক্রমে বাড়ীতে গমনকারী লোকটা তার ওয়াদা মোতাবেক এসে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে। এ মহৎ লোকটি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে চীৎকার করে এ কথা না বলে পারলেননাঃ

"তুমি কেন আমার দরজায় এলে?"

বন্দীটি জবাবে বললো, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করেছে সে তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির সঙ্গে আল্লাহকেও সাক্ষী করেছে, তাকে অবশ্যই প্রতিশ্রুতিপূর্ণ করতে হবে।"

মহৎ লোক বন্দীটিকে সঙ্গে করে রাজপ্রাসাদের দিকে রওয়ানা হলেন এবং পুরো ঘটনাটা হাজ্জাজকে খুলে বললেন, নির্মমতার জন্য খ্যাত হাজ্জাজের মত লোকও তার সততার কথা শুনে এতই বিগলিত হয়ে পড়লো যে তাকে বেকসুর খালাস দিয়ে দিল।

এখন মনে করুন যে একটা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও নিয়মবিধি লংঘন করে তার কর্তব্যে অবহেলা করলো। এহেন আচরণ ঐ প্রতিষ্ঠানের অবনতি বৈ আর কিছু আনবে না। কেননা, প্রতিষ্ঠানটি জনগণের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে।

একটা সমাজের লোকজনের মধ্যে পারস্পরিক আস্থাশীলতার বিনিময় ব্যতীত অধিকতর সুদৃঢ় উপাদান আর একটিও নেই। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিটি লোক তাদের প্রদত্ত মৌলিক প্রতিশ্রুতিকে সরকারী বা আইনানুগ চুক্তির মত অধিক গুরুত্ব না দেবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় হবে না, এমনকি কোন সমাজে আস্থাশীলতার প্রতিফলনও দেখা যাবে না। উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যবসায়ীকে সময়মত তার খদ্দেরদেরকে মাল পাঠাতে হবে, একজন ঋণগ্রহীতাকে মহাজনের টাকা যথাসময় পরিশোধ করতে হবে---ইত্যাদি। ঠিক এভাবে ঝগড়া বিবাদ পরিহার করা যাবে এবং জীবন তার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছাতে থাকবে।

একজন মানুষের জন্য এটা অত্যাবশ্যক যে, কোন প্রতিশ্রুতি প্রদানের পূর্বেই যেন সে তার অবস্থার পর্যালোচনা করে এবং ক্ষমতা বহির্ভূত ব্যাপারে কোন প্রতিশ্রুতি প্রদান হতে নিজেকে বিরত রাখে। ওয়াদা রক্ষা করা বা প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভবপর না হলেও সে তার জন্য দায়ী থাকবে। এভাবে একজন লোক যা কিছু বলে সে সম্পর্কে যদি সতর্ক না থাকে, তাকে এজন্য দোষী ও সমালোচনার সম্মুখীন হতে হবে।

বিশ্বাস ভঙ্গ করাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে

মানুষ হিসাবে পরিগণিত হওয়ার জন্য একজন মানুষকে অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত আচার-আচরণ করতে হবে। সমাজের সদস্যদের ঐক্যের উপরই মানব সমাজের সফলতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। অতএব, এটা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রতিটি মানুষ অবশ্যই সততা ও সত্যের মূলনীতি অনুসারে জীবন যাপন করবে এবং বিদ্বেষ ও অনৈক্য সৃষ্টিকারী কাজ হতে বিরত থাকার জন্য আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হবে। অধিকন্তু যদি প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতির পবিত্রতা মানুষের ঈমান ও নৈতিকতা হতে জন্মলাভ করে তবে তা প্রতিপালিত হওয়ার অধিকতর সম্ভাবনা থাকে।

প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করাকে ইসলাম এত বেশী ঘৃণা করে যে এজন্য প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে বেআইনী ও নৈতিকতা বিরোধী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমনকি তা যদি কোন অত্যাচারী জালিমের সাথে বা অন্য কাউকে না জানিয়েও সম্পাদিত হয়।

ইমাম বাকের (আঃ) বলেছেন ঃ এমন তিনটি বিষয় রয়েছে যার ব্যাপারে আল্লাহ লংঘন করার কোন অনুমতি দেননি। সত্যবাদী ও প্রতারক উভয়ের কাছে আমানত (সত্যের দাওয়াত) পৌছানো, সত্যবাদী ও প্রতারক উভয়ের সঙ্গে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করা এবং

পিতামাতা ন্যায়পরায়ণ হোক আর অন্যায় অত্যাচারী হোক, উভয় ক্ষেত্রে তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা।

– আল কাফী, ২য় খণ্ড ১৬২ পৃঃ।

কালামে পাক ঈমানদারদেরকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

"এবং এসব লোকেরা আমানত ও প্রতিশ্রুতিসমূহ রক্ষা করে"

–আল কোরআন, ২৩ঃ৮।

এছাড়াও আল্লাহর রাসূল (দঃ) প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাকে মুনাফেকীর চিহ্ন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

"চারটি বৈশিষ্ট্য যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তাদেরকে মুনাফিকদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে এগুলোর একটি পাওয়া যায় তবে উহা পরিহার না করা পর্যন্ত সে মুনাফেকী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। (চারটি বৈশিষ্ট্য

হচ্ছে)–

সে যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে;

যে তার প্রতিশ্রুতিসমূহ ভঙ্গ করে।

যে তার কসম ভঙ্গ করে এবং যখন সে কারোর সাথে ঝগড়া করে সে বিস্ফোরিত হয়।

– বিহারুল আনোয়ার, ১৫তম খণ্ড ২৩৪ পৃঃ।

ইমাম আলী (আঃ) মালিক আশতারকে নিম্নোক্ত (নির্দেশাবলী) লিখে পাঠিয়েছিলেন ঃ

"প্রজা সাধারণের প্রতি তোমার অনুগ্রহের বড়াই করা এবং শাসক হিসাবে প্রজা সাধারণকে তোমার বেশি বেশি সুনাম–সুখ্যাতি করা, এমন প্রতিশ্রুতি প্রদান যা শেষ পর্যন্ত বিশ্বাসঘাতকতায় পর্যবসিত হয়, এমন সব কাজ হতে বিরত হও। কেননা আত্মম্ভরিতা, দয়াশীলতাকে প্রতিহত করে। পক্ষপাতিত্ব সত্যতার আলো লুকিয়ে ফেলে এবং বিশ্বাসঘাতকতা আল্লাহ ও জনগণের অসন্তোষের কারণ হয়। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেনঃ

"আল্লাহর কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যাপার হচ্ছে এই যে, তোমরা এমন কথা বল যা তোমরা কর না"

মুস্তাদরাক আল ওয়াসায়িল, ২য় খণ্ড পৃঃ ৮৫।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ

"পূর্ণ করা (প্রতিশ্রুতিসমূহ) হচ্ছে সত্যবাদিতার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এবং আমি (সত্যবাদিতা) হতে অধিকতর ভাল কোন বর্ম চিনি না।"

গুরার আল হিকাম, পৃঃ ২২৮।

সন্তান–সন্ততির প্রতিপালনের উপর ইসলাম বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সন্তানদের প্রতি পিতামাতার নৈতিক কর্তব্যের কথা অত্যন্ত কঠোর ও ব্যাপক নির্দেশনার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এসব নীতিমালা অনুসারে পিতামাতা যদি তাদের সন্তানদের প্রতি কর্তব্য প্রতিপালন না করে, তারা সন্তান–সন্ততিদেরকে উৎকৃষ্ট নৈতিক আচরণের অনুসারী হওয়ার শিক্ষা দিতে পারবে না।

এটা এজন্য যে, কথার চাইতে কাজ অনেক বেশী কার্যকর। অতএব, আল্লাহর রাসূল (দঃ) সন্তানদের সঙ্গে কৃত মানুষের ওয়াদাসমূহ ভঙ্গ করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেনঃ

"একজন মানুষকে তার সন্তানদের সঙ্গে এমন কোন ওয়াদা করা উচিত নয়

যা সে প্রতিপালন করবে না।"

–নাহাজ আল ফাসাহা, পৃঃ ২০১।

ডাঃ আলিন্দি বলেছেন ঃ

ষোল বছর বয়স্ক একটা যুবককে আমার নিকট চিকিৎসার জন্য আনা হয়েছিল। সে প্রতিদিন ডাকাতি করতো। অনুসন্ধানের পর জানা গেল যে যুবকের বয়স যখন সাত অথবা আট বছর তখন তার পিতা এক অভিজাত ব্যক্তির বাসায় চাকরী করাকালীন সময় তার খেলনাটাঅভিজাত ব্যক্তির মেয়েটিকে দিয়ে দেয়। ঐ বালক অত্যন্ত পরিশ্রম করে এ খেলনাটা যোগাড় করেছিল এবং সেটা তার জীবনের চূড়ান্ত স্বপ্নের একটা প্রতীক ছিল। বালকটির পিতা তাকে আরেকটি খেলনা কিনে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা সে সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুলে গিয়েছিল। অসহায় বালকটি তার পিতার পকেট হতে একটা টুকরা ক্যান্ডি চুরি করে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করেছিল। একদিন পর ছেলেটা একটা ঘর ভেঙ্গে সেখান থেকে কিছু জিনিস চুরি করে। চিকিৎসার জন্য ছেলেটিকে আমার কাছে আনার পর আমি অতি সহজেই তার চিকিৎসা করেছি। সঠিকভাবে চিকিৎসা না হলে ছেলেটা সম্ভবতঃ এক বিপজ্জনক অপরাধীতে পরিণত হয়ে যেত। কিন্তু এখন তার একজন যুক্তিবাদী ও আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিতে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী।

– মা ওয়া ফারজানদাদে মা

কোন ব্যক্তি তার বন্ধুদের সাথে কি ধরনের আচরণ করবে তার প্রতি গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়ে ইমাম (আঃ) বলেছেন ঃ

"তুমি যদি কাউকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে পেতে চাও তার চাকর হয়ে যাও, তাকে খাটি বিশ্বাস ও প্রকৃত আন্তরিকতা প্রদর্শন কর।"

–গুরার আল হিকাম, ২২৩ পৃঃ।

"একমাত্র উৎকৃষ্ট গুণাবলী ও উন্নত নৈতিকতাসম্পন্ন লোকেরাই ভালবাসা ও সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য।"

রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ

ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশী সুখী যে দয়ালু লোকদের সাথে সাহচর্য করে, যে অন্যদের সাথে আচার–আচরণের সময় তাদের প্রতি জুলুম করে না। যখন সে কোন প্রতিজ্ঞা করে, তা ভঙ্গ করে না। সে এমন সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের সাহসিকতা উন্নত, যাদের ন্যায়পরায়ণতা সুস্পষ্ট। যাদের ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক অত্যাবশ্যক।

ডাঃ স্মাইল্‌সের মতে ঃ

"আপনি যখন উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন, আপনি তখন অত্যুচ্চস্তরের সংস্কৃতিসম্পন্ন লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করবেন, আপনার মধ্যে এক অজেয় শক্তি অনুভূত হবে যা আপনার চিন্তা-চেতনা ও আচার-আচরণকে মহিমান্বিত করে সর্বোৎকৃষ্ট পর্যায়ে উন্নীত করবে।

শক্তিশালী যুক্তিজ্ঞান, মহৎ গুণাবলী ও অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের সঙ্গে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠা করা এক অতি মূল্যবান ব্যাপার। কেননা, এ ধরনের সম্পর্ক অত্যন্ত উচ্চস্তরের আত্মিক শক্তি অর্জনের সুযোগ এনে দেয়, যথাযথ আচরণের পন্থা শেখায় এবং অন্যদের সম্পর্কে আমাদের মতামতকে ন্যায়পরায়ণতার পথে পরিচালিত করে।"

সহৃদয় ব্যক্তিদের সাথে সাহচর্যের ফলে দানশীলতা ও ধার্মিকতা শেখা যায়। কারণ উন্নত আচরণ আলোর মত যা তার চতুর্দিকে এবং সন্নিকটে যত কিছু রয়েছে সবকিছুকে আলোকিত করে।

উপসংহারে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাদের ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে দায়িত্বশীল ও সজাগ হতে হবে।

১৪

বিশ্বাসঘাতকতা

* পারস্পরিক আস্থাশীলতা ও কর্তব্য পালন
* বিশ্বাসঘাতকতা ও এর ক্ষতিকর দিক
* ধর্ম বিশ্বাসঘাতকতাকে ঘৃণা করে

পারস্পরিক আস্থাশীলতা ও কর্তব্য পালন

পারস্পরিক আস্থাশীলতা একটি সুস্থ ও ঐক্যবদ্ধ সমাজের টিকে থাকার এক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। একটি সমাজকে তখনই সুখী ও শান্তিপূর্ণ বিবেচনা করা হয় যখন সেই সমাজের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই যদি মানুষ তাদের কর্তব্যের সীমানা লংঘন করতে শুরু করে ও অন্যদের অধিকারের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করতে থাকে তাহলে সে সমাজ ক্রমেই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হতে থাকে।

মানব সম্প্রদায়ের যাবতীয় কাজ কর্ম সুসম্পাদনের জন্য বহুবিধ আইন রয়েছে। এসব আইনে প্রতিটি মানুষের কিছু কিছু ভূমিকা রয়েছে যা যুক্তি, স্বভাব ও ধর্মের কারণে সে মেনে চলতে বাধ্য। মানুষের জীবনকে ঐক্য ও বিশ্বস্ততার আলোকে সুস্পষ্ট করে তোলাই হচ্ছে এসব আইনের লক্ষ্য। এসব আইন না থাকলে মানুষ আল্লাহ ও সমাজের ঋণ পরিশোধ করার ব্যাপারে উপেক্ষা ও অবহেলা প্রদর্শন করতো। মানুষ একটি সামাজিক জীব হিসেবে তার পছন্দ-অপছন্দ নির্বিশেষে তাকে পরিবেশের সঙ্গে মিলে চলতে হচ্ছে। এভাবে তাকে অসংখ্য সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করতে হচ্ছে। এসব সম্পর্কের ফলে অধিকার ও কর্তব্যের এক পরম্পরা সৃষ্টি হয়। এসব অধিকার ও কর্তব্য সমাজকে বিচ্ছিন্নতা হতে রক্ষা করে। আর এসব সম্পর্কের কারণে, কোন আত্মীয়ের সাথে স্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট কোন সমস্যা সমাধানের পথ তৈরী হয়।

সামাজিক কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে উদ্ভূত অবশ্যাম্ভাবী ত্যাগ ও কষ্ট সত্ত্বেও মানুষের সুখ ও শান্তি বিধানের লক্ষ্যে অবশ্যই তা মেনে নিতে হবে। হ্যাঁ, মানুষ স্বভাবতঃই সুখের প্রত্যাশী এবং কোন প্রকার দুঃখ-কষ্ট না করেই তা পেতে চায়, কিন্তু তাকে অবশ্যই উপলব্ধি করা দরকার যে, সুখ কেবল তার সমশ্রেণীর মানুষের প্রতি সাধারণ কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে না। কোন এক সময় বলা হয়েছিলঃ

"একজন মানুষ তার কর্তব্য সম্পাদনের পুরস্কার হিসেবে সুখ পেয়ে থাকে" ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে সামাজিক সুখ যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ কেবল

তা–ই নয় বরং সামাজিক শান্তির উপরই ব্যক্তিগত সুখ সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল। এটাও সুস্পষ্ট যে, সামাজিক অধিকারের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, সামাজিক সুবিচারের মূলনীতি লংঘন সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। সুতরাং অন্যলোকদের জীবন ও স্বাধীনতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক লোকের অবশ্য কর্তব্য।

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যারা নিজেদেরকে অভ্যস্ত করে এবং আল্লাহ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য পালনকে যারা গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে কেবল তারাই অন্য লোকদের সুখ শান্তি বৃদ্ধি করে এবং তাদের কাজকর্মে সফলতা লাভে তাদেরকে সাহায্য করে। তারা অন্যদের আস্থা লাভ করে এবং জীবন যুদ্ধে জয়ী হয়।

ডাঃ এস, স্মাইলস বলেন ঃ

"কর্তব্য হচ্ছে মানুষের ঋণ। যে নিজেকে অন্যের দৃষ্টিতে, অসম্মানজনক নৈতিকতা বিবর্জিত মূল্যবোধ হতে বাঁচাতে চায় তাকে অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করতে হবে। তথাপি, কেবল কঠোর ও নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের দ্বারা ঐসব কাজ সম্পন্ন করা যেতে পারে। জীবনের সূচনা হতে শুরু করে দুনিয়া হতে বিদায় নেওয়ার প্রাক্কাল পর্যন্ত যে কর্তব্য মানুষকে ঘিরে রাখে তা পালন করা একটি অন্যতম বিষয়। ফলে একজন লোকের মধ্যে যত বেশী শক্তি ও যোগ্যতা থাকবে ততবেশী দায়িত্ব তাকে পালন করতে হবে। কেননা মানুষ একজন কেরানীর মত যার কর্তব্য হচ্ছে তার সমপর্যায়ের সন্তান–সন্ততিদের সেবা করা। ইনসাফের প্রতি ভালবাসাই হচ্ছে এ কর্তব্যের ভিত্তি এটা কেবল মাত্র আদর্শগত দায়িত্বই নয় বরং এটা হচ্ছে মানব জীবনের একটি মৌলিক প্রয়োজন। তথাপি উভয় বৈশিষ্ট্যই কথা ও আচরণের মাধ্যমে তার ফলাফল প্রকাশ করে।"

"জাতিসমূহের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা হচ্ছে দায়িত্ব সচেতনতা। একটি জাতির সফলতার আশা তখনই করা যায় যখন এর সদস্যদের মধ্যে মহান দায়িত্বশীলতাবোধবিরাজকরে।"

বিশ্বাসঘাতকতা ও এর ক্ষতিকর দিক

এ ব্যাপারে কারও কোন সন্দেহ নেই যে দুর্নীতির প্রসারকে বিপুলভাবে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে অনেক কারণ রয়েছে। সামাজিক নীচতা ও অনৈতিকতার বিস্তারের বহুবিধ কারণ সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হলে এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, এর মধ্যে সবচেয়ে

শক্তিশালী কারণ হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিরাজমান মন ও যুক্তির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা। এটাও দেখা যাবে যে সমাজের ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করা ও সামাজিক উৎসাহ-উদ্দীপনার ক্ষেত্রে ধ্বংসাত্মক পরিণতি সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিশ্বাসঘাতকতার ভূমিকা সবচেয়ে মারাত্মক।

বিশ্বাসঘাতকতা, মানুষের উৎসাহ-উদ্দীপনাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তার চিন্তা ও অনুভূতিকে বিভ্রান্তি ও ধংসের দিকে পরিচালিত করে। লোভ-লালসা বর্তমান থাকার কারণে এটা এক ভয়াবহ হুমকি হয়ে দেখা দেয়। ঈমান ও যুক্তিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হওয়ার কারণে কুচিন্তা তাকে নীচতা ও অপমানের পথে পরিচালিত করে। প্রত্যেক মানুষ অন্য মানুষের কাছ থেকে বিশ্বস্ততা আশা করে। একজন শ্রমিক বা একজন ব্যবসায়ী বিভিন্ন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা কিছু বস্তুগত স্বার্থ হাসিল করতে পারে। সম্ভবতঃ স্বল্প সময়ের জন্য সে তার ষড়যন্ত্র ও জালিয়াতি গোপন রাখতে পারে, কিন্তু একদিন গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যখন সত্য উদঘাটিত হয়ে পড়বে, তখন সে ব্যক্তি তার একমাত্র মূলধন বিশ্বস্ততা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে। এ ধরনের অপকর্মের ফলে তার সামাজিকমর্যাদাও কলঙ্কিত হয়। বিশ্বাসঘাতক লোকেরা অবিরত ভীতির মধ্যে বসবাস করে। তারা দুশ্চিন্তা ও অস্থিতিশীলতাকে ভয় করে এবং স্বভাবতঃই তারা হতাশাগ্রস্ত।

এটা একটি সর্ব স্বীকৃত সত্য যে, জনজীবনের শান্তি-শৃঙ্খলা সামাজিক নিরাপত্তার উপর নির্ভরশীল। যেহেতু সামাজিক পরিবেশ বিনষ্টকারী নিরাপত্তাহীনতা ও মারাত্মক দুশ্চিন্তা বিশ্বাসঘাতকতা হতে উৎপন্ন হয়, তাই এর ফলে সামাজিক জীবনের মূল বৈশিষ্ট্য হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে। বস্তুতঃপক্ষে, যেখানে বিশ্বাসঘাতকতা হতে কোন নিরাপত্তা নেই, সেখানে মুক্তি, ভ্রাতৃত্ব বা মানবতা বলে কিছুই থাকতে পারে না। বিশ্বাসঘাতকতা কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে সীমিত থাকে না। এটা মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে সম্প্রসারিত হয়ে পড়ে। কথা ও কাজ পরীক্ষা করা হলে এর সূক্ষ্ম ও সুস্পষ্ট সীমানা ধরা পড়ে এবং যখন কেউ এসব সীমানা হতে সামান্যতম বিপথগামী হয় সে বিশ্বস্ততা হারিয়ে ফেলে এবং একসময় মিথ্যা ও বিশ্বাসঘাতকতার ময়দানে প্রবেশ করে।

জানা গেছে যে জনৈক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তার সন্তানকে নিম্নোক্ত উপদেশ দিয়েছিলেনঃ

"হে বৎস! যেখানে মানুষ বিশ্বাসঘাতকতা ও আমানতের খেয়ানত করে ধনী ও ঐশ্বর্যশালী হয় সেখানে তুমি দরিদ্র ও বঞ্চিত হও। সুনাম, সুখ্যাতি ও পদবীর মোহে পড়োনা। হঠকারিতা ও সংগ্রামের মাধ্যমে মানুষকে উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হতে দাও। দুঃখ-কষ্ট ও বঞ্চনার মধ্যে বসবাস কর এবং মানুষকে দম্ভ দেখানো ও মানুষের কাছে নতি স্বীকার করে বার বার ধর্ণা দেওয়ার মাধ্যমে তাদের আশা-আকাঙ্খা পূরণ ও লক্ষ্যার্জন করতে দাও। এমনসব বড়লোকদের কাছেও যেওনা যাদের নৈকট্য লাভের জন্য অন্যেরা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তোমার চুল পেকে যাওয়া পর্যন্ত নিজেকে খোদাভীরুতা ও নৈতিকতার পোশাকে আচ্ছাদিত রাখ। বিষাদময় অপমান যেন কখনও তোমাকে কলঙ্কিত না করে। অতঃপর তোমার প্রভুর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং নিরপরাধী আত্মা ও আশাবাদী বিবেক সহ নিজেকে তার উদ্দেশ্যে সমর্পণ কর।"

সততা মানুষের জীবনের মূলধন। মানুষ সৎলোকদের উপর নির্ভর করে ও তাদের উপর আস্থা স্থাপন করে, ফলে সে নির্মল ও সম্মানীত জীবন যাপনে সক্ষম হয়। আমরা যখন সৎলোকের উপর নির্ভর করি তখন আমরা আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে সততার অনুসরণ করি এর মাধ্যমে আমরা শিক্ষণীয় অনেক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি এবং অনেক অভিজ্ঞতার অধিকারী হতে পারি। এভাবে আমরা নিরাপত্তার সাথে সুখী জীবন যাপনে সক্ষম হই।

ধর্ম বিশ্বাসঘাতকতাকে ঘৃণা করে

সর্বশক্তিমান আল্লাহ তার সৃষ্টদের জন্য যেসব বিধান তৈরী করেছেন তার উল্লেখ করতে গিয়ে তাকে "আমানত" হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন। মহিমান্বিত আল্লাহ কালামে পাকের অনেক জায়গায় বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়েছেন।

"জেনে শুনে আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করো না এবং তোমাদের পরস্পরের আমানতের সম্পর্কেও না।"

– আল কোরআন, ৮:২৭।

"আমানতকে তার হকদারের কাছে প্রত্যর্পণ করতে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশদিচ্ছেন।"

– আল কোরআন, ৪:৫৮।

আমীরুল মুমেনীন ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধরনের বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে ঘনিষ্ঠ ও ঈমানদারদেরকে (বন্ধুকে) প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণা করা ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা।'

– *গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৫০১।*

তিনি আরও বলেছেনঃ

"সবচেয়ে নিকৃষ্ট হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যে আমানতের ব্যাপারে আস্থাশীল নয় এবং বিশ্বাসঘাতকতা হতে বিরত থাকে না।"

– *গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৪৪৬।*

তিনি আরও বলেন "এবং বিশ্বাসঘাতকতা পরিহার কর, কেননা এটা হচ্ছে নিকৃষ্টতম পাপের কাজ। বিশ্বাসঘাতকরা অবশ্যই তাদের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দোজখের আগুনে জ্বলতে থাকবে।"

– *গুরার আল হিকাম, পৃঃ ১৫০।*

ইমাম সাদেক (আঃ) তার জনৈক সহচরকে উপদেশ দিয়েছেন। "দুটো বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমাদেরকে উপদেশ না দিয়ে আমাদের নিকট হতে বিদায় নিয়ো না ঃ "সত্য কথা বলার প্রতি সুদৃঢ়ভাবে অনুগত থেকো, আর ন্যায়পরায়ণ ও পাপী, উভয়ের কাছে আমানত পৌছে দেবে। কেননা ওরাই (এ দুটোই) হচ্ছে রিজ্কের চাবি।"

– *সফিনাহ আল বিহার, ১ম' খণ্ড, পৃঃ ৪১।*

ইসলাম সকল মানুষকে মহিমান্বিত আল্লাহর নির্দেশের ভিত্তিতে অর্পিত কর্তব্য সম্পাদনের মাধ্যমে দৃঢ় ও সুখী জীবন যাপনের আহ্বান জানিয়েছে। এটি মানুষের আমানতকে পৌছে দেওয়ার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ইমাম সাদেক (আঃ) বলেছেন ঃ

"বিশ্বস্ততার সাথে আমানত পৌছে দাও। ঐ মহান সত্তার শপথ–যিনি মোহাম্মদ (দঃ) কে একজন ন্যায়পরায়ণ নবী হিসাবে পাঠিয়েছেন–, এমনকি আমার পিতার হত্যাকারী যে তলোয়ার দিয়ে আমার পিতাকে হত্যা করেছে সে যদি ঐ তলোয়ার আমার কাছে আমানত রাখে তবুও আমি তা তাকে প্রত্যর্পণ করবো।"

– *আমালী আস সাদুক, পৃঃ ১৪৯।*

বিশ্বাসঘাতকের জন্য ইসলামে কোন ক্ষমা নেই। কোন কোন পরিস্থিতিতে মুসলমানের সম্পদ আত্মসাৎকারীদের জন্য ইসলাম হাত

কাটার বিধানও দিয়েছে। সামাজিক অধিকার ও জনগণের নিরাপত্তা রক্ষাকল্পে বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ইসলামে দণ্ডবিধি কঠোরভাবে কার্যকর করা হয়ে থাকে। এ ব্যবস্থা সমাজে দায়িত্ববোধকে গুরুত্ব দিয়ে ন্যায়পরায়ণ দল তৈরীতে সহায়তা করে। মানবসমাজের অধঃপতনের কারণ হওয়া ছাড়াও প্রতিটি মন্দ কাজের পরিণতি এ দুনিয়া ও আখরাতে মন্দই হয়ে থাকে।

রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেন ঃ

"যে ব্যক্তি খারাপ কাজ করে সে এ দুনিয়াতেই এর জন্যে শাস্তি ভোগ করবে।"

ডাঃ রোজকীনের মতে ঃ

"আমার জীবনের প্রতিটি ভুল আমার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে এবং আমাকে সুখ হতে বঞ্চিত করবে, এই ভুল আমাকে বুঝা এবং উপলব্ধি করা হতে অন্যদিকে সরিয়ে নিবে। এর বিপরীত ক্রমটাও সত্য, প্রতিটি প্রচেষ্টা, সত্য বা ধার্মিক কাজ আমাকে আমার যাবতীয় আশা ও লক্ষ্যার্জনে আমার সহযোগী হয় এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করে।"

গতি বিষয়ক তত্ত্বে বলা হয় যে ঃ প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি সমান প্রতিক্রিয়া আছে।

এই তত্ত্ব মানুষের আচার-আচরণগত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপারেও সমভাবে কার্যকর। ব্যক্তিও তার অনুসারী কিংবা তার সঙ্গী-সাথীদের উপর ভাল ও মন্দ কাজের সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।''

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"আমানত পৌঁছে দেয়া প্রকৃত ঈমানদারের লক্ষণ।"

- গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৪৫৩।

ঈমান হচ্ছে আত্মার প্রতিরক্ষামূলক অস্ত্র। এটা এমনসব উপাদানসমূহের মধ্যে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান যা মানুষের অন্তরের গভীরে পৌঁছে যায়, এটা সূক্ষ্ম শৃঙ্খলার সাথে মানুষের কাজ ও আচার-আচরণসমূহকে সংগঠিত করে। ঈমান মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক দায়িত্ববোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। সামাজিক দুর্নীতির প্রভাবের বিরুদ্ধে মানুষকে সতর্ক করে দেয় এবং সমাজকে সততা ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে পরিচালিত করে।

ঈমান দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতা প্রতিরোধ করে। এটা মাতাপিতাকে তাদের সন্তান-সন্ততিদের ছোটবেলার অভ্যাসসমূহ সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে, তাদের মধ্যকার প্রশংসনীয় গুণাবলীকে সমর্থন করে, তাদের সন্তানদের অন্তরে ঈমানকে কার্যকরী করে যাতে সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী জীবনে পরিণত করার পথ সুগম হয়।

ইমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ) বলেছেন ঃ

"যার অভিভাবকত্ব আপনাকে প্রদান করা হয়েছে তার আচার-আচরণ, এবং আল্লাহর প্রতি তার আনুগত্যের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য আপনি দায়িত্বশীল।

- *আল ওয়াফী, পৃঃ ১২৭।*

ডাঃ রেইমন্ড পীচ বলেছেন ঃ

সাধারণভাবে ধর্মীয় নিয়মকানুনের আনুগত্য করাই যথেষ্ট নয়। সন্তান-সন্ততিদের আচার-আচরণ ও ধর্মের প্রতি ঝোঁকের খুঁটিনাটি ব্যাপারে অবিরত ও সূক্ষ্ম দৃষ্টিদান করুন। অন্তরে ধর্মীয় বিশ্বাস কার্যকর করার জন্য যে বিষয়টি প্রয়োজন, তা হলো- তাদের ধর্মের মূলনীতি ও মহিমান্বিত প্রভাবসমূহ ছেলেমেয়েদের এমনসব নিষ্পাপ ও স্নেহশীল অন্তরে কার্যকরী করুন যা আপনার উপদেশ ও সতকর্তা মেনে চলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে। ধর্মের প্রতি অতিরিক্ত কড়াকড়ি না করেই এটা করুন। এটা তাদের ঈমান ও আস্থাকে রক্ষা করবে এবং তাদেরকে বিপথগামী ও ধ্বংস হওয়ার বিরুদ্ধে সতর্ক করবে।"

- *মাওয়া ফারজানদানেমা*

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"শস্যের জন্য যেমন বৃষ্টির প্রয়োজন তেমনি যুক্তিবাদী মানুষের জন্য প্রয়োজন নৈতিকতার।"

- *গুরার আল হিকাম, পৃঃ ২২৪।*

ডাঃ সি রবিন বলেছেন ঃ

কেউ এ সত্যের ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করতে পারে যে আচার-আচরণ হচ্ছে কথা ও চলার মত স্বাভাবিক কাজ। অন্যকথায় বলতে গেলে ওসব হচ্ছে প্রাথমিক বিষয়াদি যা আমরা জীবনে শিখে থাকি।

এটা জেনে রাখা দরকার যে, যুক্তি মানুষকে ভাল আচার-আচরণ শেখার ব্যাপারে সাহায্য করে না; বরং মানুষ সেসবের গুরুত্ব উপলব্ধি ও মানসিক পূর্ণতা অর্জনের পূর্বে আচার-আচরণ মানুষকে শাসন করে। অন্য কথায় বলতে

গেলে, আচার–আচরণ যুক্তির উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু মানুষের জন্য উপকারী। অতএব কোন মা যখন তার ছেলের আচার–আচরণ খারাপ বলতে গিয়ে বলেঃ, "সে আস্তে আস্তে বড় হতে হতে সঠিক জিনিষ শিখবে", তখন আমার খুব খারাপ লাগে। যদি ছেলেমেয়েরা ছোটবেলাতেই উত্তম আচার–আচরণে অভ্যস্ত না হয় তাহলে তারা সেগুলো যুক্তি ও জ্ঞানের দ্বারা অর্জন করতে সক্ষম হবে না। হ্যাঁ, আমরা বলতে পারি যে আচার–আচরণ হচ্ছে বাস্তব যুক্তি যা আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করে, সংক্ষিপ্ততম উপায়ে, আমাদের সামনে ন্যায়পরায়ণতার দরজা খুলে দেয়। এ বাস্তব যুক্তি আমাদেরকে অলসতা হতে রক্ষা করে যেমনিভাবে তা সীমাহীন লোভ–লালসার বিরুদ্ধে আমাদেরকে বাধা দেয়, যুক্তি আমাদেরকে শত্রুতা, ঘৃণা ও অসন্তোষের বিরুদ্ধে সতর্ক করে। অন্যকথায় বলতে গেলে, এটা আমাদের সামাজিক বানায় এবং অন্যদের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন ও স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেয়।

"ভাল আচার–আচরণ বিশিষ্ট লোকেরা কখনও সমাজ হতে বিচ্ছিন্ন হয় না, তারা সমাজের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এবং জনগণকে সত্যের প্রতি সচেতন হওয়ার কাজে সাহায্য করতে পারে।"

চী মীদানাম

বিশ্বাসঘাতকতা হ্রাসকল্পে কঠোর আইন প্রণয়ন ও জনগণকে এর ক্ষতিকর পরিণতি সম্পর্কে অবহিত করানোর জন্য অনেক প্রশাসনিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কিত কাজ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে তা আজ এক ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করেছে।

১৫

কৃপণতা

* সমবায় ও সহযোগিতা
* কৃপণতা অনুভূতিকে ধ্বংস করে
* এক দৃষ্টিতে কৃপণতা সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের অভিমত

সমবায় ও সহযোগিতাঃ

স্বভাবতঃই প্রতিটি মানুষের বিশেষ প্রতিভা রয়েছে এবং আমরা আমাদের প্রতিভাকে পূর্ণাঙ্গ ও ফলপ্রসূ করার জন্য অন্যদের সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। ব্যক্তি ও তার সমাজ উভয়ের অগ্রগতি ও সফলতার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা হচ্ছে এ প্রক্রিয়ার একটি ফলপ্রসূ উপাদান।

আল্লাহ মানুষকে সামাজিক জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অতএব, এটা মানুষের স্বভাব যে সে তার জীবনের সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য তার সমগোত্রীয় মানুষের সাথে অংশগ্রহণ করবে।

স্বাভাবিক ঘটনা প্রবাহ ও আশা আকাঙ্খা উভয়ই মানুষের জন্য অসংখ্য সমস্যা সৃষ্টি করে। ফলে তাকে বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, যেখানে তাকে অবিরত অন্যদের সাহায্য সহযোগিতার উপর নির্ভর করতে হয়। এ স্বাভাবিক আইনের দৃষ্টিতে মানুষের কর্তব্য একটা ব্যক্তির পর্যায়ে সীমিত না থেকে বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়ে যায়। এক ব্যক্তিকে সহযোগিতা প্রদান, তা যত ছোট হউক আর বড়ই হউক, সামাজিক উন্নতির জন্য তা অত্যন্ত কল্যাণকর এবং এটা তার চাহিদাসমূহের একটি পূরণ করে।

যেহেতু অনেক দিক থেকে সমাজের অবস্থা সমাজের সদস্যদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাই আমরা সামাজিক কাঠামোকে মানব দেহের সাথে তুলনা করতে পারি। মানব দেহ যেভাবে বিভিন্ন অঙ্গ বা প্রত্যঙ্গ নিয়ে গঠিত যা স্বাভাবিকভাবে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ও সম্পর্কিত যার উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভরশীল, সমাজও ঠিক তেমনিভাবে তার বিভিন্ন অংশকে নিয়ে একটা পরিপূর্ণ রূপ লাভ করে। এভাবে, সমাজের প্রতিটি সদস্যকে তার গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক কর্তব্য জেনে নিয়ে সাধ্যমত তা প্রতিপালন করতে হবে যাতে সমাজের উন্নতি সাধিত হয়। সমাজের লোকদেরকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে তাদের সকলের বস্তুগত ও আত্মিক প্রতিভার উন্মেষ ঘটাতে হবে এবং এসবকে তাদের সমাজের কাজে নিয়োগ করতে হবে, প্রতিনিয়ত এ কথা মনে রেখে তাকে যোগ্যতার অবকাঠামো ও সামাজিক নিয়মের মধ্যে রাখতে হবে। তথাপি

সমাজের সমষ্টিগত শান্তি, নিরাপত্তা এবং দুঃখ-কষ্টকে পরাভূত করার নিশ্চয়তা তখনই অর্জিত হতে পারে যদি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপারে সহযোগিতার মনোভাব বর্তমান থাকে। একমাত্র সহযোগিতার ফলেই সমাজ জীবনের গাড়ী অগ্রগতিও চরম উৎকর্ষের পথে এগিয়ে যায় এবং যাবতীয় কাজকর্ম ফলবতী হয়ে জীবন মধুর হয়।

কৃপণতা অনুভূতিকে ধ্বংস করেঃ

কতিপয় অনুভূতি রয়েছে, যে সবের জন্ম হয় মানুষের অন্তরের গভীরে, এসব অনুভূতির ফল অত্যন্ত মূল্যবান হওয়ায়, এগুলো হচ্ছে মানুষের পারস্পরিক সহযোগিতার মূল উৎস। এসব অনুভূতি অভাবী মানুষকে সহযোগিতা দানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, যা তার বিশেষ আধ্যাত্মিক ও উৎকৃষ্ট গুণাবলীর অন্তর্ভূক্ত। এসব হচ্ছে এমন সব অনুভূতি যা অন্য মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখে তার মধ্যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে, নিজেদের ব্যক্তিগত অভাব অসুবিধা উপেক্ষা করে অন্যদের দুঃখ যন্ত্রণা লাঘব করার জন্য সর্বাধিক কোরবাণী করার জন্য তাকে উদ্বুদ্ধ করে। কোন পুরস্কার লাভের আশা ছাড়াই মানুষ এসব করে।

ডাঃ কার্ল বলেছেনঃ

যে কোন ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জন করতে হলে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। শ্রেষ্ঠত্ব, নিষ্ঠা ও অন্তরের পবিত্রতা অর্জন করতে হলে অবশ্যই একজন লোককে তার দেশ বা বৃহত্তর লক্ষ্যার্জনের জন্য তার নিজস্ব বস্তুগত স্বার্থ ও সুনাম-সুখ্যাতিকে উৎসর্গ করতে হবে। যারা আল্লাহকে প্রকৃত অর্থে বিশ্বাস করে এবং ন্যায়পরায়ণতার সৌন্দর্য্যকে বুঝতে পারে, আত্মত্যাগ তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। এরা এমনসব লোক যারা সমগ্র বিশ্বে ইনসাফ, ভালবাসা ও ঐক্য কায়েমের লক্ষ্যে তাদের আত্মাকে উৎসর্গ করে।

যুক্তি একাই মানুষকে পূর্ণতায় পৌছায় না। ভালবাসা এবং স্নেহপরায়ণতাও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটা সত্য, কেননা আত্মা তার অনুভূতির সাহায্যে অধিকতর কার্যকরীভাবে চিন্তা ও যুক্তির কাজকে অতিক্রম করে ফেলে। "যে কেউ মেঘকে আলোর শীর্ষের দিকে সরিয়ে দিয়ে সত্যের এ পথে এগিয়ে যেতে পারে,"।

এমন একটি বৈশিষ্ট্য কৃপণতা যা মানুষের অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকতে পারে, এবং তার অনুভূতিসমূহের শিকড়কে নষ্ট করে দিতে পারে, এটি মানুষের স্বভাবকে এমনিভাবে তৈরী করে যাতে তার মধ্য হতে নৈতিকতার অবসান ঘটে।

কৃপণতা এমন একটি বদস্বভাব যা সর্বদা মানুষের সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের সহিত সংশ্লিষ্ট। এটা মানুষকে সংকীর্ণমনতার দিকে পরিচালিত করা ছাড়াও তাকে অপমান ও গণঅসন্তোষের শিকারে পরিণত করে। কার্পণ্য ও স্বার্থপরতার কারণে কৃপণের মন সব সময় সম্পদ ও বস্তুবাদের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। অতএব, তারা চিন্তার স্বাধীনতা হতে বঞ্চিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত জীবনের বাস্তবতা, নৈতিক ও আত্মিক মূল্যবোধ হতেও সরে পড়ে। কৃপণ লোক এ সত্যকে সবসময় উপেক্ষা করে চলে যে সম্পদ হচ্ছে মানুষের বস্তুগত প্রয়োজন পূর্ণ করার একটা উপায় বা অবলম্বন মাত্র। মানুষের মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করার পর জীবনের শান্তি, ঐক্য বা দুশ্চিন্তা দূরীকরণের উপায় এবং মনস্তাত্বিক যন্ত্রণা হতে উপশম লাভের ক্ষেত্রে সম্পদের কোন ভূমিকা নেই।

কল্পিত দারিদ্র্যের ভয় এমন একটা রোগ যা কৃপণের মনকে সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখে। এ কারণে একজন কৃপণ লোক কখনও বিষণ্নতা ও দুশ্চিন্তামুক্ত হতে পারে না। ধন-সম্পদ থাকা সত্বেও একজন কৃপণ লোক সবসময় সুখ-শান্তি হতে বঞ্চিত।

জনৈক ব্রিটিশ পণ্ডিতের মতেঃ

"কিছু লোক ধন-সম্পদের এতই আশা করে থাকে যেন আশা করার মত আর কিছুই নেই। এমন কিছু লোকও রয়েছে যারা নিজেদেরকে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে এবং ঘুমায়, কেননা তাদের জীবনের প্রাথমিক লক্ষ হচ্ছে ধন-সম্পদ অর্জন করা। এ ধরনের লোকেরা তাদেরকে সত্য হতে বঞ্চিত করে কেননা তারা ধন-সম্পদকে উপলক্ষ্য হিসাবে গণ্য না করে লক্ষ্য হিসাবে কল্পনা করে থাকে।"

"সম্পদ হচ্ছে একটা সেতুর মত যা আমাদেরকে ধ্বংস হতে রক্ষা করে। কতই না ভ্রান্ত ওসব লোক যারা এর উদ্দেশ্যকে উপেক্ষা করে সেতুটাকে শক্তিশালী করার জন্য জীবনটা ব্যয় করে। টাকার জন্য আমাদের জীবনটাকে উৎসর্গ না করে জীবনের জন্য টাকাকে উৎসর্গ করা উচিৎ। অনেক লোক তাদের

সমগ্র জীবনটাকে টাকার সন্ধানে অতিবাহিত করে এবং শেষ পর্যন্ত টাকা পেয়েও যায়। টাকা ব্যয় করার জন্য তাদের আরেকটা জীবনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে ..... কিন্তু যে জীবনের আশা তারা করে থাকে তা আর কখনও ফিরে আসবে না।"

ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে কৃপণতার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে হয়। অধিকাংশ সম্পদশালী লোক কৃপণ। একটা জরীপ চালানো হলে দেখা যাবে যে দরিদ্রদের সাহায্য সাধারণতঃ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরাই করে থাকে, ধনীরা নয়। কৃপণ ধনী ব্যক্তি, যারা হতাশা ও গরীবদের ক্রোধের শিকারে পরিণত হয়, তারা কতিপয় সামাজিক দুর্নীতির বিষয় হয়। গরীবদের উপর যে চাপ পড়ে এবং পরবর্তীতে তাদের যে মনস্তাত্বিক জটিলতা দেখা দেয় এসবই হচ্ছে দুর্নীতির প্রসার ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারণ। অপরাধ ও অনৈক্য সৃষ্টির ব্যাপারে এ সমস্যার যে ধ্বংসাত্বক ভূমিকা রয়েছে এটা কেহই অস্বীকার করে না। এমন অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি রয়েছে যাদের সম্পদ আহরণের উদগ্র লালসার কারণে তারা মানবতার সীমা লংঘন করে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যেখানে তারা তাদের নির্যাতনের সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রদেরকে তাদের অধিকার হতে বঞ্চিত করতে থাকে। এসব জালেমরা, নিশ্চয়ই, তাদের মনের মধ্যকার মানবিক আলো হারিয়ে ফেলেছে। অপরপক্ষে, আমাদের মধ্যে মহত্ব নামক ন্যায়পরায়ণতার মানবিক উপাদান রয়েছে। এটা হচ্ছে মূল মানবীয় অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ও দৃঢ় চিন্তার লক্ষণ। ভাল বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে মহানুভবতা হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট।

সকল গুণাবলীর মধ্যে মহানুভবতার একটা সর্বোৎকৃষ্ট মর্যাদা রয়েছে। হাতেম তাই এর সুপরিচিত মহানুভবতার কারণে শত শত বছর ধরে পৃথিবীর দেশে দেশে তার খ্যাতি সমুজ্জল হয়ে আছে।

এটা সুস্পষ্ট যে মহত্ব কেবল তখনই প্রশংসনীয় হতে পারে যখন তা দরিদ্রদের দুঃখ-কষ্ট হ্রাস করাকে আল্লাহর নৈকট্যলাভের একমাত্র লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে।

মহানুভবতার ক্ষেত্রে সুনাম-সুখ্যাতি অর্জন কিংবা দাম্ভিকতার কোন ভূমিকা থাকা উচিত নয়।

কৃপণতা সম্পর্কে নেতৃবৃন্দের মতামতের প্রতি এক পলক দৃষ্টিঃ

ইসলাম মানব সমাজের সর্বদিকের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এটি ধনী দরিদ্র্যের মধ্যে দয়া ও ভালবাসার সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বেশী পরিমাণে দান ও কোরবানীর পরামর্শ দিয়েছে। ইসলাম অনৈতিকতা ও কৃপণতার প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ইসলাম মুসলমানদের মধ্যকার পারস্পরিক মানবিক অনুভূতি ও সহযোগিতার মনোভাবকে কার্যকর করার মাধ্যমে ইসলামী সমাজে ভালবাসার উৎসকে গভীর করে তুলতে চায়। গরীব মুসলমানদের অবস্থার প্রতি ধনী মুসলমানদের উদাসীনতাকে ইসলাম নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। ইসলাম ধনী ব্যক্তিদের উপর আরোপিত বঞ্চিতদের পাওনা প্রদানে বাধা প্রদানকারী কৃপণ স্বভাবকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

আল্লাহর রাসূল (দঃ) বলেছেনঃ

"ইসলাম কৃপণতা ছাড়া অন্য কিছুতেই এত বেশী ক্ষুব্ধ হয়না"

– নাহযাল ফাসাহা পৃঃ ৫৪৯

কৃপণতা হচ্ছে এমন একটা খারাপ বৈশেষ্ট্য যা কোন ব্যক্তিকে সুখ শান্তি হতে বঞ্চিত করে দুঃখ যন্ত্রণার মধ্যে ফেলে দেয়। আল্লাহর রাছুল (দঃ) আরও বলেছেনঃ

"কৃপণ ব্যক্তিরা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী অসামাজিক।"

– নাহযাল ফাসাহা পৃঃ ৮১

জনৈক পাশ্চত্য পন্ডিত এ সম্পর্কে বলেছেনঃ

যে ব্যক্তির মধ্যে ভালবাসা নেই এবং তা অন্বেষণ করে (এমনকি অবচেতনভাবে) সে সর্বদা নিজেকে দোষী করে এবং কখনও এজন্য খুশী নয়; এ কারণে আমাদের অধিকাংশ লোক অন্যদের জীবনকে আকুলভাবে আকাঙ্খা করে এবং তাদের প্রতি মারাত্মকভাবে ঈর্ষান্বিত। এ মনোভাব ধনীদের প্রতি গরীবদের মধ্যেই কেবল সীমিত নয়; পরশ্রীকাতরতা আমাদের সবাইকে প্রভাবিত করে কেননা প্রতিটি মানুষের জীবনে এমন একটা উপাদান রয়েছে যে জন্য সে দুর্বলতা অনুভব করে উদাহরণ স্বরূপ, একজন লোক যার একজন স্ত্রী,

সন্তান সন্ততি ও ভাল অবস্থা রয়েছে সে অন্য এমনসব লোক যাদের এসব কিছুই নেই তাদের কেউ ঈর্ষার দৃষ্টিতে দেখে, উদাহরণ স্বরূপ, তাদের পোষাককে তাদের উচ্চতর মর্যাদার প্রতীক মনে করে অথবা একজন লোক অন্য একজন লোককে অপেক্ষাকৃত ভাল পোষাক পরিহিত দেখে মনে করে যে লোকটা তার চাইতে অধিক সুখী কেননা তার অপেক্ষাকৃত ভাল পোষাক না থাকার কারণে সে অপেক্ষাকৃত বেশী সুখী হতে পারেনি।"

– রাভান কাভী

রাছুলুল্লাহ (দঃ) এমন সব লোকদের জন্য আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেন যারা সম্পদকে সম্পদের জন্য ভালবাসেনা এবং তারা তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত (সম্পদ)কে বঞ্চিতদের জন্য খরচ করতো। তিনি বলেছেনঃ

"আল্লাহ তাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ করুন যারা অপ্রয়োজনীয় কথা হতে নিজেকে সংযত রাখে এবং নিজেদের প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ ব্যয় করে ফেলে।"

– নাহযাল ফাসাহা পৃঃ ৮১।

নবী (দঃ) আরও বলেছেনঃ

"কৃপণতা পরিহার কর, কেননা কৃপণতা এমন লোক সৃষ্টি করেছে যারা তোমাকে ধ্বংস করার জন্য অগ্রসর হয়েছে এবং নিজেদেরকে রক্ত পাতের দিকে ও পবিত্রতা লংঘন করার দিকে পরিচালিত করেছে।"

– নাহযাল ফাসাহা পৃঃ ৮

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেনঃ

"আমি দুর্দশাগ্রস্থ কৃপণদের প্রতি বিস্ময়াবিভূত, কেননা তারা দারিদ্র ঘটায়, যে দারিদ্র্য হতে দ্রুত বেরিয়ে আসার জন্য তারা পালাচ্ছে এবং যে সম্পদ তারা চেয়েছিল তা তারা হারায়। এ দুনিয়ার জীবনে তারা দারিদ্রের জীবন যাপন করে এবং পরবর্তীকালে ধনীদের অন্তর্ভূক্ত হিসাবে তাদের বিচার করা হবে।

– গুরার আল হিকাম পৃঃ ৪৯৭

জনৈকি বৃটিশ পন্ডিত বলেছেনঃ

"কিছু লোক ধনী বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা দরিদ্র। তাদের অর্থ রয়েছে কিন্তু তা তারা তাদের নিজেদের জন্যও খরচ করতে পারে না। তাদের ঐশ্বর্য তাদের গলার চতুর্দিকে স্বর্ণের চেইনের মত লাগানো থাকে যা হতে তারা যন্ত্রণা ও নির্যাতন ব্যতীত আর কিছুই পায়না। এখানে অর্থ হয় পীড়াদায়ক আর সম্পদ হয় একটা দুর্যোগ।"

– দার আগুশী খোশবখতী

এমনকি কৃপণের ছেলেমেয়েরাও তাদের পিতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। এ সত্যটা ইমাম আলী (আঃ) এভাবে সুস্পষ্ট করেছেনঃ

"একজন লোকের মহানুভবতা, তার শত্রুদেরকে তাকে ভালবাসতে শিখায় এবং তার কৃপণতা তার সন্তানদেরকে তাকে ঘৃণা করতে শিখায়।"

– *গুরার আল হিকাম পৃঃ ৩৬৮*

তিনি আরও বলেছেনঃ

"লোভ ও কার্পণ্যকে সন্দেহ ও আস্থাহীনতার উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে।"

– *গুরার আল হিকাম পৃঃ ৪৮৮*

ডাঃ ফার্মার বলেছেনঃ

"মহত্ব ও আত্মবিশ্বাস যা ঐক্য এবং নিজের ও অন্যদের প্রতি আস্থাশীলতার মনোভাব হতে জন্ম লাভ করে, যখন একই ব্যক্তির মধ্যে দুটোই এক সঙ্গে দেখা যায়, সামাজিক আচার-আচরণ পূর্ণতা লাভ করে এবং সামাজিক জীবন পুরোপুরিভাবে উপভোগ্য হয়। অপর পক্ষে যখন এসব গুণাবলীর অভাব পরিলক্ষিত হয়, সামাজিক আচার-আচরণে সংহতি অসম্ভব, ফলে একজন ব্যক্তি সামাজিক জীবন উপভোগ করতে অক্ষম হয়।"

– *রাজ খোশ বাখ্‌তী*

ইমাম মুছা আল কাজিম (আঃ) মহানুভবতার মূল্য এ কথা দিয়ে বুঝিয়েছেনঃ

"মহানুভব ও উত্তম আচরণের অধিকারী লোকেরা সব সময় আল্লাহর নিরাপত্তার অধীন থাকে। আল্লাহ তাদেরকে পরিহার করেন না বরং তাদেরকে বেহেশতের দিকে পরিচালিত করেন। মহিমান্বিত আল্লাহ যে সব নবী বা উত্তরাধিকারী পাঠিয়েছেন তারা সকলে মহানুভব ছিলেন। এমন একজন ন্যায়পরায়ণ লোক কখনও দেখা যায়নি যিনি মহানুভব ছিলেন না। মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত, আমার পিতা আমাকে মহানুভব হওয়ার শিক্ষা দিয়ে গেছেন।"

– *ফুরু আল কাফী ৪র্থ খন্ড পৃঃ ৩৮*

একদা যখন ইমাম আলী (আঃ) এক যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন তখন তাঁর প্রতিপক্ষ যার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ করছিলেন সে তাঁর কাছে তাঁর তরবারিটা চাইলো। ইমাম আলী (আঃ) লোকটাকে তরবারিটা দিয়ে দিলেন। এতে লোকটা বিস্ময়াবিভূত হয়ে পড়লো। ইমাম আলী (আঃ) অতঃপর বললেন, কৃপণ লোকদের আদর্শিক পথ নির্দেশের আশু প্রয়োজন রয়েছে এবং যদি এধরনের পথ নির্দেশনা হতে বঞ্চিত থেকে যায় তবে তারা বস্তুবাদ বঞ্চনা ও দুঃখ দুর্দশার ফাঁদে থেকে যাবে।

১৬

লোভ

* জীবনের চাহিদা সম্পর্কে
* একজন লোভী মানুষ কখনও সুখী হতে পারে না
* ইসলামে সঠিক বন্টন

জীবনের চাহিদা সম্পর্কে

আমাদের জীবন কতগুলো নির্দিষ্ট চাহিদার মধ্যে পরিবেষ্টিত যা আমাদের জন্মের দিন হতে আমাদেরকে শক্তভাবে ধরে রেখেছে। এসব চাহিদার মধ্যে খাদ্য, বস্ত্র ও বিশ্রাম হচ্ছে মৌলিক। আমাদের দৈহিক রক্ষণাবেক্ষণ এসবের উপর নির্ভরশীল। এসব প্রয়োজন সহজাত এবং স্থায়ীভাবে পূরণ করা যায় না। এগুলো ছাড়া মানুষের অন্যান্য সব ধরনের প্রয়োজন অত্যাবশ্যকীয় নয় এবং সেগুলো পরিবর্তনশীল। এ চাহিদাগুলোকে কিছুতেই পুরোপুরি পূরণ করা সম্ভব নয়। সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনানুভূতি মানুষকে টাকার সন্ধানে নিয়োজিত করে এবং অতিরিক্ত টাকা পাওয়ার পথে বিরাজমান সকল সমস্যা ও বাঁধাবিপত্তির বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা যোগায় কেননা অধিকাংশ লোকের কাছে সম্পদই হচ্ছে জীবনের সৌন্দর্য।

তবে এটা স্বাভাবিক যে মানুষের অবস্থার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন লোক যদি দারিদ্র ও দুর্বলতার দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে তাহলে সে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তার দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য জীবিকার সন্ধানে লেগে যায়। একজন লোক যখন সম্পদের অধিকারী হয় তখন সে আত্মাভিমান ও গোঁড়ামী দ্বারা এতই আক্রান্ত হয়ে পড়ে যাতে মনে হয় যে অর্থের সঙ্গে তার পরবর্তী বৈশিষ্ট্যসমূহের সঙ্গে একটিপ্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটি লোক যদি সম্পদশালী হয়ে ও তার নিজের জন্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে না পারে তখন সে আত্মাভিমান ও অহঙ্কারের কারণে এতই উন্মত্ত হয়ে পড়ে যে অন্যান্য অসৎ কার্যাবলীর প্রেরণার ফলে তার মনে এক বিরামহীন যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে প্রতিটি জীবনের ধরন বিভিন্ন হয়ে থাকে। কেননা মানুষের যুক্তিক্ষমতা বিভিন্ন। উদারহণস্বরূপ, এমন অনেক লোক রয়েছে যারা সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেনি অথবা নিরাপত্তা বা নিরাপত্তাহীনতার পার্থক্য আলাদা করে বাছাই করার মত পর্যায়ে উপনীত হতে পারেনি। জীবনের বাস্তবতার উপলব্ধি অর্জন এবং সুখের পর্যায়ে উপনীত হতে হলে, মানুষের অস্তিত্ব রহস্যের নির্ভুল জ্ঞান

লাভ করতে হবে বিশেষ করে নিজের 'আমিত্বকে' চেনার রহস্য জানতে হবে, যা একমাত্র যুক্তি ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে।

মানুষ তার সুখের খোঁজে যাত্রা শুরু করার পূর্বে অবশ্যই তাকে জেনে নিতে হবে কেন সে এ দুনিয়ায় এসেছে।

একজন মানুষকে তার স্বাভাবিক ও আত্মিক চাহিদানুযায়ী অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই এমন একটি কর্মপদ্ধতি বাছাই করে নিতে হবে যার মধ্যে থাকবে না এমন কোন দুর্বলতা, যা তার আত্মাকে তার ব্যক্তিত্বের বাস্তব অগ্রগতি হতে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। তথাপি, সুখ ও সফলতা বলতে এটা বুঝায় না যে, একটিলোক বস্তুগত সম্পদকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে অবিরত অন্যদের চাইতে অগ্রগামী থাকবে। কেননা বস্তুগত সম্পদ মানব জীবনের প্রধান লক্ষ্য নয়, মানুষকে বস্তুগত সুবিধা অর্জন করতে গিয়ে কিছুতেই খোদাভীরুতা ও নৈতিকতার সীমা লংঘন করা উচিৎ নয়।

ডাঃ কার্লের মতেঃ "উদার বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পরিবেশের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থ অতর্কিতে আমাদের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। আমাদের দৃষ্টিতে ধন সম্পদ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আছে। এখন নগদ অর্থ দিয়ে সফলতা পরিমাপ করা হয়। অর্থকে অগ্রাধিকার প্রদানকারী মানুষের পক্ষে কিছুতেই নৈতিকতার প্রতি আগ্রহী হওয়া সম্ভব নয়, কারণ নৈতিকতা জীবনের বিধি-বিধানের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য দাবী করে। এমন একজন ব্যক্তি জীবনের প্রাকৃতিক আইনসমূহ মেনে চলতে পারে না, যে তার দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামে অর্থনৈতিক ব্যাপার ছাড়া আর সব বিষয়কে বাদ দিয়ে রেখেছে। নিঃসন্দেহে, নৈতিকতা আমাদের জীবনকে সত্যের পথে পরিচালিত করে এবং আমাদের সমস্ত দৈহিক ও মনস্তাত্ত্বিক কাজকর্মকে মানবীয় গঠনপ্রণালী অনুসারে সংগঠিত করে। নৈতিক উৎকর্ষকে সঠিকভাবে সক্রিয় শক্তিশালী ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। নৈতিকতাহীনতা ছাড়া আর অন্য কোন কারণে সমাজে অনৈক্যের জন্ম হতে পারে না।"

আধ্যাত্মিক সফলতা অর্জনই হতে হবে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য। মানুষের উপার্জনকারী বিষয়সমূহের মধ্যে চিন্তা বা অনুভূতিতে অত্যুচ্চস্তরের সংস্কৃতিসম্পন্ন হওয়াটাই সবচাইতে মূল্যবান ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। আধ্যাত্মিকতার ঐশ্বর্যের মধ্যে যে তার আত্মাকে ডুবিয়ে রাখতে সক্ষম হয় তার এ জগতের খুব কমই প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সে

আধ্যাত্মিকতার ছায়াতলে অধিক পরিতৃপ্তি লাভ করে যা অবশিষ্ট জীবনের জন্য তার সঙ্গী হয়ে যায়। এ ধরনের লোক তার আত্মিক সম্পদকে কোন অবস্থাতেই পার্থিব সম্পদের সঙ্গে বিনিময় করতে রাজী হবে না।

একজন লোভী মানুষ কখনও সুখী হতে পারে নাঃ

অন্যের মালিকানাধীন জিনিসপত্রের প্রতি লোভ মানুষের মনে এমন একটিমনস্তাত্ত্বিক অবস্থা সৃষ্টি করে যা তাকে খুব বেশী বস্তুবাদিতার পেছনে ধাওয়া করতে বাধ্য করে। ফলে তার মন একমাত্র বস্তুবাদী স্বার্থকে কেন্দ্র করে সর্বদা তার চতুর্দিকে আবর্তিত হতে থাকে।

লাগামহীন লোভ হতে বস্তুবাদী প্রবণতা জন্মলাভ করে। লোভ মানবজীবনে কল্পিত সুখের বাসনা সৃষ্টি করে তাই একে মানব জীবনে দুঃখ বয়ে আনার একটিকারণ হিসেবে গণ্য করা হয়। ফলে মানুষ তার জন্য সম্পদ আহরণের উদ্দেশ্যে সবকিছু উপেক্ষা করে এবং সম্পদের অভাবের অনুভূতি মানুষের আত্মার গভীরে প্রবেশ করে শিকড় বিস্তার না করা পর্যন্ত সে সম্পদের সন্ধানে তার নৈতিক গুণাবলীকে বিসর্জন দিতে থাকে।

ডাঃ শফেন হৌর বলেছেন ঃ

"ধনসম্পদ আহরণের প্রতি মানুষের ঝোঁক কতখানি তা নির্ণয় করা বরং কঠিন। কেননা আত্মতৃপ্তি লাভের ব্যাপারে মানুষে মানুষে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। এমন কোন সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি নেই যা দিয়ে মানুষের চাহিদা নির্ণয় করা যেতে পারে। কোন কোন লোক সামান্য পরিমাণ সম্পদ লাভেই সন্তুষ্ট হয় এবং তা দিয়ে তার চাহিদাসমূহ পূরণ করে। আবার এমন কিছু লোকও রয়েছে যাদের পর্যাপ্ত সম্পদ (যা তাদের প্রয়োজনের অনেক বেশী) থাকা সত্ত্বেও তারা অভাব অনটনের অভিযোগ করে। অতএব, প্রতিটি মানুষের চাহিদার একটিসুনির্দিষ্ট সীমানা রয়েছে যাকে সম্মুখে রেখে সে তার আশা আকাঙ্খা পূরণ করে। তথাপি মানুষ যখন দুঃখ-কষ্টের সম্মুখীন হয় তখন সে অভিযোগ করে এবং হতাশাগ্রস্ত হয়।"

"ধনীদের সম্পদের প্রাচুর্য গরীবদের প্রতারিত করে না, সম্পদ লবণের

পানির মত, একে যতই পান করা যাবে ততই পান করার ইচ্ছা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।"

প্রকৃতপক্ষে, লোভী ব্যক্তি সমগ্র দুনিয়ার সম্পদ পেলেও কখনও সন্তুষ্ট হবে না, যেমনিভাবে জ্বলন্ত আগুনে যত লাকড়িই দেওয়া হোক না কেন তা সবই পুড়ে যাবে।

লোভ যখন একটিজাতিকে পেয়ে বসে, তখন তা ঐ জাতির গোটা সামাজিক জীবনকে দৃঢ়তা, নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের পরিবর্তে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ ও অনৈক্যে পরিবর্তিত করে। স্বভাবতঃই এ ধরনের সমাজে নৈতিকতা ও আত্মিক উন্নতির কোন সুযোগ থাকে না।

এদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখা দরকার যে, অর্থপূজা ও পার্থিব উন্নতি লাভের ইচ্ছা এ দু'য়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। এজন্য এ দুটো দিকের মধ্যে একটিপার্থক্যরেখা টানা অত্যাবশ্যক। কেননা প্রকৃতি ও প্রতিভার ছায়াতলে মানব সমাজের অগ্রগতি ও উন্নতির প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার সত্যিকারের কোন যৌক্তিকতা নেই।

লোভী ব্যক্তিদের কর্মতৎপরতা তাদের সমাজের জন্য একটি দুঃখ-কষ্টের ধারা সৃষ্টি করে। কেননা লোভী ব্যক্তিরা তাদের লোভের পথে পা বাড়াতে গিয়ে এমন সব অন্যায় পথে পা বাড়াতে থাকে যা অনেক সময় অন্যদের দারিদ্র্যের কারণ হয়ে যায়। সে লোভের বশবর্তী হয়ে অধিক সম্পদ আহরণ করার মানসে সম্পদের উৎসমূল দখল করে। এর পরিণতিতে শেষ পর্যন্ত সমাজে অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোন কোন লোক এ দাবী করে যে, সম্পদ হচ্ছে মানুষের জীবনের আশা-আকাঙ্খাসমূহ বাস্তবায়নের একটি শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। তাই তারা সম্পদ আহরণে সর্বাধিক মনোযোগী। বস্তুতঃপক্ষে, গরীব লোকেরাই দুনিয়ার ইতিহাসে বেশী সম্মানের অধিকারী ও সর্বাধিক মর্যাদার স্থান দখল করে আছেন। লেখক, আবিষ্কারক ও বৈজ্ঞানিক সবাই প্রধানতঃ দরিদ্র শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।

অধিকন্তু, সম্পদের প্রাচুর্য অনেক লোকের ধ্বংসের কারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, যুবকেরা যখন উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল সম্পদের মালিক হয় তখন তারা সাধারণতঃ জ্ঞানার্জন ও শিক্ষার সকল পথ পরিত্যাগ করে লোভ ও পাপের মধ্যে নিমজ্জিত হয়। কারণ তারা তখন চেষ্টা-সাধনা ও উন্নয়নমূলক কাজ করার কোন প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না।

একদা জনৈক সম্পদশালী ব্যক্তি এক বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকের সাথে দেখা করতে গিয়েছিল। তিনি সম্পদশালী লোকটিকে বিশ্বাস করতেন না। তাই, তার সাক্ষাতোপলক্ষে তেমন কোন বিশেষ আয়োজন করেন নি। দার্শনিক, ধনী লোকটিকে বললেনঃ আপনি নিশ্চয়ই আমার কাছ থেকে কিছু শিখতে আসেননি বরং আমার অপেক্ষাকৃত দুর্বল আর্থিক পরিস্থিতির সুযোগে আমাকে খাটো করে দেখার জন্যই এসেছেন। আমি কি ঠিক বলেছি?

ধনী লোকটা প্রত্যুত্তরে বললো,

"আমি যদি জ্ঞানার্জনের পথ অনুসরণ করতাম, আমার সম্পদ, প্রাসাদ, কর্মচারী ইত্যাদি কিছুই থাকতো না।"

দার্শনিক বললেন ঃ

"প্রভূত বস্তুগত সম্পদের মালিক না হওয়া সত্ত্বেও আমি আপনার চেয়ে ধনী। আমাকে রক্ষা করার জন্য আমি কোন পাহারাদারের দরকার মনে করি না। কেননা আমি কাইজার কেউ (এককালীন রোম সম্রাট) ভয় করি না। আপনি যেহেতু অন্যদের উপর নির্ভরশীল তাই আপনি সর্বদা গরীব থাকবেন। স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলে আমার রয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা, বিচার ক্ষমতা, সন্তোষ ও মানসিক তৃপ্তি আর আপনি অযথা রৌপ্য পাত্রের চিন্তা করে আপনার সময় নষ্ট করছেন।

আমার চিন্তা হচ্ছে আমার বিশাল সাম্রাজ্য যেখানে আমি সুখে থাকি আর আপনি দুশ্চিন্তা ও অসন্তোষের মধ্যে আপনার গোটা জীবন অতিবাহিত করছেন। আপনি যা কিছুর অধিকারী হয়েছেন এসবই আমার কাছে অর্থহীন, কিন্তু আমার যা কিছু রয়েছে তা হলো প্রাচুর্য। কেননা আপনি কখনও আপনার অভাব ও আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে পারবেন না। কিন্তু আমার সব প্রয়োজনই আমি সর্বদা আমার যুক্তি ও বিশ্লেষণ ক্ষমতাকে দিয়ে পূরণ করি।

প্রত্যেক মানুষকে অবশ্যই স্বর্ণ রৌপ্যের উপর নির্ভর না করে জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। কারণ মূর্খ লোকেরাই কেবল অর্থ সম্পদের উপর নির্ভরশীল হয়।

সুখ ও অসন্তোষ, নিঃসন্দেহে মানুষের জীবনের একটিঅংশ, জীবনের ঘটনা প্রবাহে এদের প্রত্যেকেরই একটিভূমিকা রয়েছে। বস্তুগত অবস্থা নির্বিশেষে এ দুনিয়ায় প্রবেশকারী প্রত্যেক মানুষকে এ দুয়ের কিছু অংশ অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এখানে আমরা নিরাপদে বলতে পারি মানুষের সম্পদ তা যত প্রয়োজনাতিরিক্তই হোক না কেন তা মানুষের

জন্য সুখের ব্যবস্থা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। সক্রেটিসের মতে বহু লোকের অর্থ, মূল্যবান রত্ন, সুন্দর পোশাকাদি, প্রাসাদ ইত্যাদি কিছুই থাকে না, তথাপি তাদের জীবন সম্পদশালী লোকের জীবনের চেয়ে সহস্র গুণ সুখী।

নিশ্চয়ই, লোভী লোকেরা অপমানিত, সে পৃথিবী ও টাকার নিকৃষ্ট গোলাম। সে তার গর্দানকে সম্পদের শৃঙ্খলে বন্দী করেছে এবং অপরিপক্ক চিন্তার কাছে নিজেকে সোপর্দ করে দিয়েছে। লোভী ব্যক্তি কল্পনা করে যে তার সম্পদ যা তার কয়েকটি অধঃস্তন বংশধরদের জন্য যথেষ্ট, তার বিষাদময় জীবনের জন্য সংরক্ষিত বস্তু বৈ আর কিছুই নয়। বিপদের ঘন্টা যখন বেজে উঠে, মৃত্যুর সময় যখন এসে যায় কেবল তখনই লোভী লোক তার ভুলসমূহ বুঝতে পারে। যখন তার জীবনের শেষ সেকেন্ডগুলোর ঘোষণা দিয়ে মৃত্যুর ঘন্টা বেজে উঠে তখন দুঃখ ও হতাশার সাথে সে তার সম্পদের প্রতি তাকায়, যেজন্য সে তার সমগ্র জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। সে একথা চিন্তা করতে থাকে যে তার এ সম্পদ তার কবরে কোন কাজে আসবে না। সে তার জীবনব্যাপী যেসব ভুল করেছে তজ্জন্য সে আজ তার কবরে দুঃখই বয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামের যথার্থ বন্টন

মানুষকে ইসলাম গ্রহণ ও ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করার আহ্বান জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বস্তুবাদের অন্ধ অনুরাগের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে। ইসলাম এটাই ঘোষণা করেছে যে ধন-সম্পদের প্রতি এ ধরনের অন্ধ অনুরাগ মানুষকে তার জীবনের মূল লক্ষ্য অনন্তকালীন সুখের অনুসন্ধান হতে বঞ্চিত করে। ইমাম বাকের (আঃ) লোভী ব্যক্তি সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা প্রদান করেছেনঃ

"এ দুনিয়ার লোভী লোকদের উদাহরণ রেশম গুটির মত। যত বেশী রেশমী সূতা সে তার গায়ের চতুর্দিকে বুনে, তত কম সুযোগই সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য পেয়ে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দম বন্ধ হয়ে মারা পড়ে।"

-উসুলুল কাফী, ২য় খন্ড

রাসূলুল্লাহ (দঃ) বলেছেনঃ

"লোভ হতে বিরত থাক, কেননা তোমাদের পূর্ববর্তীদের অনেকেই লোভের

কারণে ধ্বংস হয়েছে। লোভ তাদেরকে কার্পণ্যপূর্ণ আচরণের অধিকারী হতে বলেছে এবং তারা তাই করেছে। এটা তাদেরকে অন্যদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে বলেছে এবং তারা তাই করেছে। এটা তাদেরকে অপরাধ করতে বলেছে এবং তারা তাই পাপী হয়েছে।"

– নাহযাল ফাসাহা, পৃঃ ১৯৯।

ইমাম আলী (আঃ) লোভ হতে যে দুঃখ কষ্টের সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন ঃ

"লোভ পরিহার কর। কেননা এর অধিকারী ব্যক্তি পাপ ও নিদারুণ শ্রান্তির হাতে বন্দী।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ১৩৫।

ডাঃ মার্ডিন বলেছেনঃ

"সম্পদই মানুষের জীবনের সবকিছু নয়। টাকা জমানোর উপরই মানুষের প্রকৃত সুখ নির্ভর করে না। তথাপি অনেক যুবক এ ভুল করে। তারা বিশ্বাস করে যে, টাকাই হচ্ছে মানব জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ফলে, তারা তাদের জীবনের এ মূল্যবান অধ্যায়কে সম্পদ অন্বেষণের কাজে অপচয় করে এবং এভাবে জীবনের অন্য সবকিছু হতে নিজেদেরকে বঞ্চিত করে। এটা হচ্ছে মানুষের চিন্তার বড় একটিভ্রান্ত পথ এবং এটা বহু লোকের দুঃখ–দুর্দশার মূল কারণ।"

"আমরা সংগ্রাম করছি বড় বড় প্রাসাদ, গাড়ী, সুন্দর পোশাক ইত্যাদি লাভের জন্য এ কথা ভেবে যে এসবই হচ্ছে সুখের রাস্তা, বস্তুতঃপক্ষে; এসবের দ্বারা হতাশা আর বঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই আসবে না।"

– খীষ্টান সাজী

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"একজন লোভী ব্যক্তি অপমানের হাতে বন্দী। তার এ বন্দীদশা কখনও শেষ হবে না।"

–গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৫০।

ইসলাম ন্যায়পরায়ণতার ধর্ম এটি মানুষের স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বস্তুবাদিতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকারী। এজন্য ইসলাম এর অনুসারীদের আত্মা ও দেহের সুস্থ বিকাশের নিশ্চয়তা বিধানকারী এমন একটি পথ নির্ধারিত করে দিয়েছে।

ধর্মীয় ব্যক্তিরা সুবিজ্ঞ ও সঠিক মূলনীতির অধিকারী কেননা তাঁরা

আধ্যাত্মিক সত্য সম্পর্কে অবহিত। তৃপ্তি হচ্ছে একটিঅফুরন্ত সম্পদ। কেননা এর অধিকারীরা তাদের যতখানি প্রয়োজন ততখানির জন্য প্রচেষ্টা চালায়। যুক্তিবাদী লোকেরা তাদের আত্মিক প্রশান্তি বিনষ্টকারী সম্পদ ও নীচতা সংগ্রহের ভ্রান্ত প্রচেষ্টা না চালিয়ে তাদের জীবনকে সংগঠিত করে। যে ব্যক্তি নৈতিক জ্ঞানানুযায়ী যা কিছু পায় তাতেই সন্তুষ্ট, সেই সুখী। এ পর্যাপ্ত পন্থা তাকে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে (নৈতিক উৎকর্ষতার্জনে) সাহায্য করে, এভাবে সে প্রকৃত সম্পদ (সন্তোষ) লাভ করে, যা তার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে, অন্যের হাতে যা রয়েছে তা লাভের জন্য কাউকে বলার প্রয়োজনীয়তাও সে বোধ করে না।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"সন্তোষ ও খোদাভীরুতার পথের অনুসরণ সর্বোত্তম, লোভ ও অন্যায় লালসা হতে নিজের আত্মাকে মুক্ত করা উচিৎ। কেননা লোভ ও অর্থলোলুপতা হচ্ছে বর্তমান দারিদ্র। আর সন্তোষ ও আত্মসমর্পণ হচ্ছে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান সম্পদ।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৫৪৪।

ডাঃ মার্ডিন বলেছেনঃ

কতিপয় নির্দিষ্ট চিন্তা লোভ, অর্থলোলুপতা ও অন্যসব মানসিক প্রতিক্রিয়া হতে জন্মলাভ করে। এসব যে শুধু শরীরের ক্ষতিসাধন করে তা নয় বরং আত্মাকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। অতএব, লোভও আমাদেরকে একটি সুন্দর জীবন হতে বঞ্চিত করে এবং আমাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনকে বিনষ্ট করে। অর্থ লিপ্সা আমাদের স্বাভাবিক মানবীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ ধ্বংস করে ফেলে।

– ফিরোজী– ফিক্‌র

ইমাম আলী (আঃ) লোভী লোকদের আত্মিক ও মানসিক বিশৃঙ্খলার কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেছেন ঃ "অর্থলিপ্সা অসুস্থতা আনয়ন করে।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৫৪৪।

ইমাম আলী (আঃ) আরও বলেছেন ঃ

"লোভ আত্মাকে অপবিত্র করে, ধর্মকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে এবং যৌবনকে ধ্বংস করে।

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ৭৭।

রাসূলুল্লাহ (দঃ) লোভ হতে সৃষ্ট দুঃখকষ্ট ও বিপদ আপদের ব্যাখ্যা

প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

"একজন লোভী ব্যক্তি সাত প্রকার জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয় ঃ

১। দুশ্চিন্তাগ্রস্ততা, যা তার দেহের ক্ষতিসাধন করে, এবং যা তার জীবনের জন্য ক্ষতিকর।

২। বিষণ্নতা, যার শেষ নেই।

৩। ক্লান্তি, যা হতে মৃত্যুই একমাত্র পরিত্রাণ এবং ঐ পরিত্রাণের সঙ্গে সঙ্গে লোভীরা আরও অধিক ক্লান্তিতে পৌঁছে যায়।

৪। ভীতি, যা অহেতুকভাবে তার জীবনে অশান্তি সৃষ্টি করে।

৫। দুঃখ, যা নেহায়েত অপ্রয়োজনে তার জীবনে বিশৃঙ্খলা ঘটায়।

৬। বিচার, যা আল্লাহর শাস্তি হতে তাকে রক্ষা করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাকে ক্ষমা না করেন।

৭। শাস্তি, যা হতে পরিত্রাণ পাওয়ার কোন উপায় নেই।

–মুসতাদরাক আল ওসায়িল, ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৩৫।

লোভঃ নিশ্চিতভাবে একটি বদ ইচ্ছা যা মানুষকে পাপ ও অপমানের পথে পরিচালিত করে।

ইমাম আলী (আঃ) বলেছেন ঃ

"লোভ হচ্ছে খারাপ পথে পরিচালনাকারী একটিপ্রেরণা।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ ১৬

তিনি (আঃ) আরও বলেছেন ঃ

"অর্থলিপ্সার ফল হচ্ছে দুর্বলতা সম্পর্কে অভিযোগ।"

– গুরার আল হিকাম, পৃঃ৩৬০

ডাঃ এস, এম কওগাষ্ট বলেছেন ঃ

"লোভ হতে চুরি করার প্রবণতা জন্মে। চোরেরা এমন জিনিষ চুরি করে যা তাদের নেই এবং সেসবের প্রতি তার লোভ রয়েছে। যে ব্যক্তি একজন ব্যবসায়ীর এক জোড়া মোজা এবং তার কাছে আমানত হিসেবে রাখা সাইকেল চুরি করে সে এসব জিনিষের মালিক হওয়ার লোভে প্রলুব্ধ হয়ে চুরি করে। তাই চুরি করার এ প্রেরণা হচ্ছে লোভ। *– চীমিদানম*

উপসংহারে আমরা লোভের মত বিপজ্জনক আত্মিক বিশৃঙ্খলা হতে মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসকেই একমাত্র চিকিৎসা বলতে চাইও। মানুষের আত্মিকতাকে শক্তিশালী করার দ্বারা নৈতিক গুণাবলীর উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমেই একমাত্র তৃপ্তি লাভ করা যেতে পারে।

১৭

ঝগড়া বিবাদ

* সহজাত আত্মপ্রীতি
* তর্কাতর্কি করে আমাদের কি লাভ হয়?
* নেতাদের বাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত

সহজাত আত্মপ্রীতি ঃ

বস্তুর প্রতি লোভ মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। মানব সৃষ্টির সূচনালগ্ন হতে এ প্রবণতা মানুষের মধ্যে কার্যকর রয়েছে। মানুষ তার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য এ চালিকাশক্তি দ্বারা এক নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের পথে পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রবণতার ফলে, দেখা যায় যে মানুষ তার জন্য কল্যাণকর কাজসমূহের প্রতি আগ্রহী হয় এবং ক্ষতিকর কাজসমূহ পরিহার করে চলে। অতএব, মানুষ তার অগ্রযাত্রার পথে তার মনস্তাত্বিক অবস্থার এক অসহায় জিম্মি হয়ে যায়। মানব সভ্যতার মান উন্নয়নের করার ব্যাপারে মানুষের এ বৈশিষ্ট্য এক বিরাট অবদান রাখছে।

তথাপি, সুখী জীবন যাপনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করতে গিয়ে মানুষ যদি নিজেকে অসাবধানতা ও গতানুগতিকতার অন্ধ অনুসরণ হতে রক্ষা করে চলে এবং সঙ্গে সঙ্গে জীবনের সীমাহীন চাহিদার লোভ হতে নিজেকে মুক্ত রাখতে সক্ষম হয় তা হলেও জীবনে সে সুখী হতে পারে। এজন্য তাকে, অবশ্যই, তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। যা তার মধ্যে উৎকৃষ্ট নৈতিকতা ও প্রসংশনীয় গুণাবলীর জন্ম দিয়ে তার প্রবণতা সমূহের চাহিদা যথাযথভাবে পূর্ণ করবে। এটা এজন্য যে যুক্তিই মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন করে, তার প্রবণতা নয়। যুক্তি মানুষের মধ্যকার প্রবণতাসমূহের মাত্রাতিরিক্ততাও ঘাটতি নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে কাজ করে। এটা এমনি এক উপাদান যা আমাদেরকে সত্য ও মিথ্যা চিহ্নিত করার যোগ্য করে গড়ে তোলে। মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে যুক্তির অবদান সর্বাধিক।

আমাদের প্রতিটি কাজ করার পূর্বে যুক্তি সুক্ষ্মভাবে বিচার বিশ্লেষণ করে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদান করে। ফলে আমরা বিপথগামীতা হতে রক্ষা পাই। মানুষের মধ্যকার আত্মপ্রীতির প্রবণতা যদি তার বিচার বিশ্লেষণের পর্যায় অতিক্রম করে যথেচ্ছচারিতার রাজ্যে প্রবেশ করার মত বিপজ্জনক অবস্থায় উপনীত হয়, তখন এটা তার বিচার শক্তিকে দুর্বল করে ফেলে। এর ফলে তার সত্যকে উপলব্ধি করার শক্তি বাধাগ্রস্থ হয়। এ ধরনের বিশৃঙ্খলার শিকারে নিপতিত লোকেরা শেষ পর্যন্ত দুর্নীতি ও

বিপথগামীতার পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। তথাপি উপরোক্ত প্রবণতার ক্ষতিকর দিকের সমালোচনা ততক্ষণ পর্যন্ত করা যেতে পারে যতক্ষণ তা স্বেচ্ছাচারিতার পর্যায়ে থাকে। অতএব, আত্মপ্রীতি বিষয়টার সমালোচনা করার একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে এটাকে যুক্তির সীমানা লংঘন করতে দেওয়ার কারণে যে অসুবিধাসমূহ দেখা দিবে তা তুলে ধরা।

একজন মানুষের সফলতা এবং ব্যর্থতা উভয়ই তার নৈতিক ও আত্মিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। নৈতিক বিশৃঙ্খলা যা আমাদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিস্তার লাভ করে তা সাধারণত আমাদের অযৌক্তিক ও অবাধ্য লোভের কারণে উৎপন্ন হয়। মানুষকে প্রচুর যোগ্যতা ও প্রতিভা দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি মানুষের মধ্যে তার অন্তর্নিহিত যুক্তিসঙ্গত আবেগকে অনুধাবন করাও মেনে চলার মত শক্তি রয়েছে। এতদসত্বেও এটা স্পষ্ট যে মানুষের জন্য সবচাইতে কঠিনতম কাজ হচ্ছে তার মধ্যকার আত্মপ্রীতি, আত্মাভিমান ও গোড়ামী রূপ প্রবণতা বা চাহিদার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। অতএব, আমরা আমাদের এসব প্রবণতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রচেষ্টা চালাতে বাধ্য, আর তা না হলে আমরা কিছুতেই উৎকৃষ্ট আচার-আচরণের অধিকারী হতে পারবো না। আত্মনিয়ন্ত্রণ ব্যতীত আমরা একটা গ্রহণযোগ্য প্রশংসনীয় জীবন যাপন করতে পারি না।

তর্কাতর্কিতে আমাদের কি লাভ হয় ঃ

সামাজিক আচার-আচরণের সফলতা কতকগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলার উপর সরাসরি নির্ভরশীল যা আমাদেরকে অবশ্যই জেনে নিয়ে তদানুযায়ী আমাদের আচরণকে গড়তে হবে। কেননা অন্যদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে গিয়ে মানুষের ভূমিকা ও অন্যদের প্রতি কর্তব্য পালনের সীমানা সম্পর্কিত জ্ঞানই হচ্ছে সব কারণসমূহের মধ্যে অন্যতম যা দিয়ে মানুষের সুখ বা দুঃখ নির্ধারিত হয়ে থাকে। পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার মত একটা বৈশিষ্ট্যকে মানুষের স্বভাবের মধ্যে গভীরভাবে কার্য্যকর করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সহযোগিতার একটা সহজাত

প্রবণতা রয়েছে। এজন্য নির্জনতা ও একাকীত্বের প্রতি রয়েছে মানুষের অনীহা। সে যাই হউক , একজন মানুষের মন ও অন্তরের প্রশান্তি অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার নিজের সাথে অথবা অন্যদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে সক্ষম হবে না।

একটা সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ সমাজ জীবনের জন্য শান্তি, ঐক্য ও সহযোগিতা হচ্ছে আবশ্যকীয় উপাদান। পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্যের অধিকার ও অনুভূতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা একটা প্রধান শর্ত হিসাবে পরিগণিত। এতে মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্র স্থায়ী ও শক্তিশালী হয়। কারুর মধ্যে উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহের অভাব দেখা দিলে স্বভাবতই সে অন্যদের সহিত একটা ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করা হতে বঞ্চিত হবে এবং তাদের মধ্যকার ভালবাসা ও ঐক্যের ভিত্তি দুর্বল হতে থাকবে। তারা কোন অবস্থাতেই তাদের সম্পর্ককে একটা গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে রাখতে পারবে না।

মন্দ বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য এমন রয়েছে যা অন্যদের অনুভূতিকে মারাত্মকভাবে আহত করে এবং মানুষের মধ্যকার ভালবাসার সম্পর্কের ক্ষতিসাধন করে তা হচ্ছে তর্কাতর্কি। তর্ককারী ব্যক্তিদের এটা উপলব্ধি করা দরকার যে মানুষের মধ্যে অত্যধিক আত্মপ্রীতি এমন একটা উপাদান যার কারণে এ খারাপ বৈশিষ্ট্যের জন্ম হয়। এ বিশ্বাসঘাতক প্রবণতার প্রবাহের দ্বারা সিঞ্চিত হয়ে ইহা জন্ম লাভ করে।

একজন তর্কবিতর্ককারী ব্যক্তি তার অত্যধিক আত্মাভিমানী স্পৃহা চরিতার্থ করতে গিয়ে জনসমাবেশে উত্থাপিত প্রতিটি মতের বিরোধীতা করে, একটা ন্যায় ও সত্য মতকে উপস্থাপন করার জন্য অথবা একটা ভ্রান্তমতবাদকে বাতিল করার জন্য নয়, বরং মিথ্যা অপবাদের দ্বারা প্রতিপক্ষের ব্যক্তিত্বকে ধ্বংস করার জন্য। তার নিজের জন্য একটা মিথ্যা কৃতিত্বের মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টা চালাতে গিয়ে সে এসব করে থাকে। এ ধরনের লোকেরা তাদের আশ্চয্যজনক বাকচাতুর্য বা বিস্ময়সূচক বাক্যের আড়ালে তাদের আসল উদ্দেশ্য লুকিয়ে রাখতে পারে। এভাবে ঝগড়াটে লোকেরা তাদের ন্যায়পরায়ণ বিচারক হওয়ার উপযোগী শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে এবং সর্বপ্রকারের অন্যায় অত্যাচার চালানো ও অন্যদের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করার মত দুঃসাহসিকতা দেখাতে